রাজপুতানা রাজস্থান

রাখাল চন্দ্র দাস

প্রভা প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

স্টল নং—৪৩

ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা—৭০০ ০৭৩

RAJPUTANA RAJASTHAN : by Rakhal Chandra das.
Published by Prova Prakashani.

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর উঃ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৫৮২-৬৮৭৮

প্রথম প্রকাশ :
২৭শে মে, ১৯৫৮

প্রচ্ছদ :
কুমারঅজিত

ISBN-81-86964-44-4

অক্ষর বিন্যাস :
কোয়ালিটি প্রিন্টার্স
কলকাতা - ৭০০ ০৮৯

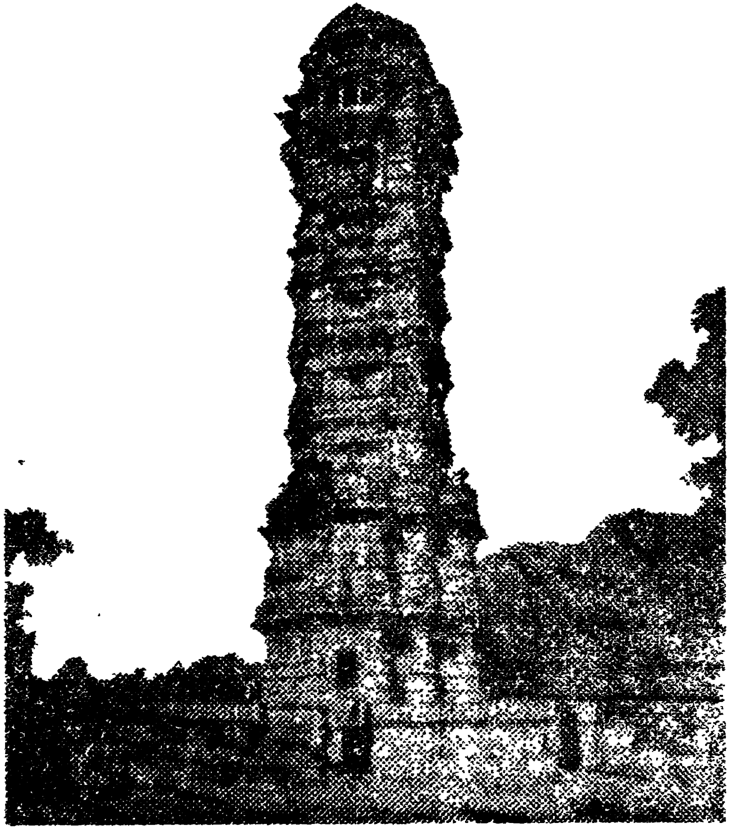
মুদ্রণ :

ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১/এ, গড়পাড় রোড
কলকাতা-৬

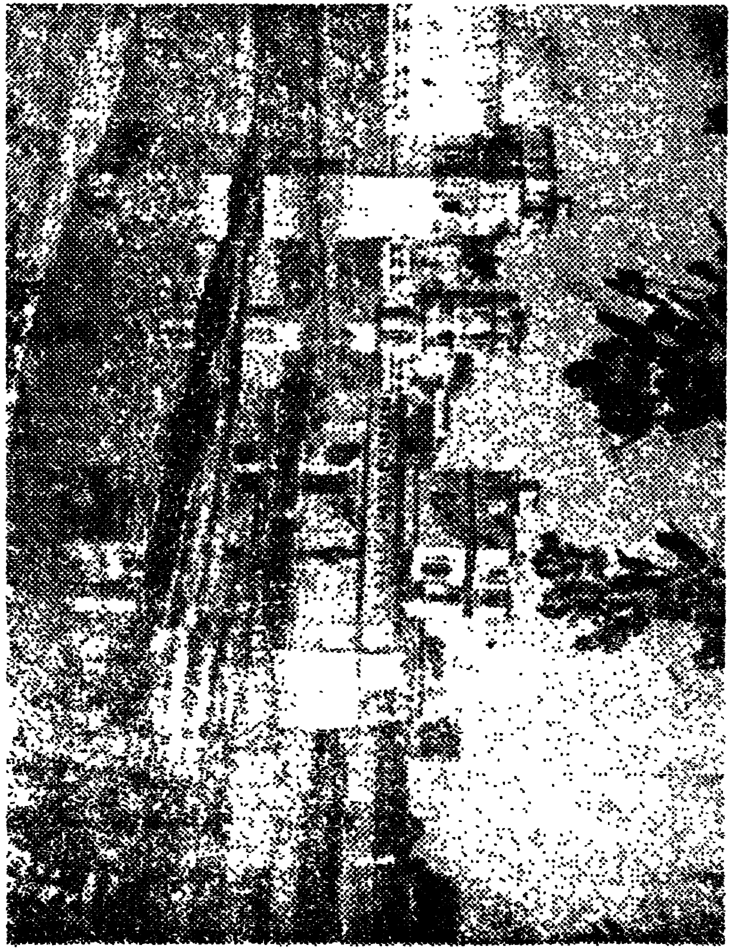
মমতাময়ী স্বর্গীয় মাতা মানদা দেবী এবং
পরম আরাধ্য স্বর্গীয় পিতা নিত্যহরির
স্মৃতির উদ্দেশে—

এ লেখকের অন্যান্য বই ঃ

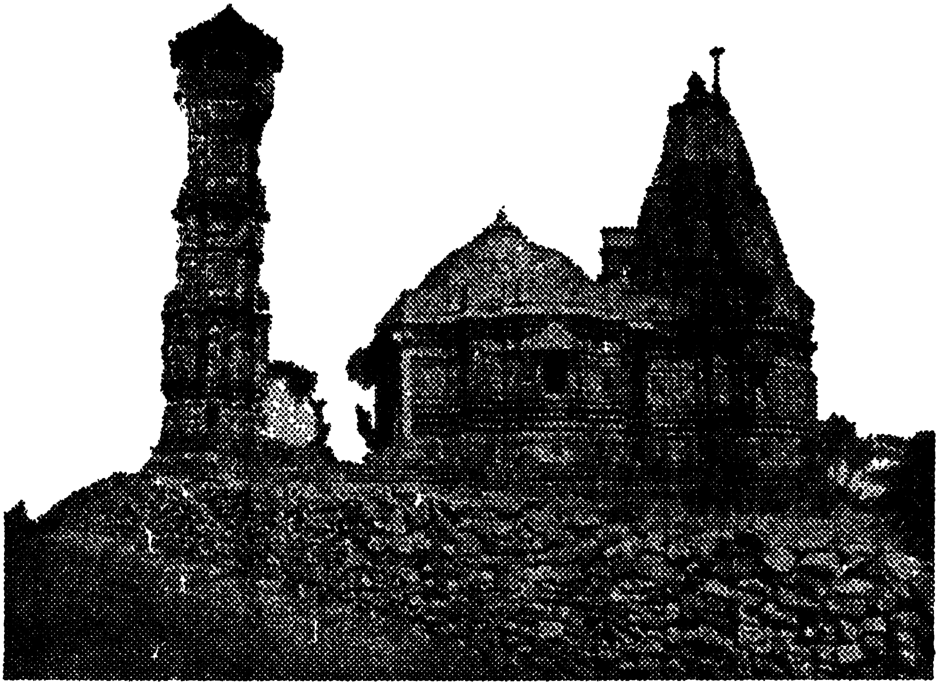
শঙ্কু বঙ্কুর এক্কা গাড়ি
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ
দার্জিলিং থেকে শিলং
জীবন সঙ্গিনী
সুন্দরী গোয়া



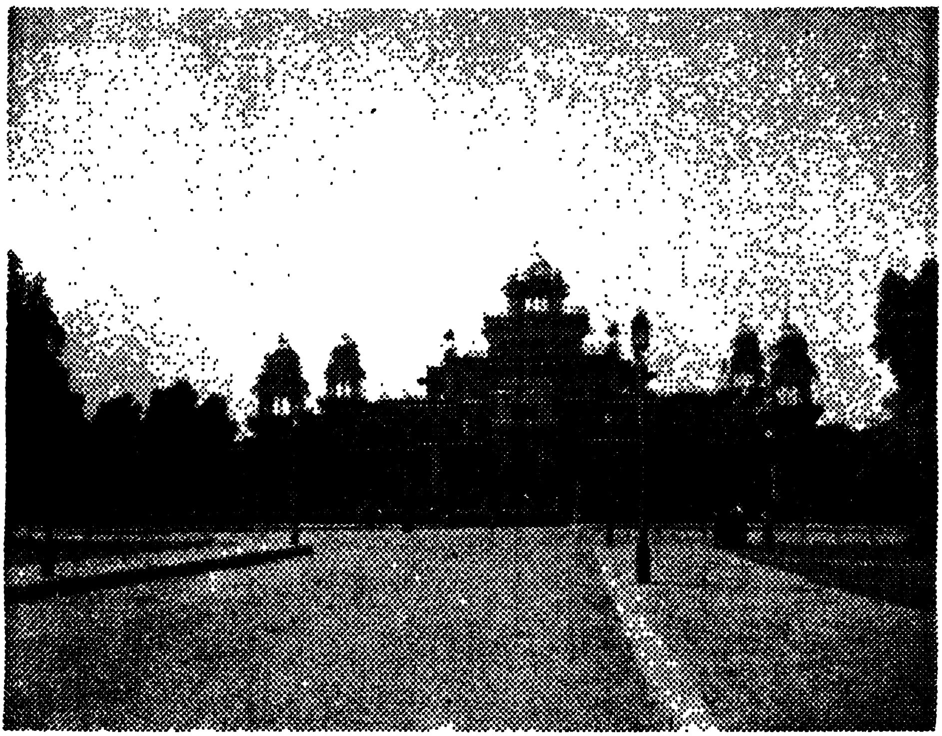
বিজয় স্তম্ভ চিতোর গড



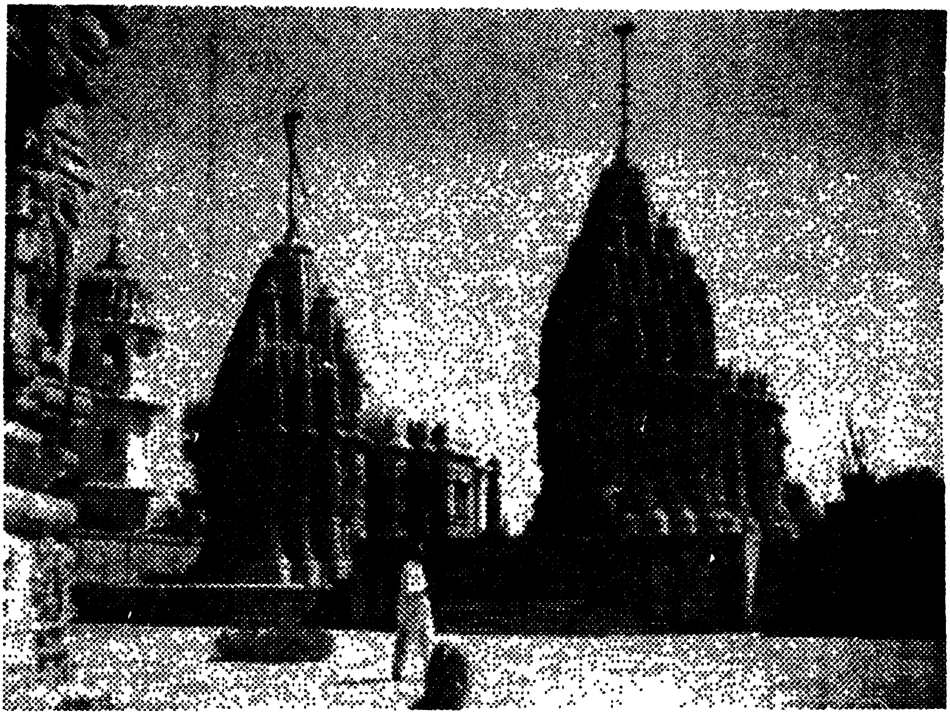
এই সেই প্রাসাদ (জেনানা প্রাসাদ) যেখানে ...



কীর্তি স্তম্ভ ও জৈন মন্দির



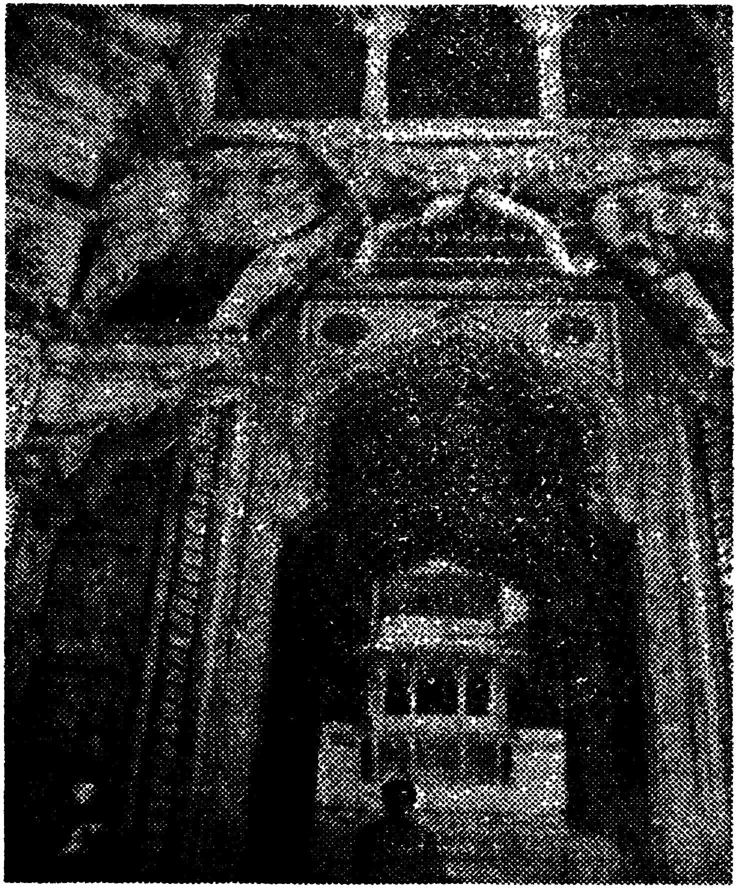
কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা (জয়পুর)



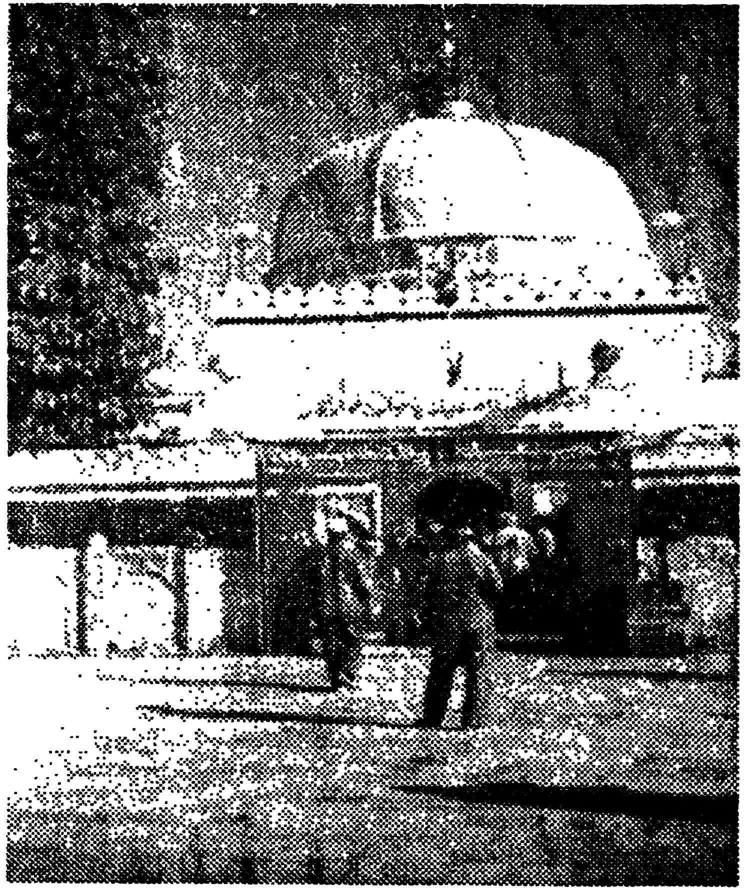
যোধপুর মহারাজাদের স্মৃতি স্তম্ভ (মাণ্ডোর)



নক্কি লেকের পূর্বপাড়ে পার্কের দৃশ্য (আবু পর্বত)



হাতি পোল (বুঁদি)



মিরণ সাহেবের দরগা (তারাগড় পাহাড়)

ভূমিকা

রাজপুতদের জীবন কাহিনী, শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা বীরত্ব এবং ত্যাগে মহীয়ান। আব কারো কারোর কুচক্রী, নিষ্ঠুরতা, লোভ লালসা, নারী নিয়ে মত্ত থেকে রাজকার্যে অবহেল উদাহরণও আছে। তবু বেশির ভাগ রাজপুত নিজ রাজ্য রক্ষণ, প্রজাপালনে নিষ্ঠা, বিধর্মী এ নিষ্ঠুর পররাজ্য আগ্রাসীদের সঙ্গে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যে ভাবে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে এমন উদাহরণ জগতে খুব কমই দেখা যায়।

রাণা রাজবংশের মহারাণা বাপ্পা থেকে আরম্ভ করে মহারাণা সংগ্রাম সিং পর্যন্ত অনেকে বীরত্বের তুলনা হয় না। তুলনা হয় না যে সব সামন্ত সর্দার বীরগণ পররাজ্যগ্রাসী শয়তানদে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন।

প্রতাপ সিং-এর মতো দেশপ্রেম আর কোন রাজার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কি? রা হয়েও রাজ্য রক্ষার জন্য স্বপরিবারে বনে জঙ্গলে গুহায় কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের অনেক সময়। ফলমূল খেয়ে, কখনো অর্ধাহারে কখনো অনাহারে থেকে শুধু দেশের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য লড়াই করে গেছেন। সামান্য কিছু দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধাদের নিয়ে শক্তিশালী মুঘ সৈন্যদের সঙ্গে দিনের পর দিন যুদ্ধ করেছেন।

কত বীর পুরুষ দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রাণ দিয়েছেন ত পররাজ্যগ্রাসী শয়তানদের কাছে মাথা নোয়াননি। শুধু রাজভক্তি নয়, পিতৃভক্তি এবং পিতৃআ পালনের জন্য নিজের প্রাপ্য রাজত্বও হেলায় ছেড়ে দিয়েছেন এমন রাজপুরুষের দৃষ্টান্তও আ এই রাজস্থানে।

মহাসতী পদ্মিনীর মত কত শত শত মহীয়সী নারী সম্মান রক্ষার জন্য জহরব্রত পালন ক সাধারণ মানুষের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। কর্ণাবতীর মত বীর মহীয় নারী রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন।

কৃষ্ণপ্রাণা মীরাবাঈ-এর তুলনা আর কোথাও আছে কি? এই ভগবত প্রাণা নারী রাজস্থা ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। রাজস্থানী ইতিহাসে আর এক মহীয়সী নারী নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি হলেন ধাত্রী পান্না। নিষ্ঠুর এবং রাজ্যগ্রাসী বনবীরের হাত থে প্রভুপুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের ছেলেকে প্রভুপুত্র বলে দেখিয়ে দিলেন। চোখের সাম নিজের সন্তানকে হত্যা করতে দেখেও নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি। প্রভুপুত্র উদয় বাঁচাতেই হবে কেননা সে যে ভবিষ্যতে রাজ্যের রাণা হবে।

আর কৃষ্ণ কুমারীর হত্যার কথা শুনে অতি পাষণ্ডও পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রাজ্য রক্ষা কথা ভেবে ষোড়শী কুমারী কন্যা হাসি মুখে বিষ পান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ধন্য ধন্য কৃষ্ণ কুমারী।

এমন বীর এবং মহান মহীয়সীদের পদধূলি যে রাজস্থানের পথে পথে ছড়িয়ে আছে আ সে সব পথে পদচারণ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আর সেই সব বীর ও বীরাঙ্গণাদে প্রসবিনী রাজস্থানের কীর্তি গাথা পাঠকবৃন্দের সামনে পুস্তকাকারে তুলে ধরেছেন বন্ধুবর অসী মণ্ডল। আমি শ্রী অসীম কুমার মণ্ডল এবং কোয়ালিটি প্রিন্টার্সের কর্মীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

রাজস্থান দর্শনের নির্দেশিকা

১ম দিন ঃ জয়পুর এবং অম্বর।

জয়পুর সিটি। দর্শনীয় স্থান—মতি ডুংরি, বিড়লা মন্দির, রামনিবাস গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়া যন্তর মন্তর, হাওয়া মহল, সিটি প্যালেস (দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, চন্দ্র মহল, প্রীতম নিবা শিলেখানা, মুবারক মহল)। সিটি প্যালেসের পিছনে গোবিন্দ দেবজী মন্দির।

এবার চলুন অম্বর। অম্বরের পথে পড়ে জলমহল। আর অম্বরে রয়েছে অম্বর রাজপ্রাসাদ (দেওয়া ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শীষ মহল, যশ মন্দির, সুখ মন্দির) এবং যশোশ্বরী মন্দির বা শীলামাতার মন্দি (প্রাসাদের পিছনে)। ফেরার পথে কণক বৃন্দাবন। সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরা।

২য় দিন ঃ আজমীর চলুন। বাসযোগে ৩-৪ ঘন্টার পথ। সড়ক পথে জয়পুর থেকে আজমীরের দূর ১৩২ কিমি। জয়পুর ইন্টার স্টেট বাস স্ট্যাণ্ড থেকে সকাল পাঁচটার মধ্যে বাস ধরুন।

আজমীরের দর্শনীয় স্থান—দৌলত বাগ, অনাসাগর লেক, আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া, আজমীর দু ম্যাগাজিন (গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম), মইনুদ্দিন চিস্তির দরগা।

মইনুদ্দিন চিস্তির দরগার পাশ দিয়েই পথ চলে গেছে তারাগড় পাহাড়ে। তারাগড় পাহাড়ে ঐতিহাসিক তারাগড় দুর্গ। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আজ আর কিছু নেই। তারাগড় পাহাড়ে এখ দেখার বিষয় মিরণ সাহেবের সমাধি।

যারা তারাগড় পাহাড়ে উঠবেন তারা ফিরে এসে আজমীরে রাত কাটাবেন। অনেক হোটেল আছে যারা একদিনে আজমীর এবং পুষ্কর দর্শন করতে চান তারা পাহাড়ে না উঠে চলুন পুষ্করে। পুষ্কর দর্শ করে পুষ্করে রাত কাটান। আজমীর কিংবা পুষ্করে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা নেই। আজমীর থেকে পুষ্করের দূরত্ব ১১ কিমি।

পুষ্কর ঃ হিন্দু তীর্থস্থান। পুষ্কর সরোবরে পূজা দিন। পুষ্করে ৪০০ মন্দির আছে। তার মধ্যে ব্রহ্মা, বদ্রী নারায়ণ, সাবিত্রী, শিব এবং বিষ্ণু মন্দির অবশ্য দর্শনীয়। সাবিত্রী পাহাড়ে রয়েছে সাবিত্রী মন্দির। সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠানামা করতে তিন ঘন্টার মত সময় লাগে। পুষ্করে অনেক হোটেল এবং ধর্মশালা আছে।

তৃতীয় দিন ঃ সকালে চলুন চিতোর। আজমীর থেকে বাসে লাগে ৫ ঘন্টা। চিতোর গড় দর্শনে সময় লাগে ৩ ঘন্টা। চিতোরে থাকার দরকার হয় না। তবু প্রয়োজনে থাকতে হলে হোটেল এবং ধর্মশালা আছে

চিতোর রেল স্টেশনের কাছে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান অফিস, এদের সহযোগিতায় একজন গাইড সঙ্গে নিন। অবশ্য চিতোর গড়েও গাইড পেতে পারেন। ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান চিতোর গড়। গাড়ি চলে যাবে দুর্গের মধ্যে। যারা গাড়ি নেননি সমতল থেকে টাঙ্গা কিংবা অটোরিক্শা নিয়ে চলুন। চিতোরে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা নেই।

চিতোর গড়ের দর্শনীয় বিষয় ঃ কালীমাতা মন্দির, কীর্তি স্তম্ভ, মহাবীর স্বামী মন্দির, সাত-বিশ-দেবরা, বিষ্ণু মন্দির, মীরা মন্দির, বিজয় স্তম্ভ, সমীধেশ্বর মহাদেব মন্দির, পদ্মিনী প্যালেস, গোমুখ, কুম্ভ প্যালেস...ইত্যাদি।

যাদের সঙ্গে গাড়ি আছে দিনে দিনে চলে আসুন কোটা। বাসেও আসতে পারেন। কোটায় থাকার জন্য অনেক হোটেল এবং ধর্মশালা আছে। কোটার সঙ্গে দিল্লী, বোম্বে, আমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রা রেলপথে যুক্ত। চিতোর ইন্টার স্টেট বাস স্ট্যাণ্ড থেকে কোটার বাস পাবেন।

৪র্থ দিন ঃ কোটা থেকে বুঁদি। একই দিনে দর্শনীয়। কোটার থেকে বুঁদির দূরত্ব ৪৬ কিমি।

কোটার দর্শনীয় বিষয় ঃ কোটা দুর্গপ্রাসাদ, মাধোসিং মিউজিয়াম (দুর্গপ্রাসাদের মধ্যে), চম্বল গার্ডেন, কোটা বাঁধ, গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম, বারৌলি (নবম শতাব্দীর তৈরি সাতটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে)।

বুঁদির দর্শনীয় বিষয় ঃ বুঁদি রাজপ্রাসাদ, বুঁদি দুর্গ, চৌরাশি স্তম্ভ, ফুল সাগর এবং জৈৎসাগর। বুঁদি এবং কোটায় কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা নেই। ভাড়া করা গাড়ি, টাঙ্গা বা অটো নিয়ে ঘুরতে হবে। দারা অভয়ারণ্য দেখতে হলে আর একটা দিন থাকতে হবে।

৫ম দিন ঃ দিনে দিনে চলে আসুন উদয়পুর। এই দিন বিশ্রাম। কোটা ইন্টার স্টেট বাস স্ট্যাণ্ডে বাস পাবেন। সুযোগ সুবিধা মত রাতের বাসেও চলে আসতে পারেন উদয়পুর। উদয়পুরে থাকার অনেক হোটেল এবং ধর্মশালা আছে। কনডাকটেড ট্যুরে ঘোরার ব্যবস্থাও আছে।

ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান ব্যুরো (গভর্নমেন্ট অফ রাজস্থান), কাজরি ট্যুরিস্ট বাংলো, শাস্ত্রী সার্কেল উদয়পুর। এদের সঙ্গে নিম্নলিখিত ট্যুর প্রোগ্রামে উদয়পুর এবং উদয়পুরের পার্শ্ববর্তী দর্শনীয় স্থান দেখতে পারেন।

(১) সিটি ট্যুর (২) হলদি ঘাট, নাথদ্বার, একলিঙ্গজী (৩) রণকপুর ও কুম্বলগড় (৪) চিতোর গড়।

পর্যটক বন্ধু ধরে নিলাম ইতোমধ্যে চিতোর গড় দর্শন করেছেন। সুতরাং একদিন ১নং এবং ২নং ট্যুর এবং দ্বিতীয় দিনে ৩নং ট্যুর-এ উদয়পুরের দর্শন শেষ করতে পারেন। সুতরাং ৬ষ্ঠ এবং ৭ম দিন উদয়পুরে কাটল। ৮ম দিনে শৈল শহর মাউন্ট আবুতে চলুন। মাউন্ট আবুতে থাকার জন্য অনেক হোটেল এবং ধর্মশালা আছে।

৯ম দিনে মাউন্ট আবু। দর্শনীয় স্থান—নক্কি লেক, ওম শান্তি ভবন, অর্বুদা দেবী, দিলবারা মন্দির, অচলগড় দুর্গ, সান-সেট-পয়েন্ট, গুরুশিখর ইত্যাদি।

মাউন্ট আবুতে দর্শনের জন্য কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। বাস স্ট্যাণ্ডের মুখে রাজস্থান গভর্নমেন্টের ট্যুরিস্ট রিসেপশান সেন্টার আছে। এরা দিনে দুশিফ্‌টে মাউন্ট আবু দর্শন করায়। সকালের শিফ্‌টে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখুন। যে জায়গাগুলো দেখা সম্ভব হয়নি তা বিকালে দেখে নেওয়া যাবে। টাকার ভাড়া পাওয়া যায়। দিলবারা মন্দির একাধিকবার দেখা যায়। যত দেখবেন ততই আপনার কাছে তার মহিমা নতুন রূপে ধরা দেবে।

৯ম দিন রাতের বাসে ফিরে আসুন জয়পুর এবং দশম দিনে চলে আসুন ট্রেনে করে সোয়াই মাধোপুর। বম্বে দিল্লী রেলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন সোয়াই মাধোপুর। সোয়াই মাধোপুরে একদিন থাকুন। থাকার জন্য অনেক হোটেল এবং ধর্মশালা আছে।

রেলপথে জয়পুর থেকে সোয়াই মাধোপুরের দূরত্ব ১৬২ কিমি। কোটার দূরত্ব ১৭০ কিমি। যদি দিনের বেলা এসে থাকেন সোয়াই মাধোপুরে তাহলে এদিনই মাধোপুর কলেজের পাশে বনবিভাগের অফিস থেকে পরের দিনের জন্য অভয়ারণ্যের টিকিট কেটে নিন। এরা ৬.৩০ থেকে ১০টা এবং ২.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা দুশিফ্‌টে অভয়ারণ্য ঘুরে দেখায়।

১১তম দিনে রণথম্ভোর ন্যাশনাল পার্ক বা অভয়ারণ্য দর্শন করুন। ঐ দিনেই বিকালের ট্রেনে জয়পুর ফিরে আসুন। এভাবে রাজপুতানা রাজস্থানের সমৃদ্ধ অংশটি ১১-১২ দিনে দর্শন করা যায়। তার সঙ্গে আপনার বাড়ি থেকে জয়পুর পর্যন্ত আসা যাওয়ার সময় ধরে নিন।

পর্যটক বন্ধু যদি সমগ্র রাজস্থান একবারেই দেখতে চান তাহলে জয়পুর এবং অম্বর দর্শন করে জয়পুর থেকে ট্রেনে সোয়াই মাধোপুর হয়ে রণথম্ভোর অভয়ারণ্যটি দেখে নিন। তারপর জয়পুর থেকে উপরে বর্ণিত স্থানগুলো দর্শন করে মাউন্ট আবু আসুন। তারপর রাতের বাসে মাউন্ট আবু থেকে যোধপুর চলে আসুন। যোধপুরের দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করে যোধপুর থেকে যদি বাড়মের যেতে চান, বাড়মেরে আসুন। আর বাড়মের না যেতে চাইলে সোজা জয়শলমীর চলে আসুন।

জয়শলমীর দর্শন করে বিকানীর আসুন। বিকানীর দশন করে বিকানীর থেকে রাজস্থানের উত্তর দিকে ঝুনঝুনু এবং চুরু দর্শন করুন। আর এদুটো জায়গা না দেখতে চাইলে বিকানীর থেকে সোজা আলোয়ার চলে আসুন। আলোয়ারে থাকার অনেক জায়গা আছে। আলোয়ার দর্শন করে আলোয়ার থেকেই গাড়ি রিজার্ভ করে সরিসকা অভয়ারণ্য দেখুন।

এবার আলোয়ার থেকে আসুন ভরতপুর। ভরতপুরে থাকার অনেক জায়গা আছে। ভরতপুরের দ্রষ্টব্যস্থানগুলো দেখে ভরতপুর থেকেই দেখুন দীগ। এইভাবে ট্রেনে এবং বাসযোগে রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্যস্থানগুলো দেখতে পারেন। ভরতপুরের কাছের রেল স্টেশন আগ্রা ফোর্ট হয়ে বাড়ি ফিরুন।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক ভ্রমণার্থীর অনুরোধে এই নির্দেশিকা তৈরি করলাম। ভ্রমণ আপনার নিজস্ব ব্যাপার। ইচ্ছা করলে ভ্রমণ তালিকায় অনেক স্থান কাটছাঁট করতে পারেন, আবার বাড়াতেও পারেন। দিল্লী থেকে রাজস্থান ঘোরার অনেক কনডাকটেড ট্যুর আছে। যার যেখান থেকে সুবিধা দেখুন রাজস্থান।

রাজপুতদের দেশ রাজপুতানা। অতীতের রাজপুতানা আজকের রাজস্থান। সে যেন এক স্বপ্নের দেশ। প্রাচীন আজমীর রাজ্যের সঙ্গে ২২টি দেশীয় রাজ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে রাজস্থান। আমি চলেছি সেই রাজস্থানে।

রাজস্থানের কাহিনী শুরুর আগে মধ্য যুগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা ভাবা যাক। কেননা রাজনৈতিক দিক দিয়ে রাজস্থানের ইতিহাস শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা, বীরত্ব এবং ত্যাগে ভরা। বীর প্রসবিনী রাজস্থানের কীর্তি গাথা।

তখন ভারতের কোন কেন্দ্রীয় শক্তি বা শাসক ছিল না। ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজার আধিপত্য। তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে থাকতেন। এই সময়টা ছিল ভারতবর্ষের দুর্দিন। ফলে, কোন বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার ইচ্ছা বা আবশ্যকতা তাদের মধ্যে ছিল না।

স্বাভাবিক কারণে ভারতের বাইরের শত্রুদের দৃষ্টি ছিল ভারতের রাজকোষ, মঠ এবং দেবালয়গুলোর সম্পদের দিকে। এই শতাব্দীর শুরুতে গজনীর তুর্কী সুলতান মামুদ লুঠ করা সম্পদ নিয়ে গেছেন দেশে। সেজন্য তিনি লুণ্ঠক হিসাবে পরিচিত।

ঐতিহাসিক স্মিথের মতে, "সুলতান মামুদ ছিলেন এক ক্ষমতাশালী লুণ্ঠনকারী মাত্র"।

মামুদের পরে গজনী সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং মহম্মদ ঘুরীর ভারতে অনুপ্রবেশের পথ খুলে যায়। এই পথ ধরে মহম্মদ ঘুরী ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি পশ্চিম আফগানিস্থানের ঘুর রাজ্যের সুলতান ছিলেন। ঘুরী মুলতান, উচ ও লাহোর জয় করে যখন দিল্লীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তখন আজমীর ও দিল্লীর রাজা রায় পিথোরা বা পৃথ্বীরাজ তাঁকে বাধা দেন।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী থেকে ৮০ কি. মি. দূরে তরাইনের প্রান্তরে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে ঘুরীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ঘুরী পরাজিত হন।

পরের বছর অর্থাৎ ১১৯২ খৃষ্টাব্দে ঘুরী দ্বিতীয়বারের জন্য অভিযান চালান। এবারও ঘুরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ বাধে তরাইনের প্রান্তরে। ঘুরী শান্তি প্রস্তাবের নামে পৃথ্বীরাজের বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে পৃথ্বীরাজের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও বন্দী হন।

পূর্বপাঞ্জাব, দিল্লী এবং আজমীরের পর মহম্মদ ঘুরী একে একে রণথম্বোর, মীরাট এবং বুলন্দসর অধিকার করেন। শুরু হয় ভারতে সুলতানি শাসন। দিল্লী শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আমি অতীতের রাজপুতানা বর্তমানের রাজস্থানে বেড়াতে যাচ্ছি। স্বাভাবিক কারণে ঐ অঞ্চলে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল সে কথাগুলোই ভাবছি। ইলতুৎমিসের

রাজত্বকালে রাজপুত রাজারা রণথম্বোর, কালিঞ্জর প্রভৃতি দুর্গ পুনরায় অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ইলতুৎমিস রণথম্বোর গোয়ালিয়র কালিঞ্জর পুনরায় দখল করেন।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি রণথম্বোরের চৌহান রাজা হাম্বীরদেবকে পরাস্ত করে বিখ্যাত রণথম্বোর দুর্গ অধিকার করেন। তারপর রাজপুতানার দিকে অগ্রসর হন এবং চিতোর দুর্গ আক্রমণ করেন।

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে চিতোর দুর্গের পতন হয়। রাজপুত রমণীরা জহরব্রত পালন করেন।

তৈমুরের বংশধর বাবর ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে কাবুল জয় করে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। দিল্লীর শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের প্রান্তরে ২১শে এপ্রিল ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পরাজিত করে দিল্লী এবং আগ্রা অধিকার করেন।

তখন বাবরের বাধা হয়ে দাঁড়ান আফগান জায়গীরদারগণ এবং রাজপুত রাজারা। বাবর তার পুত্র হুমায়ুনকে আফগান সর্দারদের দমনের ভার দেন।

এদিকে রাণা সঙ্গ রাজপুত রাজা ও আফগান সর্দারদের সঙ্গে জোট বেঁধে ১৭ই মার্চ ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে খানুয়ার প্রান্তরে বাবরের সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হন এবং পরাজিত হন।

হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট সংকোচন হয়। আকবর পিতার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। তিনি নিজ বাহুবলে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং বিজিত অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়, সহিষ্ণুতা ও সমদর্শী নীতি গ্রহণ করেন। রাজপুত রাজাগুলিকে স্বায়ত্ত্ব শাসনের অধিকার দেন।

আফগান শক্তিকে নির্মূল করার জন্য আকবর রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি জানতেন রাজপুত রাজারা যোদ্ধা ও শত্রু হিসাবে যত বড় ছিলেন মিত্র হিসাবেও কোন অংশে কম ছিলেন না।

যুদ্ধবিদ্যা এবং শৌর্যে শ্রেষ্ঠ রাজপুতরা ছিলেন হিন্দুদের মুখপাত্র। হিন্দুদের প্রতি সমদর্শী নীতি গ্রহণ করে আকবর রাজপুতদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেন। তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করে দক্ষ রাজপুত সেনাপতি এবং সভাসদদের উচ্চ মনসবদারী পদ দেন। এছাড়া রাজপুতবীরদের একটি সৈন্যদল তৈরি করেন তুর্কী সেনাদের দমনের জন্য।

আকবর রাজপুতদের আস্থা লাভের জন্য রাজপুত রাণীর গর্ভজাত পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে অম্বর বা জয়পুরের রাজা বিহারীমলের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। বিহারীমলকে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদ এবং তস্য পুত্র ভগবান দাসকে মুঘল দরবারে উচ্চপদ দেন। ভগবান দাসের পুত্র আপন যোগ্যতায় সাতহাজারী বা সর্বোচ্চ মনসবদারের পদ পান।

অম্বরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মারবাড়, বিকানীর, বুন্দী, রণথম্বোর, কালিঞ্জর, প্রভৃতি স্থানের রাজারাও বশ্যতা স্বীকার করেন এবং স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পান। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল শিশোদিয় বংশের রাণা উদয় সিং।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে মুঘল বাহিনী রাজপুত সেনাপতি জয়মল ও পাট্টাকে পরাস্ত করে মেবারের রাজধানী চিতোর দূর্গ দখল করে। পরবর্ত্তীকালে উদয়সিং-এর পুত্র প্রতাপ সিং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রায় সারাজীবন যুদ্ধ করেছিলেন।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর তার পুত্র অমর সিং মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবার পর বশ্যতামূলক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। মেবারের পর রণথম্বোর এবং কালিঞ্জর দূর্গ আকবর অধিকার করেন।

আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ খুররম (জাহাঙ্গীর) ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অমর সিংকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে রাণাকে বশ্যতা স্বীকারের পরিবর্তে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেন।

ঔরঙ্গজেব ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ শাসক। তিনি ছিলেন হিন্দু বিদ্বেষী। আকবরের সময়ে যে ধর্মসমন্বয় নীতির প্রচলন ছিল তা জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব হিন্দু রাজাদের স্বায়ত্ত শাসন অধিকার লোপ করেন।

ঔরঙ্গজেবের হিন্দু বিদ্বেষী গোঁড়া ধর্মনীতির ফলে হিন্দুদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগে। এজন্য জাঠ, সৎনামী, বুন্দেলা, রাজপুত প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। হিন্দু মন্দির ধ্বংস, হিন্দুদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ ও জিজিয়া কর প্রবর্তন করায় এই সব বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

মধ্যযুগের সুলতানি আমল থেকে মুঘল শাসনকাল পর্যন্ত রাজপুতানায় যুদ্ধ ও ধ্বংসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাজপুতবীরগণ যে শৌর্য বীর্যের পরিচয় রেখেছেন তা যেমন স্মরণযোগ্য তেমন ঐ সময়কার ঘটনাবলী আজও সমান ভাবে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে।

সে সব ঘটনার সাক্ষী মঠ, মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ রাজস্থানের স্থাপত্যকলা এবং লেক বাগিচা ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য চলেছি রাজস্থান। প্রতিথযশা স্থানের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হব এবং বিচরণ করব সে সব প্রাতঃস্মরণীয় বীর ও বীরাঙ্গনাদের পদধূলি রঞ্জিত পথে।

রাজস্থানে পা রাখার আগে রাজস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আয়তনানুসারে রাজস্থান ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ রাজ্য। ২৬টি জেলা নিয়ে এর গঠন। এই রাজ্যের উত্তরে পাকিস্তান, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা। পূর্বে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ। দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাট। পশ্চিমে গুজরাট এবং পাকিস্তান।

দুর্ভেদ্য আরাবল্লী পর্বত এর দু দিকে দু'অংশে —উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান। এই দুই অংশের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান তুলনামূলক সমৃদ্ধতর। উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানের অধিকাংশ জায়গা মরুভূমি।

উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানের বিকানীর, পোকরান বাড়মের, ওশিয়া, যোধপুর এবং জয়সলমীর উল্লেখযোগ্য।

এ যাত্রায় আমি দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব। ১৯৯৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর রাজস্থানের পথে পাড়ি জমালাম। সমুদ্র অনেক দেখেছি। হিমালয়ের পথেও পদচারণা করেছি। কিন্তু মরুভূমির পথে পা বাড়াবার সুযোগ আসেনি আগে।

দুই

২রা অক্টোবর। সকালের দিকে জয়পুর এসে পৌঁছেছি। স্টেশন রোডের কাছে হাতী-বাবুকা বাগ। হাতী-বাবু বাগে হোটেল শালীন-এ আশ্রয় নিই।

ইচ্ছা করলে জয়পুর শহরের দ্রষ্টব্যগুলো আজই দেখে নিতে পারি। সে সময় হাতে আছে। কিন্তু তা করলাম না। তার প্রথম কারণ দু-রাত একদিন ট্রেন ভ্রমণের পর একটু বিশ্রাম দরকার। দ্বিতীয় কারণ জাতীয় ছুটির জন্য দ্রষ্টব্যস্থান আজ বন্ধ।

অতএব রিকশা এবং বাস যোগে কাছাকাছি ইন্টারস্টেট বাস স্ট্যাণ্ড, রেল স্টেশন, ট্যুরিস্ট অফিস এবং আরো কিছু জায়গায় ঘোরাফেরা করি। এর একটা সুফল হল শহরের রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে সম্যক ধারণা পেয়ে গেলাম। ইন্টারস্টেট বাস স্ট্যাণ্ডে ট্যুরিস্ট গাইড, দুখানা বই পেলাম। বই দুখানা কিনে ফিরলাম হোটেলে।

সন্ধ্যার পর হোটেল শালীন-এ ফিরে আসি। আগামী দিন জয়পুরের দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখব। সুতরাং জয়পুর সম্বন্ধে যতখানি সম্ভব জেনে নিই।

জয়পুর ঃ-

জয়পুর শহর জয়পুর জেলার প্রধান কার্যালয়, এবং রাজ্যের রাজধানী। জয়পুর জেলাটি রাজস্থানের প্রায় পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই জেলার চারদিকে রয়েছে রাজস্থানের নাগাউর, সিকার, আলওয়ার, সোয়াই মাধোপুর, টঙ্ক ও আজমীর জেলা।

জয়পুরের আদি নাম জয়নগর।

প্রাসাদনগরী জয়পুর। এই নগরী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীগুলির মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এর আকর্ষণ অতুলনীয়।

জয়পুর শুধু প্রাসাদনগরী নয় এর সৃষ্টি সৌন্দর্য গর্বের বিষয়। বাগিচা, জলের ফোয়ারা, মানমন্দির এবং স্থাপত্যকলার অক্ষয় কীর্তি মরুভূমির রাজ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয়।

জয়পুরের রূপকার মহারাজা জয়সিং অষ্টাদশ শতাব্দীতে শহরটি নির্মাণ করেন। শহরের অধিকাংশ প্রাসাদ গোলাপী রংয়ের। ফলে শহরের চারদিকে গোলাপী রংয়ের ছড়াছড়ি। এজন্য জয়পুরকে বলা হয় Fantasy in Pink বা গোলাপী স্বপ্ন।

মহারাজা জয়সিং ১৭২৭ সালের ১৮ই নভেম্বর শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। হিন্দু শাস্ত্র মতে এই নগরীর নকশা তৈরি হয়। আর এই নকশা তৈরি করেন একজন বাঙালী। তার নাম বিদ্যাধর ভট্টাচার্য।

কথায় বলে রতনে রতন চেনে। মহারাজা নিজে ছিলেন একজন সৃজনশীল প্রতিভাধর। খুঁজেও পেলেন আর এক গুণী ব্যক্তিকে। যিনি জয়সিং-এর কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করেন। তরুণ বয়সেই এই বাঙালী ভদ্রলোকের প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। সে সময় অম্বরের রাজা ছিলেন মহারাজা দ্বিতীয় সওয়াই জয় সিং। বিদ্যাধর মহাশয় তখনকার দিনে অম্বর রাজপ্রাসাদের সোপানশ্রেণীর একটা নক্‌শা আঁকেন।

নক্‌শাটি বিদ্যোৎসাহী ও সৃষ্টিশীল মহারাজ জয়সিং-এর নজরে আসতেই তিনি শ্রী ভট্টাচার্যকে কাছে নিয়ে আসেন। ক্রমে বিদ্যাধর মহাশয় মহারাজের পরামর্শদাতা রূপে পরিগণিত হন। বিদ্যাধর অম্বর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তিরিশ বছর বয়সে শ্রী ভট্টাচার্য পরিকল্পিত নগরীর প্রাথমিক কাজে হাত দেন। দু'বছর লাগল নগরের প্রাথমিক কাজ শেষ করতে। তিনি নগরীর যে নক্‌শা করেছিলেন তা আজও বর্তমানের সিটি প্যালেসে সযত্নে রক্ষিত আছে। নক্‌শা তৈরির পর বিদ্যাধর নগর নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

প্রায় পনের বছর দিন রাত পরিশ্রম করে হাজার হাজার শ্রমিকের সহায়তায় এ অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন। নির্মিত হল স্বপ্ন নগরী। বিশ্বের প্রথম পরিকল্পিত শহর— 'জয়নগর'। পরে অবশ্য জয়নগরের নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে জয়পুর হয়েছে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শহর।

এই মহানগরীর পথগুলো সোজা। যেন সরল রেখা। প্রধান পথগুলি ৩৩ মিটার এবং উপপথগুলি ১৬ মিটার চওড়া। পথের মিলনস্থলে একটি করে স্কোয়ার। এই স্কোয়ারগুলো পার্কের মর্যাদা পেয়েছে। কেননা প্রতি স্কোয়ারে উদ্যান এবং জলের ফোয়ারা আছে। রাস্তাগুলো শহরকে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করেছে। রাজস্থানীরা এসব ব্লককে বলেন মহল্লা এবং স্কোয়ারকে বলেন চৌপর।

পথের দু'পাশে তৈরি হয়েছে দেওয়াল। দেওয়ালগুলো এসে মিশেছে বিভিন্ন তোরণে। আটটি তোরণ আছে জয়পুর শহরে। শহরের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের প্রধান তোরণ যথাক্রমে—ধ্রুবপোল, আজমীর গেট, সূরয পোল এবং চাঁদ পোল। তার মধ্যে আজমীর গেট সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তোরণগুলির গঠন শৈলী চমৎকার এবং সুদৃশ্য।

সুখের কথা মহারাজা জয়সিং এর পরিকল্পিত শহরে ট্রাম চালানোর পরিকল্পনা চলছে। খবরে প্রকাশ রাজস্থান সরকার প্রায় ৬০০ কোটি টাকার দ্রুতগামী বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এ প্রকল্পের কাজ হতে আনুমানিক তিন বছর সময় লাগবে।

ভারতে কোলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজের পর এই চতুর্থতম শহরে ট্রাম চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অবশ্য বোম্বে এবং মাদ্রাজে ইতিমধ্যে ট্রাম চালনা বন্ধ হয়েছে— অন্যান্য দ্রুতগামী যানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকতে পারল না। এই ধীরগতিতে চলা ট্রামকে আরো দ্রুতগামী করে চালনো হবে জয়পুরে।

বিশেষজ্ঞদের আরো আশা এই ট্রাম যোগসূত্র গড়ে তুলবে পার্শ্ববর্তী শহরের সঙ্গে। ট্রাফিক জ্যাম এবং বায়ু দূষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক ট্রাম প্রকল্প। এই প্রকল্প সফল হলে জয়পুরের ক্ষেত্রে অনন্য নজির সৃষ্টি হবে। আশা করা হচ্ছে ১৯৯৮-৯৯ সালের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে শহরে সমতল দিয়ে ট্রাম চলবে। জয়স্তু জয়পুর।

তিন

৩রা অক্টোবর ১৯৯৫।

৯টার সময় খাসা কোঠিতে সোনিয়া ট্রাভেলস ইন্টার ন্যাশনাল-এর অফিসে এসে হাজির হই। খাসা কোঠি হোটেলের গায়ে R T D. C- র অফিস। এটি রাজস্থান গভর্ণমেন্টের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান অফিস।

R T.D C - র অফিসটি জাতীয় ছুটির জন্য আজ বন্ধ। স্বাভাবিক কারণে খাসা কোঠিতে সোনিয়া ট্র্যাভেলস ইন্টারন্যাশানলের সঙ্গে শহরের দ্রষ্টব্য স্থান দেখার জন্য টিকিট কাটি। যাত্রীগণ খাসা-কোঠি হোটেলের অধিকাংশ আবাসিক।

ঠিক সাড়ে নয়টার সময় বাস ছাড়ল। সোনিয়া ট্র্যাভেলস-এর হেড অফিস ৮ নং পার্কষ্ট্রীট, এম-আই-রোডএ রিপোর্ট করে দ্রষ্টব্য স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল।

গাইড যেতে যেতে বলে চলেছেন---ঐ দেখুন রাজ মন্দির। রাজ মন্দির একটি সিনেমা হল। মহারাজাদের সময়ের হল। জয় সিং স্ট্যাচুর পিছনে রয়েছে তারা মণ্ডল। — ঐ দেখুন তারা মণ্ডল.......

বাসে থেকেই আমরা এসব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দেখে নিচ্ছি। তারপর মতিডুংরি রোড ধরে মতি ডুংরি পাহাড়ের পাদদেশে এসে বাস থামল।

সাংগানিরি গেট থেকে দূরত্ব ২ কি.মি.। মতি ডুংরি পাহাড়ে এখনও জয়পুরের রাজমাতা বাস করছেন। মানসিং তিনটি বিবাহ করেন। দ্বিতীয় মহিষী কুচবিহারের কন্যা।

আমরা সে প্রাসাদ পর্যন্ত যাব না। পাহাড়ের উপরিভাগে একটি শিবমন্দির এবং একটি গণেশমন্দির আছে। আমরা পাহাড়ের নীচ দিয়ে চড়াই পথ ধরে এগিয়ে চলেছি।

পথের দুদিকে বাগিচা।

বাগিচায় হরেক রকম ফুলের চাষ হয়েছে। পথের দুদিকে আকর্ষণীয় বাগিচার শেষে দেখতে পেলাম একটা সুন্দর মন্দির। এটি আজকের প্রথম দ্রষ্টব্য।

বিড়লা মন্দির (Birla temple) :

[illegible] পোশাকী নাম লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। এই মন্দিরটি তৈরি করেছেন বি এম বিড়লা। ২০ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের চাতালে উঠতে হয়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মুখে ডানদিকে বি এম বিড়লা এবং বাম দিকে তার সহধর্মিণীর স্ট্যাচু নমস্কার করার ভঙ্গিতে

দাঁড়িয়ে আছে। চাতাল পেরিয়ে আরো কয়েক ধাপ উঠার পর মন্দির প্রাঙ্গনে আসি। এই মন্দিরটি তৈরি করতে মোট ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। মন্দিরে ঢোকার মুখে দেখি একটি ফলকে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ লেখা রয়েছে।

চাতাল থেকে বুক সমান উঁচুতে মন্দির। এগিয়ে যাই—

SHRI LAKSHMI NARAYAN TEMPLE
PRAN PRATISTHA
PERFORMED BY
SWAMI SHRI AKHANDANANDJI
ON 22ND FEBRUARY. 1985.

অখণ্ডানন্দজী ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ সালে মন্দিরটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র দশ বছর হল মন্দিরটির বয়স। শ্বেত পাথরের তৈরি মন্দির। খুব সুন্দর মন্দির, মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী খোদাই করা

মন্দিরের আরাধ্য দেব-দেবী নারায়ণ ও লক্ষ্মীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বাইরে আসি।

মন্দিরের পিছনে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছে। তাদের কাছে জানতে চাই, পাহাড়ের উপরে যে শিব মন্দির ও গণেশ মন্দির রয়েছে সেখানে যাওয়া যায় কিনা? তারা বললে, মন্দির আছে কিন্তু যাওয়ার পথ বন্ধ। আমাদের ট্যুর কর্তৃপক্ষও বলে দিয়েছেন বিড়লা মন্দির দেখেই ফিরে আসতে হবে। ফিরে এলাম।

বাস এসে দাঁড়াল রামনিবাস গার্ডেনের বাইরে। আমরা ঢুকি এলবার্ট মিউজিয়ামে। মিউজিয়ামটি আজ বন্ধ। বাজারেও আজও ভাঁটার ছুটি। অর্কিটেকচারাল ডিপার্টমেন্টের সবই আজ বন্ধ। ফলে মিউজিয়ামে ঢোকা হল না। আমরা ঢুকলাম চিড়িয়াখানায়। রামনিবাস বাগিচার মধ্যেই চিড়িয়াখানা, সেন্ট্রাল মিউজিয়াম এবং টেগোর মেমোরিয়াল থিয়েটার হল। টেগোর মেমোরিয়াল থিয়েটার হলের আর এক নাম রবীন্দ্র মঞ্চ।

রামনিবাস বাগিচাটি জয়পুর শহরের দক্ষিণাংশে আজমীর গেট এবং সাঙ্গানির দরজার মধ্যে অবস্থিত। ১৮৬৮ সালে মহারাজা রামসিং দ্বিতীয়, জনসাধারণের প্রয়োজনে তৈরি করেন। এই বাগিচায় ক্লাব এবং ইনডোর-আউটডোর খেলার বন্দোবস্তও আছে।

৭০ একর জমির উপর বাগিচাটি গড়ে তুলতে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। বাগানে রয়েছে সুন্দর সুন্দর লন। বিভিন্ন গাছ এবং সবুজে ছাওয়া। আজ মিউজিয়াম বন্ধ। সুতরাং ঢুকলাম চিড়িয়াখানায়।

চিড়িয়াখানায় ঢুকেই দেখছি বাগানে হরিণ এবং জলাশয়ে কুমির। শতাধিক কুমির রয়েছে এই চিড়িয়াখানায়। তারপর খরগোস, সারস পাখি (grater Adjutant Stork) ইত্যাদি। পরের গ্যালারীতে হনুমান (spider monkey), লেঙ্গুর (বানর) ভোঁদড় (জল মানুষ) দেখে এলাম সিম্পাঞ্জি গ্যালারীর সামনে।

চিড়িয়াখানার কর্মচারি সিম্পাঞ্জীকে ফল খাওয়াচ্ছেন---মুসম্বি লেবু, কমলা লেবু, খোসা ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সিম্পাঞ্জী মহাশয় টপাটপ রসটা চুষে নিয়ে কর্মচারীর হাতের পাত্রে ফেলে দিচ্ছে ছিবড়েগুলো। এর পরের গ্যালারীতে কালো ভালু (ভাল্লুক) এবং লাল ভালু (ভাল্লুক), এছাড়া বিভিন্ন জাতের বাঘ, সিংহ এবং হনুমান।

এই চিড়িয়াখানার মধ্যে রয়েছে একটি মিউজিয়াম। মিউজিয়ামে পশুপাখির দেহ ঔষধ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে. এই সবই চিড়িয়াখানার এক অংশে রয়েছে। এর বিপরীত দিকে রাস্তার অপর অংশে রয়েছে পাখির রক্ষণাগার। একই টিকিটে পাখিও দেখা যায়।

পাখির গ্যালারিতে রয়েছে সারস পাখির বিভিন্ন জাত, ময়ূর, উটপাখি, এমু, কবুতর, টিয়া, মোরগ, হাঁস ইত্যাদি ছোট ছোট পাখি। চিড়িয়াখানা দেখা শেষ। আমরা ফিরে এলাম বাসে। বাস শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এসে পড়ল হাওয়া মহলের সামনে। না, বাস এখানে থামেনি। কেননা হাওয়া মহলও আজ বন্ধ। বাস এসে পড়ল সিটি প্যালেসের কম্পাউণ্ডের মধ্যে। সিটি প্যালেসও আজ বন্ধ। বাস প্যালেস চকে এক চক্কর ঘুরে এসে দাঁড়াল যন্তর-মন্তরের সামনে।

জয়পুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এই যন্তর মন্তর। এটি একটি মান মন্দির। অর্থাৎ জ্যোতিষ পর্যবেক্ষণ গবেষণাগার। মহারাজা সোয়াই জয়সিং এই মান মন্দিরটি তৈরী করান। মান মন্দিরটির অবস্থান সিটি এলাকার বাইরে বড় রাস্তার ধারে। মুবারক মহলের পাশে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় বাচ্চাদের খেলাধুলার পার্ক।

কেননা কোন যন্ত্র উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পাথরের দেওয়ালের মত দেখতে। আবার কোথাও অর্ধ চন্দ্রাকারে উঁচু দেওয়াল। কোথাও গভীর কুয়ো। সব মিলিয়ে খেলার জায়গা বলেই মনে হয়। অথচ এগুলো মহামূল্যবান জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্র। ভিতরে ঢোকার পর গাইড আমাদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বলতে থাকেন—'শুনুন, এই যে সিমেণ্ট এবং পাথরের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দেখছেন এই সবটা মহারাজা জয়সিং এর মান মন্দির---আমরা বলি যন্তর মন্তর। যন্তর-মন্তর কথাটি সংস্কৃত শব্দ যন্ত্র মন্ত্র থেকে এসেছে। অর্থাৎ যন্ত্রের সহায়ে হিসাব নিকাশ। দিন রাত বিভিন্ন ঋতু যুগ অর্থাৎ মহাকালের খণ্ড অংশের পরিমাপ এবং বিভিন্ন গ্রহাদির অবস্থান নির্ণায়ক গবেষণা কেন্দ্র।

জ্যোতির্বিদদের মতে--

৬ (শ্বাস কাল)	=	১ পল
৬০ পল	=	১ ঘটিকা
৬০ ঘটিকা	=	১ দিন বা রাত
৩০ দিন বা রাত	=	১ মাস
১২ মাস	=	১ বছর।

মান মন্দিরে দিন রাত পরিমাপের যন্ত্র যেমন রয়েছে তেমনি ঋতু এবং দিক নির্দেশক যন্ত্রও আছে, আছে মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক যন্ত্র। সব মিলিয়ে মহারাজা জয়সিং-এর

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মান মন্দিরটি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণও এই মান মন্দিরের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

তাদের মতে **'A logical Landscape in stone'**.

এইবার আমরা যন্ত্রগুলোর সঙ্গে পরিচিত হই। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ঢুকেই বামদিকের প্রথম যন্ত্রের নাম লঘু সম্রাট যন্ত্র।

লঘুসম্রাট যন্ত্র **(small sun dial)** – মার্বেল পাথর সিমেন্টে গাঁথা, যন্ত্রটিতে দুটি অংশ, প্রতি অংশে ঘণ্টা, মিনিট এবং সেকেণ্ডের দাগ কাটা।

সময় সূচক যে কাঁটাটি দেখছেন, সকাল বেলা রোদ পড়লে তার ছায়া বামদিকের স্কেলে পড়ে এবং দুপুরে কোন ছায়া পড়ে না। সূর্য যত পশ্চিমে ঢলে পড়ে ছায়া তত দীর্ঘ হয় এবং ডানদিকের স্কেলে তার ছায়া পড়ে। এভাবে দুদিকের স্কেলের পরিমাপের সাহায্যে দিনের বেলা সময় জানা যায়। এ যন্ত্রকে সূর্যঘড়ি বা নারোল বলে।

নারোলের পাশেই রয়েছে ধ্রুবনল বা উত্তর মেরু কেন্দ্র দর্শন **(Pole Star Instrument)**– এই যন্ত্রের সাহায্যে ভৌগোলিক উত্তর মেরু নির্ণয় করা যায়।

ধ্রুব দর্শন যন্ত্র দেখার পর আমরা রাজ যন্ত্র **(Yantra Raj)** দেখি। এখানে যে দুটি উজ্জ্বল ধাতুর পাত দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে বাইরের পাতটির বহিঃবৃত্তে ২৪ ঘণ্টার পরিমাপকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আর ভিতরের বৃত্তে ৩৬০ ডিগ্রীকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রহগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

অন্য পাতের সাহায্যে গ্রহগুলো পরস্পরের মধ্যে কত সময়ে এবং কত দ্রুত গতিতে পরস্পরকে অতিক্রম করছে তা বোঝা যায়। কেননা গ্রহগুলোর ছবি এবং প্রতিবিম্ব এই উজ্জ্বল পাতে দেখা যায়।

রাজ যন্ত্রের পরে আমরা এসে দাঁড়াই 'নারী' যন্ত্র **(Narivalaya Yantra)**-র সামনে। ২১শে মার্চ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বব পর্যন্ত সূর্য উত্তর গোলার্ধে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ এর পর দক্ষিণ গোলার্ধে থাকে। সূর্যের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে এই যন্ত্র ভারতীয় প্রমাণ সময় **(Indian Standard Time)** নির্ণয় করে।

নারীর পর দেখি করযন্ত্র। করযন্ত্রের সাহায্যে বিষুব মণ্ডলের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

এর পর আসি ভট্টিযন্ত্রের সামনে।

ভট্টি **(Dakshino Bhitti Yantra)**—যন্ত্র রাজের পিছনে রয়েছে এই যন্ত্র উত্তর—দক্ষিণ-এ লম্বা দেওয়াল। এর পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ডিগ্রী এবং মিনিটের দাগ কাটা। দাগগুলো দেখার সুবিধার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়।

সম্রাট যন্ত্র **(Samrat Yantra)**—পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের যন্ত্র সমূহের রাজা। শুধু বৃহদায়তন নয় এর কার্যকারিতা এবং গঠন প্রণালী দেখে অবাক হতে হয়। জয়পুরের সময় নির্ধারণ

হয় সোলার পদ্ধতিতে। সম্রাট যন্ত্র নিঁখুত ভাবে সময় নির্ধারণ করে। এর পেণ্ডুলামটি ৯০ ফুট উঁচু। পেণ্ডুলামের দুদিকে এক চর্তুথাংশ বৃত্তের স্কেল রয়েছে। যার মধ্যে ঘণ্টা মিনিট এবং সেকেণ্ডের দাগ কাটা। লঘু সম্রাট যন্ত্রের মতই এর কার্যকারিতা।

লঘু সম্রাট যন্ত্রের মতই দিনের আলোয় সূর্যের ছায়ার সাহায্যে ভারতীয় সময় মাপা হয়। তবে এর বাড়তি আকর্ষণ রাতেও সময় মাপা যায়। এছাড়া অতিবৃষ্টি, ঝড় সম্বন্ধে নিঁখুত তত্ত্ব জানা যায়।

জয় প্রকাশ যন্ত্র **(Jai Prakash Yantra)**—এই যন্ত্রটি মহারাজা জয়সিং-এর অনন্য কীর্তি। সব যন্ত্রের শেষে তৈরি করেন যন্ত্রটি। অন্যান্য যন্ত্রের রিডিং এবং ত্রুটি বিচ্যুতি এ যন্ত্রের সাহায্যে সংশোধন করা হত। মূলতঃ এটি মহাকাশ গবেষণা যন্ত্র।

বিরাট একটি গর্তকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভক্ত গর্ত দুটোই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

উভয় ক্ষেত্রে ৬টি মার্বেল পাথরের স্কেল বসানো আছে। প্রতি স্কেল-এ মিনিট এবং সেকেণ্ডের দাগ কাটা। আবার প্রতি স্লাবে ০ থেকে ৯০ ডিগ্রী এবং ৯০ থেকে ০ ডিগ্রী দাগ কাটা আছে।

যন্ত্রের মাঝখান থেকে একটি রিং ঝুলানো আছে। রিংটি সূর্যের প্রতীক। গর্তে ঢুকে যাতে রিডিং নেওয়া যায় তারও ব্যবস্থা আছে।

পূর্বদিকে সূর্য যখন উদয় হয় তখন রিং-এর প্রতিচ্ছবি পশ্চিম দিকের পাথরের গায়ে পড়ে। আবার দুপুরের পর থেকে পূর্ব দিকের গর্তের গায়ে সূর্যের প্রতিচ্ছবি পড়ে। এর সাহায্যে সূর্যের আনত কোণ মাপা হয়। এভাবে যন্ত্রটির সাহায্যে এক সময় মহাকাশ গবেষণা হত। হিন্দু শাস্ত্র মতে বিয়ে এবং উৎসবাদির গণনা ও গ্রহগুলোর অবস্থানের উপর নির্ভর করে শুভ-অশুভ সময় নির্ণয় করা হত। শুধু তাই নয়, এ যন্ত্রের সাহায্যে ভারতীয় সময়ও নির্ণয় করা হত।

রাশি যন্ত্র (Rashivalaya Yantra) - জয়প্রকাশ এবং সম্রাট যন্ত্রের মাঝখানে অবস্থিত এই যন্ত্রের কলেবর বিরাট। কেননা বারটি যন্ত্র এর অন্তর্গত। প্রতিটি যন্ত্র এক একটি রাশির ফলাফল গণনা করে। এই রাশিচক্রের সাহায্যে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ পরিমাপ করা হয়।

রামযন্ত্র বা রামকৃষ্ণ যন্ত্র (Ram Yantra)— দুটি গোলাকার পাথরের চোঙ এক নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড় করানো আছে। চোঙ দুটি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেকটির মাঝখানে রয়েছে চোঙের উচ্চতার সমান সরল রড। উভয় চোঙের নিচের দিকে ছটি করে ত্রিকোণাকার পাথরের স্লাব বসানো আছে।

সূর্যের আলোয় রডের প্রতিবিম্ব দেওয়াল গাত্রে পড়ে। দেওয়াল গাত্রের স্কেলের রিডিং থেকে সূর্যের গতিপথ এবং ছায়ার সঠিক অবস্থান বোঝা যায়। রাম যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহদের

অবস্থান যেমন জানা যায় তেমনি আবহাওয়ার সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়।

কাপটি যন্ত্র—এই যন্ত্রের সাহায্যে ছায়া পথ নির্ণয় করা হয়।

চক্র যন্ত্র (Chakra Yantra)—পাথরের থামের উপর বসানো গোলাকৃতি যন্ত্রটির মধ্যস্থলে গর্ত করা। আর এই গর্তের মধ্যে পর্যবেক্ষণ যন্ত্র বসানোর ব্যবস্থা আছে। যন্ত্র দুটি ভূ'পৃষ্ঠের সমান্তরালে ডানে-বাঁয়ে সরানোর ব্যবস্থা আছে। চক্র যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান এবং গতিপথের কথা জানা যেত।

দিগংশ যন্ত্র (Digansa Yantra)—দিগংশ যন্ত্রের গঠন খুব মজাদার। অনেকটা পুলের মত। যন্ত্রের মাঝখানে প্রায় এক মিটার উঁচু আর একটি যন্ত্র লাগানো আছে।

যন্ত্রটির সামনে পরপর দুটি দেওয়াল রয়েছে।

শেষের দেওয়ালে দুটি তামার তার বাঁধা। তার দুটি পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্ণয় করে।

এই দিগংশ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের দিক্ ছাড়া সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সময় এবং আবহাওয়ার সঠিক তথ্য জানা যেত।

যন্তর-মন্তর দেখা শেষ।

যন্তর মন্তর দেখে ফিরে এলাম বাসে। বাস প্যালেস কম্পাউণ্ড এবং হাওয়া মহল, সুভাষ চক ছাড়িয়ে [illegible] ঢুকল। তারপর অম্বর রোড ধরে এগিয়ে চলল। অম্বর রোড হাইওয়ের সঙ্গে মিশে দিল্লী রোড নামে পরিচিত। অম্বর রোডের ডান পাশে জল মহল।

জলমহল (Jal Mahal):

শহর থেকে সাত কি. মি. দূরে অম্বর রোডের পাশে দেখা যায় একটি বড় লেক। লেকটির নাম মান সাগর। এই মান সাগরে দ্বীপের মত কতগুলো বাড়ি জেগে আছে। বেশির ভাগ বাড়ি জলের তলায়। শুধু একটি বাড়ি বাগিচা সমেত জেগে আছে জলের মধ্যে। এই মহলটির নাম জলমহল।

জলমহল তৈরি করেন মহারাজা প্রতাপ সিং। এই মহলটি জয়পুর মহারাজাদের প্রমোদাবাস ছিল। খুব গরমের সময় তাঁরা এখানে এসে বাস করতেন বংশ পরম্পরায়। অম্বর রোডের পাশে একটি বিশেষ স্থান থেকে মহলটি ভাল দেখা যায়। জলমহল দেখে ফিরে আসি।

বাস এসে দাঁড়াল R. T. D. C (রাজস্থান টেক্সটাইল ডেভলপমেণ্ট করপোরেশান)-র শো রুমে। এখানে হ্যাণ্ডলুমের শাড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ, বেড কভার, উলের লেপ ••••• ইত্যাদি তৈরি হয়। এই সব পোষাকের বিভিন্ন প্রিন্ট ন্যাচারাল পদ্ধতিতে ব্লকের সাহায্যে তৈরি।

জয়পুরী প্রিন্টের মহারাণী শাড়ি, ঘাগরা ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়। তাছাড়া পাথরের তৈরি বিভিন্ন মূর্তি এবং হরেক রকম সাজ সরঞ্জাম রয়েছে। বিক্রিও হচ্ছে ভাল। ভিপি করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।

শোরুমে ঢোকার মুখে ব্লকের সাহায্যে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রিন্টিং করে পর্যটকদের দেখানো হচ্ছে। প্রতিটি পোষাকে হাতের কাজ।

R. T. D. C- র শোরুম থেকে একে একে আমরা সকলে বাসে ফিরে এলাম। বাস অম্বর রোড ধরে আর একটু এগিয়ে এসে হোটেলের সামনে থামে। এখানে আমাদের দুপুরের লাঞ্চ সারা হবে।

লাঞ্চ সারা হল।

আবার বাস চলতে শুরু করেছে। এবার আমাদের লক্ষ্য অম্বর প্যালেস। দুর্গনগরী অম্বরে রয়েছে অম্বর প্যালেস এবং যশোরেশ্বরীর মন্দির। অম্বর দুর্গে পৌঁছানোর আগে রাজপুতানার এই আদি শহরের কথা আলোচনা করা যাক।

চার

জয়পুর থেকে ১১ কিমি দূরত্বে উত্তর-পশ্চিম কোণে এবং ২৬°৫৯ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৫°৫৯ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

দুর্গনগরী অম্বর জয়পুরের প্রাক্তন রাজধানী। তখনকার রাজপুতানার ধুন্দর রাজ্যের রাজধানী অম্বর। জয়পুর এবং অম্বরের গাইড বইতে জয়পুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

The old name of the state was 'Dhundar' meaning a deserted tract. Its rulers, the 'Kachwahas' are emigrants from Gwalior and Narwar. They lost Gwalior in 966 A.D. but before the end of the eleventh century they were firmly established at Ambar, the old capital of the state.

সুতরাং ধুন্দরের রাজধানী অম্বরে জনবসতি একাদশ শতাব্দীর আগেও ছিল। মীনা এবং ভীলগণ ছিল রাজপুতানার আদি অধিবাসী। তাদের হাতেই গড়ে উঠে অম্বর জনপদটি এবং রাজপুতানার কাছাওয়া রাজ্য।

শঙ্কুমহারাজ বলেছিলেন "আনুমানিক ১১৫০ খৃষ্টাব্দে দুলহার বংশধরগণ শাশ্বত মীনাদের কাছ থেকে অম্বর অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তারপর থেকে প্রায় ছ'শ বছর অম্বরেই রাজ্যের রাজধানী ছিল।"

এই দুলহা রায় বা তেজকরণ ছিলেন কাছাওয়া রাজবংশের বজ্রদমনের অষ্টম বংশধর। তিনি ১১২৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে ধুন্দরে আসেন। তাঁর গোয়ালিয়র ত্যাগ করার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেন দুলহা রায়ের পিতা সোধাসিং-এর অকাল

মৃত্যুর পর তাঁর কাকা তাঁকে তাড়িয়ে দেন। আবার অনেকে বলেন যে তিনি মোরাণরাজ চৌহানের কন্যা মারুণীকে ভালবাসতেন। মারুণীর জন্য তিনি নিজ রাজ্য ভাগনেকে দান করে গোয়ালিয়র ছেড়ে এদেশে চলে আসেন।

দুলহা রায়ের পিতা সোধাসিং ছিলেন কুশের তেত্রিশতম বংশধর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দুলহা রায়ের পরবর্তী বংশধরগণ অর্থাৎ জয়পুরের মহারাজাগণ ছিলেন সূর্যবংশীয় কাছাওয়া রাজপুত।

১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে বিহার মল্ল অম্বরের সিংহাসনে বসেন। তখন শেরশাহের রাজত্বকাল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজা পরিস্থিতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। ইতোমধ্যে শেরশাহের মৃত্যু হয়। ১৫৫৫ সালে হুমায়ুন দিল্লী অধিকার করেন। ১৫৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

রাজা বুঝলেন দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাকলে তিনি নিরাপদে থাকতে পারেন। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে আকবর কালিখো পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে দিল্লী পর্যন্ত পুরানো হাইওয়ে ধরে খাজা মুইন-উদ-দিন চিস্তির সমাধি দর্শন করতে আজমীরে গেলেন।

সে সময় রাজা বিহার মল্ল তাঁর পুত্র ভগবান দাস এবং পৌত্র মানসিংকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন থেকেই অম্বর এবং দিল্লীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ভাবনায় ছেদ পড়ল। কেননা বাস এসে থেমেছে একটা প্রশস্ত প্রান্তরে। এখানে অনেক গুলো বাস, অটো-রিকসা, জিপ দাঁড়িয়ে আছে। দোকানও আছে অনেক, আমাদের আগেও ট্যুরিস্টরা এসেছেন। চারদিকে লোকে গিজ্ গিজ্ করছে।

বাস থেকেই দেখতে পেলাম পাহাড়ের উপরে দুর্গ। ঐ দুর্গেই আমরা যাব। নেমে পড়ি। বাগিচার পথ ধরে এগিয়ে চলেছি।

ঐ যে সামনে দুর্গ ...... অম্বর দুর্গ।

খুব সুরক্ষিত দুর্গ, কেননা পাহাড়টির দক্ষিণে এবং পুব দিকে জলাশয় -- মাওটা হ্রদ। মাওটা হ্রদের জন্য দুর্গটি খুব নিরাপদ স্থানে অবস্থান করছে।

পাহাড়ের পাদদেশে দুটি বাগিচা। খুব সুন্দর পরিবেশ।

বাগিচার পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। দুজন গাইড এগিয়ে আসে। দরদস্তুর করে একজন গাইড ঠিক করি। কেননা গাইড ছাড়া এমন ঐতিহাসিক দুর্গটি দেখা সম্ভব নয়।

গাইড বলতে শুরু করেন—আমরা যে বাগিচা দিয়ে চলেছি এটির নাম দিলা - রাম - কা বাগ।

"দিলারামরা দুই ভাই ছিলেন এই অম্বর প্যালেসের স্থপতি। দু'ভাই—দিলারাম এবং মোহন। সোয়াই জয়সিং দু'ভাইয়ের নামে বাগিচা তৈরি করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

"দিলারাম বাগিচায় দেখছেন চার কোণে চারটি ছত্রী। এর দুটির গঠন একরকম ……আর এই যে দুদিকে দুটি বিল্ডিং দেখছেন এর একটি গেস্ট হাউস এবং একটি বিশ্রাম কক্ষ।

"গেস্ট হাউসে তখনকার দিনে দিল্লী থেকে আগত অতিথি যারা মুইন-উদ-দিন চিস্তির দরগায় যেতেন তাদের থাকার ব্যবস্থা হত। ……. আর বিশ্রাম কক্ষটিতে যারা মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা হত।"

গাইড একটু থামলেন। কিন্তু থামেনি এগিয়ে চলা। সামনে আর একটা ছোট বিল্ডিং দেখছি। গাইড বলেন—

"…… সামনের বিল্ডিংটি দেখছেন, এটি অর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, এই বাগিচাটি হ্রদের বাঁধের উপর তৈরি .... হ্যাঁ পুরো বাঁধটাই মানুষের তৈরি বাঁধ।"

চলুন …… , এগিয়ে চলি বাগিচার উত্তরে দিকে। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে তিনি বলেন "ঐ দেখুন একটি মসজিদ।"

হ্যাঁ শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে দেখছি একটি মসজিদ।"

" মহামতি আকবর যখন অম্বরে আসতেন তখন নামাজ পড়ার জন্য মসজিদটি তৈরি করে দেন বিহার মল্ল।"এগিয়ে চলি।

বেশ সুন্দর বাগিচা। দেখতে দেখতে চলে আসি বাগিচার দক্ষিণ দিকে …… বাঁধের শেষ সীমানায়। হ্রদের জল পরিস্কার। মাছ কিলবিল করছে জলে।

আমাদের গাইড বলেন—

" ……. ঐ দেখুন মাওটার জলের মধ্যে গড়ে উঠেছে আর একটি বাগিচা, এটি মোহন বাড়ি বা মোহন বাগিচা। ……. দেখছেন বাগিচাটি কি সুন্দর! …… বাড়ির ছাদ নক্সার আকারে গড়া হয়েছে—কার্পেটের নকশা, আরো উপরে যখন উঠবো দেখবেন কত সুন্দর দেখায়।"

মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। বাগিচার পরে সিঁড়ি পথের শুরু হয়েছে। গাইড বলেন—মোট ১২৮টি সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরে উঠবো। এটি সংক্ষিপ্ত পথ। আর একটি পথ আছে। সেটি ঢালু পথ এবং শহরের সঙ্গে যুক্ত।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। অনেকটা খাড়াই পথ। ৫০০ ফুট উঁচুতে দুর্গ। সুতরাং বেশ কষ্ট হচ্ছে। আমার পথ প্রদর্শক বলছেন—ঐ ঢালু পথ দিয়ে এলে এত কষ্ট হত না। কিন্তু সময় লাগে প্রচুর। আপনাদেরতো সময় কম। ঐ চড়াই পথ দিয়ে রাজার আমলে হাতি ঘোড়া ওঠা নামা করত সৈন্যসামন্ত নিয়ে। আর এখনও হাতি যাতায়াত করে ঐ পথ দিয়ে দর্শনার্থীদের নিয়ে। এমনকি জয়পুরের রয়াল ফ্যামিলির লোকজনও যাতায়াত করেন গাড়ি চেপে ... শিলামাতার মন্দিরে পূজা দে-। সিঁড়ি পথের শেষে দুর্গের প্রথম তোরণ সুরযপোল। তোরণ পেরিয়ে পৌঁছাই দুর্গে। জয়গড় দুর্গ অম্বর দুর্গ নামেই পরিচিত। মহারাজা মানসিং ১৬০০ সালে এর সংস্কার কার্য শুরু করেন· শেষ করেন রাজা সোয়াই জয়সিং।

তিনি মুঘল স্টাইলে আরো কয়েকটি বাড়ি তৈরি করেন। মূল বাড়িটি তৈরির একশ বছর পরে এ বাড়িগুলো তৈরি হয়। কিন্তু কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই। চার দিকে সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় সমতল ভূমি। সুদীর্ঘ পর্বতশীর্ষ। তার উপরই ঐতিহাসিক অম্বর দুর্গ গড়ে উঠেছে।

দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে ঢুকেই সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ দেখছি—এর নাম জালিব চক। জালিব চকের তিন দিকেই ছোট ছোট ঘর। এই সব ঘরে সে সময় সৈন্যসামন্ত থাকত। এ ঘরগুলি ছিল সৈন্যদের ব্যারাক, এছাড়া অভ্যাগতদের ঘর এবং আস্তাবল।

আস্তাবলটি পশ্চিমদিকের ঘরগুলোর সমষ্টি।

জালিব চকের পশ্চিম দিকে আর একটি তোরণ রয়েছে। এর নাম চাঁদপোল। জালিব চকের দক্ষিণ দিকে প্রাসাদ।

খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। একজন জল বিতরণ করছে। এগিয়ে যাই সে দিকে। আঁজলা করে জলপান করলাম। তারপর চলে এলাম প্যালেসের মূল প্রবেশ পথে। এই তোরণটির নাম সিংহপোল। সিংহপোলটি পেতলে মোড়া। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

দেখতে পাচ্ছি সুবিস্তীর্ণ বাঁধানো চাতাল:

দেওয়ান - ই - আম ঃ

প্রথমে পড়ল চাতাল বা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে চৌকোণা দেওয়ান ই আম। জয়সিং এই আম - দরবারটি তৈরি করান।

আমদরবারের তিনদিক খোলা। ধূসর রংয়ের মর্মর ও বেলে পাথরে তৈরি। কারুকার্য করা চল্লিশটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভের শীর্ষে খোদাই করা হাতির মূর্তি। প্রতি দুটি স্তম্ভের মধ্যে আর্চ করা কাজ। দেওয়ালে রঙ্গীন রাজপুত চিত্র। ফ্রেস্কো পেন্টিং-এ আঁকা চিত্রগুলো দেখে এলাম বাইরে।

আর একটি তোরণ। নাম গণেশ পোল। তার পর প্রশস্ত অঙ্গন। এই তোরণটিও সোয়াই জয়সিং তৈরি করান। গণেশ পোলের উপরে সোহাগ মন্দির। সোহাগ মন্দির—রাণীদের অন্দর মহল। এখানে সবই মার্বেল পাথরে তৈরি। সোহাগ মন্দিরে বসে রাজমহিষীগণ আমদরবারের অনুষ্ঠান দেখতেন। এই গেটটি ভারী সুন্দর। দেওয়ালে রঙ্গীণ চিত্র। তারই মাঝে আয়না ফিট করা। অপূর্ব সুন্দর জালির কাজ। শ্বেত পাথরের পরদা।

সোহাগ মন্দির থেকে রাজমহিষীগণ ফুল ছুঁড়ে রাজাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। উঠানের চারদিকে বিভিন্ন প্রাসাদ। সোহাগ মন্দির থেকে এলাম জয়মন্দিরে। জয়মন্দির দেওয়ান - ই - খাস হিসাবে পরিচিত।

দেওয়ান - ই - খাস ঃ

মির্জ্জা রাজা জয়সিং তৈরি করেছেন জয়মন্দিরটি। তিনি দিল্লী এবং আগ্রার আদলে এটি

তৈরি করেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্যকলার অপরূপ সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে এখানে। দেওয়াল, ছাদ এবং শ্বেতপাথরের স্তম্ভগুলোতে খোদাই কাজ। এছাড়া লতা পাতা ফুল ও প্রজাপতির জীবন্ত চিত্র। প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে শিল্পীদের।

জয়মন্দিরের জনপ্রিয় নাম শীষ মহল।

শীষমহল ঃ

শীষমহলও তৈরি করেন মির্জা রাজা জয়সিং। দুটি আয়তাকার পাশাপাশি ছোট ঘর। চারদিকে বারান্দা বেষ্টিত। দুটো ঘরই মোজাইক করা। একটির ছাদ ডিম্বাকৃতি এবং দেওয়ালে অসংখ্য আয়না বসানো।

শীষ অর্থাৎ শীষা বা আয়না। এই মহলে অসংখ্য আয়না থাকার জন্য যদি অন্ধকার ঘরে মোমবাতি জ্বালানো হয় তাহলে প্রতিবিম্বিত হয়ে অসংখ্য মোমের আলো জ্বল জ্বল করতে দেখা যায়। গাইড বললেন এই মহলটি রাজারাণীর শোবার ঘর—বেডরুম।

পাশের ঘরেও অসংখ্য আয়নার কাজ। তিনি একটি মোম জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন যেন আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে আছে। তিনি রসিকতা করে বললেন— আকাশের তারা দেখুন আর নিজেকে মহারাজ ভাবুন। গাইডের কথা শুনে সবাই হেসে করতালি দিল। খুব ভাল লাগল। শীষ মহলেও সর্বত্র কারুকার্য করা ।

এই শীষ মহলের ছাদের উপর আর একটি মহল আছে। এর নাম যশমন্দির অর্থাৎ গৌরব গৃহ। উঠে আসি দ্বিতলে।

যশ মন্দির ঃ

হ্যাঁ গৌরব করার মত বটে। এটিও মির্জা রাজা জয়সিং তৈরি করান। এই মহল থেকে লেক ও পাহাড়ের দৃশ্য চমৎকার দেখায়।

মহলের স্তম্ভগুলো ইতালি মার্বেল পাথরের তৈরি। এই পাথরের বৈশিষ্ট্য হল ঠাণ্ডার সময় পাথর গরম থাকে এবং গরমের সময় ঠাণ্ডা। এখন গরম। আমরা হাত দিয়ে দেখলাম পাথর বেশ ঠাণ্ডা।

আবার নিচে নেমে আসি। জয় মন্দিরের বিপরীতে রয়েছে সুখ মন্দির।

সুখ মন্দির ঃ

১৬০১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মানসিং এর মহিষী কঙ্কাবতী তাঁর প্রিয়তম পুত্র জগৎসিং এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করান এই মন্দির। পরে মানসিংও একই উদ্দেশ্যে পাহাড়ের পাদদেশে জগৎ শিরোমনি মন্দির তৈরি করান।

এই দুটি মন্দিরের সঙ্গে ভক্তগায়িকা মীরাবাঈ-এর অক্ষয় স্মৃতি জড়িয়ে আছে। জগৎ শিরোমণি মন্দিরটি প্যালেসের পশ্চিম-উত্তর কোণে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সে কথা পরে বলছি।

সুখ মন্দিরের মূল চেম্বারে জলপ্রপাত তৈরি করা হয়েছে। মার্বেল পাথরের তৈরি জলপ্রপাতে গরমের দিনে জল ঠাণ্ডা থাকে। মন্দিরের দরজায় হাতির দাঁতের কাজ। এই মন্দির এবং সুখ-নিবাসের উত্তরে ডাইনিং হলে ফ্রেসকো পেইন্টিং এর কাজ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় চিত্র অঙ্কিত, হাতির দাঁত এবং চন্দন কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য মন কাড়ে। শ্বেত পাথরের জালির কাজে শিল্প নৈপুন্য প্রকট।

এর পর হামাম ঘর।

হামাম মানে স্নান। মানসিং-এর স্নান ঘর। এর পর জেনানা মহল। অর্থাৎ রাণীদের অন্তঃপুর। এক সারি কুঠরি। এসব ঘরে রাণীরা থাকতেন ভাবাই যায় না।

প্যালেস দেখা শেষ।

ফিরে এলাম জালিব চকে। প্যালেসে ঢোকার মুখে দেখেছিলাম মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন দেখছি সে লাইন এগোতে শুরু করেছে। মা যশোরেশ্বরীকে দর্শনের জন্য ভক্তগণ এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমিও সে লাইনে জায়গা করে নিই।

যশোরেশ্বরী মন্দির ঃ

মহারাজা মানসিং-এর তৈরি মন্দির। এককালে অম্বরের মহারাজাদের গৃহ দেবী, আজকাল জনসাধারণের পূজা পাচ্ছেন।

মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দেখি কতগুলো কলা গাছ। সবুজ পাতা সমেত গাছগুলো পাথরের তৈরি। মন্দিরটি শ্বেত পাথরের দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের দেওয়াল এবং স্তম্ভগুলোতে সুন্দর খোদাই কাজ।

মন্দিরের দুটি অংশ।

নাট মন্দির এবং গর্ভ মন্দির। ভক্তগণ নাট মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি করছেন। আমি এগিয়ে গেলাম গর্ভ মন্দিরের দিকে। অনেক কষ্টে জায়গা করে দেখলাম মায়ের অনিন্দ্য সুন্দর উজ্জ্বল কালো মূর্তি। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, গলায় জবা ফুলের মালা। বামের তিন হাতে ঢাল, ধনুক, আর মহিষাসুরের জিহ্বা ধরা। ডানের তিন হাতে খড়্গ, তীর এবং ত্রিশূল।

মা এখানে মহিষমর্দিনীরূপে পূজিতা। দেবীর মাথার পিছনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং কার্তিকের মূর্তি দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় লোকেরা বলেন শিলা মাতার মন্দির।

অনেকে পূজা দেবেন। অনেকে মায়ের কাছে আশীর্বাদ কামনা করছেন। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবছি—

কেমনে পূজিব মা তোমার চরণ
ভক্তিতে অতি দীন
এ হেন ভারত পথিক
কৌতুহল আর দেখার আগ্রহে লইনু তব স্মরণ।

পূজার যতেক বিধি
সবই থাক তোমার স্নেহধন্য ভক্তের জন্য
তারাই ধন্য হোক ধন-ধান্যে
আমায় শুধু আশীর্বাদ করে ধন্য কর,
যেন স্মরি তব মূর্তি
ভক্তির অঞ্জলি ভরে।।

যশোরেশ্বরী অম্বর রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শিলামাতাকে যশোরেশ্বরী বলার কারণ —যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনের জঙ্গলে মূর্তিটি খুঁজে পান।

কোথায় বাংলা আর কোথায় রাজস্থান! ধর্মসূত্রে এক প্রদেশের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রদেশের মানুষের কত নিকট সম্পর্ক। বস্তুত এত বড় দেশ ভারতবর্ষের ঐক্যের মূলে নিহিত রয়েছে সনাতন ধর্মের সৌরভে গড়া কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

দেবী মূর্তি দেখতে দেখতে মনে পড়ে পুরানো দিনের কথা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে সুন্দরবনের শাসক বার ভুঁইয়াদের একজন ছিলেন প্রতাপাদিত্য। ইনি যশোর বা চান্দেকানের জমিদার ছিলেন। তাঁর পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায় ছিলেন যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলার বিদ্রোহ দমনে মোঘল বাহিনী এগিয়ে গেলে প্রতাপের সঙ্গে মুঘলদের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হন। মুঘল সেনাপতি মানসিং প্রতাপের সঙ্গে অপূর্ব কষ্টি পাথরে তৈরি পীঠ মূর্তিটি আগ্রায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকে অম্বরে।

প্রতাপ সুন্দরবন অর্থাৎ যশোরেশ্বরীপুর বা ঈশ্বরীপুরে জঙ্গল সাফ করে যশোরেশ্বরী দেবীর পাষাণময়ী মূর্তিটি আবিষ্কার করেন। জায়গাটি তখনকার দিনে যমুনা ও ইছামতীর মিলন স্থলের দক্ষিণে ছিল।

(সংবাদ সূত্র--সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, লেখক--নরীন্দ্র নাথ দে)।

রাজপ্রাসাদের এবং যশোরেশ্বরী মাতা মন্দির দেখে ফিরে এলাম জালিব চকের পশ্চিম দিকে। চাঁদপোল দিয়ে দুর্গের বাইরে আসি। দেখা যাচ্ছে পর্বতের পাদদেশে পুরানো শহরকে। মেঠোপথ ধরে নামতে থাকি। পথের পাশে পড়ল জগৎশিরোমণি মন্দির।

জগৎশিরোমণি মন্দির ঃ

মন্দিরটি নাকি বিহার মল্লের সময়ে তৈরি হয়েছিল। মহারাজা মান সিং এর কিছু সংস্কার করে তাঁর প্রিয়পুত্র জগৎ সিং এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নাম দেন জগৎশিরোমণি মন্দির। জগৎশিরোমণির অকাল মৃত্যু হয়।

মন্দির প্রাঙ্গণ আয়তক্ষেত্রাকার এবং সিমেন্টে বাঁধানো। প্রবেশ পথের তোরণটি মার্বেল পাথরের তৈরি। গেটের দু'দিকে দুটি হাতি। মন্দিরের সামনে গরুড়মূর্তি। ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড়মূর্তিও জনসাধারণের পূজা পাচ্ছেন। গর্ভ মন্দিরের সামনে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর

প্রিয় শিষ্যা মীরা বাঈ। তাঁদের পিছনে ভগবান বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী দেবী। পূজা দেব-দেবী, কৃষ্ণ সাধিকা মীরা এবং ভগবান কৃষ্ণকে প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে আসি।

উপত্যকার পথ ধরে চলেছি। গাইড বললেন, "এখানে নরসিংজী মন্দির, অম্বিকেশ্বর মহাদেব মন্দির, কল্যাণজী মন্দির, এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির আছে। তিনি জানতে চান— সে সব দেখবেন কি ?

—না, আমার সময় হয়ে গেছে এখন ফেরা দরকার। যে পথ দিয়ে ফিরছি সে পথ থেকে এসে পৌছাই অম্বর দুর্গে ওঠার পাথর বাঁধানো ঢালু পথে। পথের গোড়াতেই দেখছি ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান অফিস — অম্বর।

ফিরে এলাম দিলারাম বাগিচায়। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে চলেছি বাসের দিকে। না, ভাবনার কোন কারণ নেই। আমার সহযাত্রীগণও সবাই ফেরেননি। অনেকে কেনাকাটা করতে গেছেন। আমি ঢুকলাম খাবারের দোকানে। তার পর বাসে ফিরে আসি।

বাস এগিয়ে চলেছে বড় রাস্তা ছেড়ে। যে পথে চলেছে সে পথের দুধারে কাঁটাওয়ালা বাবলা গাছের বন, বাস নেমে এল নাহারগড় পাহাড়ের পাদদেশে, কী সুন্দর জায়গা! বিড়লা মন্দিরের পাশ দিয়ে ঘুরে বাস এসে দাঁড়াল কনক বাগে

কনক বাগে তিনটি দ্রষ্টব্য— পুরানো গোবিন্দজী মন্দির, কনক বৃন্দাবন এবং বিড়লা মন্দির। বাস থেকে নেমেই আমরা এগিয়ে গেলাম কনক বৃন্দাবনের দিকে। সবাই তাই করে। এখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। জনপ্রতি দুটাকা।

কনক বৃন্দাবন ঃ

কনক বৃন্দাবনের পোশাকী নাম ঘাতোয়া। ঘাতোয়া জয়পুর শহরের উত্তর - পূর্ব কোণে অবস্থিত। এর দক্ষিণে জলমহল সরোবর।

এটি মহারাজাদের উদ্যানময় সমাধিস্থান। ক্ষেত্রটির চারদিকে প্রাচীর পরিবেষ্টিত। চার কোণে চারটি ছত্রী। ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বড় ছত্রী। সব মিলিয়ে পঞ্চ আয়তন মন্দিরের রূপ পেয়েছে. সব কয়টি ছত্রী একই রীতিতে গড়া।

মহারাজা সোয়াই জয়সিং (২য়) এর ছত্রীটি জয়পুরী মার্বেল পাথরে তৈরি এবং জয়পুরী নকশা উৎকীর্ণ হয়ে আছে এর গায়ে। জয়সিং-এর ছত্রীর উত্তরের ছত্রীও কারুকার্যে যথেষ্ট সুন্দর। এই ছত্রীটি মহারাজা রামসিং-এর।

সমস্ত সমাধি ক্ষেত্রটিতে মহীসূরের বৃন্দাবন গার্ডেনের অনুকরণে ফোয়ারা এবং বাহারি গাছে সজ্জিত। এই জন্য সমাধি ক্ষেত্রটির আর এক নাম কনক বৃন্দাবন।

কনক বৃন্দাবন থেকে বেরিয়ে এলাম. গোবিন্দজী মন্দির এখনও খোলেনি। পাঁচটায় খুলবে। চলে এলাম কনক বৃন্দাবনের উত্তরে। এখানে রয়েছে বিড়লা মন্দির।

বিড়লা মন্দির ঃ

পুরানো নটরাজ মন্দিরের স্থান স্থাপন করেছেন জি পি বিড়লা। নটরাজ মন্দিরটি

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল। মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মুখেই দেখছি একটি ফলক। তার গায়ে খোদাই করা আছে—

THE NATWARJI TEMPLE
WAS RESTORED THROUGH
THE INSPIRATION OF
SHRI & SHRIMATI
G. P. BIRLA BY
HINDUSTAN CHARITY TRUST
CALCUTTA
IN THE YEAR 1990

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই দেখছি বাঁধানো প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পূর্ব দিকে দুটি ছত্রী। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে দক্ষিণে কনক বৃন্দাবন এবং জলমহল সরোবর দেখাচ্ছে খুব সুন্দর।

নটরাজ মন্দিরটি শ্বেত পাথরের তৈরি। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বুক সমান উঁচুতে মন্দিরের নাটমন্দির ও গর্ভগৃহ। মন্দির এখন বন্ধ। মন্দিরের আরাধ্য দেবকে দর্শন না করেই ফিরে এলাম কনক বাগে।

কনক বাগে বড় রাস্তার পাশে দ্বিতল মন্দির কমপ্লেক্স। উপর তলায় মন্দির। নিচের তলায় দোকান এবং কমপ্লেক্সের দেখাশুনার লোকজনের থাকার ঘর।

কমপ্লেক্সের তিন দিক ঘুরে দেখলাম। রাস্তার দিকে একটা সাইন বোর্ডে নজর পড়ল। তাতে লেখা :—

FOUNDED BY LATE SHRI B. M. BIRLA
RESTORATION OF
GOVIND DEOJI'S TEMPLE COMPLEX
([illegible] A.D) AT KANAK VRINDAVAN.

গোবিন্দ মন্দিরের সংস্কার করেন বি এম বিড়লা। গোবিন্দ দেওজী মন্দির কমপ্লেক্সের উপরের তলায় মন্দির। হিন্দুস্থান চ্যারিটি ট্রাস্ট-এর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে মন্দিরটি।

এখন পাঁচটা বাজে। গোবিন্দজীর মন্দির খুলেছে। আমার সহযাত্রীগণ ফিরেছেন বাসে। আমি ছুটে যাই মন্দিরের পূর্ব দিকে। মন্দিরটি পূর্বদিকে মুখ করা। গাত্তোর সমাধি ক্ষেত্রের লাগোয়া মন্দির। উত্তর দিক দিয়েও মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ি রয়েছে। আমার দেখা দেখি আমার আর একজন সহযাত্রী ছুটে এলেন।

ভালই হল।

বাস আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না। মন্দিরের ভিতরের কারুকার্য খুব সুন্দর। কিন্তু সময়াভাবে দেখার আর উপায় নেই।

মন্দিরের আরাধ্য দেবতা গোবিন্দজীকে প্রণাম করে বাইরে আসি। এদিকে মন্দিরে পূজা শুরু হয়ে গেছে। খুব খারাপ লাগল। কিন্তু কিছুই করার নেই। কনডাকটেড ট্যুরের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে।

[illegible]

বাস ছেড়ে দিল। আজকের মত ভ্রমণ শেষ।

আমরা ফিরে চলেছি জয়পুরে। জয়পুরের অনেক অদেখা জায়গা রাজস্থান ভ্রমণের শেষ দিনে দেখেছিলাম। শেষের কথা আগেই বলে নিতে হচ্ছে কেননা জয়পুরের কথা পাশাপাশি থাকা উচিত।

অক্টোবরের ষোল তারিখ রণথম্ভোর দুর্গ দেখে ফিরে এলাম জয়পুরে। যদিও আমার প্রোগ্রাম ছিল রণথম্ভোর থেকে ভরতপুর যাওয়ার এবং সতের তারিখ ভরতপুর পাখিরালয় দেখে রাত তিনটা আগ্রাফোর্ট স্টেশনের বিশ্রামাগারে কাটিয়ে যোধপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস ধরে বাড়ি ফেরা। কেননা, ফেরার টিকিট জয়পুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত কাটা আছে। সুতরাং আগ্রাফোর্ট স্টেশন থেকে উঠলে কোন অসুবিধা হবে না।

কিন্তু জয়পুরের ভাল ভাল দ্রষ্টব্যগুলো বাদ পড়ে যাওয়ায় ফিরে আসতে হল জয়পুরেই। সতের তারিখ সকাল সাড়ে আটটায় হোটেল সুশীল প্যালেস থেকে বেরিয়ে পড়ি। স্টেশন রোডে থানার বিপরীতে অনেকগুলো খাবারের দোকান।

সকালের জলযোগ সেরে নিলাম। থানার পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি মিনি বাস। যাবে সাঙ্গানীর গেট। আমি ওদিকে যাব কেননা আজকের ভ্রমণ বাস এবং ট্যাক্সিতে ঘুরে ঘুরে সারব। চাপলাম মিনি বাসে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাস ছেড়ে দিল। নামলাম রামনিবাস গার্ডেনের সামনে।

রামনিবাস গার্ডেন :

এই সুন্দর বাগিচাটি শহরের দক্ষিণ দিকে অজমীর গেট এবং সাঙ্গানীর গেটের মধ্যে অবস্থিত। মহারাজা রাম সিং বাগিচাটির পরিকল্পনা করেন এবং ১৮৬৮ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। বাগিচাটিতে ইনডোর এবং আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে।

এছাড়া লন সমেত ক্লাব আছে।

সত্তর একর জমির উপর বাগিচাটি তৈরি করতে তখনকার দিনে খরচ হয়েছিল চার লাখ টাকা। পরবর্তীকালে স্যার মীর্জা ইসমাইল-এর ট্রাস্টির টাকা দিয়ে পার্ক এবং ফুলের বাগিচা করে এর সৌন্দর্য বাড়ানো হয়।

আরো পরের কথা।

বাগিচার মধ্যে ১৮৮৬ সালে গড়ে উঠে সেন্ট্রাল মিউজিয়াম। আরো পরে মিউজিয়ামের

সামনে একটি ছোট চিড়িয়াখানা এবং রবীন্দ্র মঞ্চ গড়ে উঠে। চিড়িয়াখানা আগেই দেখেছি। এখন রবীন্দ্র মঞ্চের চারদিকে এক চক্কর ঘুরে নিলাম।

রামনিবাস গার্ডেনের শোভাবর্ধন করছে পার্ক এবং ফুলের বাগিচা। তার মাঝখানে জলের ফোয়ারা। বড় বড় মহীরূহ সমগ্র গার্ডেন জুড়ে। সুন্দর উদ্যান।

চেষ্টা করলাম গুরুদেবের মূর্তিসহ মঞ্চের একটা ছবি নেওয়ার। কিন্তু তা হল না। কেননা স্ট্যাচুর পিছনের দিকে সূর্যকিরণ পড়েছে। মিউজিয়াম এখনও বন্ধ। পরে দেখব। ফিরে আসি সাঙ্গানীর গেটে। সাঙ্গানীর গেটের কাছে চৌরাস্তা।

চৌরাস্তা থেকে সিটি বাস ধরি। অটো ভ্যানের মধ্যে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করে যাত্রীবাহী সিটি বাস করা হয়েছে। আর এই যানটি জয়পুর শহরে প্রচুর দেখা যাচ্ছে। শহরে যানবাহনের মধ্যে রিকশা, অটো রিকশা, টাঙ্গা, বাস, মিনিবাস যথেষ্ট আছে।

নেমে পড়ি শিরে-দেউরী-কা দরজার সামনে। শিরে-দেউরী বাজার সিটি প্যালেসের পূর্ব দিকে। এগিয়ে চলি সোজা পশ্চিম দিকে। শিরে-দেউরী সিটি প্যালেসে ঢোকার প্রধান প্রবেশ পথ। সিটি প্যালেসে ঢোকার দক্ষিণ দিকে ত্রিপোলি তোরণ এবং পূবে শিরে-দেউরী।

বিরাট অঞ্চল নিয়ে সিটি প্যালেস এলাকা। এই এলাকার চারদিকে সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের নাম সারহাদ। জয়পুর প্রাসাদ নগরী নামে খ্যাত। এই গোলাপী শহরে যত প্রাসাদ আছে তার আয়তন মূল শহরের এক ষষ্ঠাংশ জায়গা দখল করে আছে।

প্রধান তোরণের পরে আর একটি। এ গেট পার হতেই সিটি প্যালেস কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। প্রথমে পড়ল জালিব চক। এটি সিটি প্যালেসের বহিরাঙ্গণ।

জালিব চক :

সিটি প্যালেস কম্পাউণ্ড। মহারাজাদের রাজত্বকালে জালিব চক খুব কর্মমুখর এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কম্পাউণ্ডের চারদিকে দেওয়াল। দেওয়ালের লাগোয়া ছোট ছোট কুঠরি। এছাড়া ছিল একটা বড় হল ঘর — টাউন হল। এখন টাউন হলে বিধান সভা হয়েছে। বিধান সভা ভবনের বামদিকের প্রাচীর লাগোয়া কুঠরিগুলোতে হয়েছে বিভিন্ন অফিস।

জালিব চকে ঢোকার মুখে দেখেছি পুলিশ ফাঁড়ি। পুলিশ ফাঁড়ি, বিধান সভা, এবং বাহাদুর অফিসগুলো দেখতে দেখতে চলে এলাম জালিব চকের পশ্চিম প্রান্তে। দক্ষিণ দিকে রয়েছে জয়পুর নগর নিগম অফিস। আর পশ্চিম প্রান্তে ট্রাফিক পরিবহন অফিস।

মহারাজার আমলে এই ঘরগুলো মহারাজার আপ্ত সহায়কের (Personal Secretary) অফিস ছিল। রাজকর্মচারীগণ রাজ্যের হিসাব নিকাশ ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ এখানে করতেন। বাকি কুঠরিগুলো বাইরের অভ্যাগত এবং সৈন্যদের জন্য বরাদ্দ ছিল। আর মাঝখানের এই যে এতবড় জায়গা তখন ফাঁকা ছিল।

মহারাজাদের আমলে উৎসব কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে যে সব বড় বড় মিছিল বের

হত তার জন্য হাতি, ঘোড়া, অন্যান্য যানবাহন এখানে এসে জড় হত। আর আছ ছোট ছোট চায়ের দোকান ও অন্যান্য অস্থায়ী দোকান বসেছে।

জালিব চকের পশ্চিম দিকের গেট অর্থাৎ উদয় পোলে টিকিট কাটলাম। তারপর গণেশ পোল দিয়ে ঢুকে পড়লাম সিটি প্যালেসে। দক্ষিণা ত্রিশ টাকা। ক্যামেরার জন্য আলাদা চার্জ।

সিটি প্যালেস :

মহারাজা জয়সিং-এর হাতে গোড়াপত্তন। পরবর্তী মহারাজাদের হাতেও সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন মহল। সব মিলিয়ে এক অসাধারণ রাজপ্রাসাদ। এই রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন অংশ যেমন —দেওয়ান - ই - আম, দেওয়ান - ই খাস, চন্দ্র মহল এবং মুবারক মহল।

দেওয়ান - ই - আম :

মহারাজাদের সময়ে আমদরবার বসত এখানে। এখন এটি মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে মস্ত বড় হল ঘর।

বিভিন্ন পোশাকের স্টল পেরিয়ে ঢুকলাম মিউজিয়ামে। ঢোকার মুখে রয়েছে একটি প্রমাণ সাইজের ঘোড়া। যেন দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে এমনি ভঙ্গি। ঢোকার পরেই সবাই এখানে জড় হয়। আমার নজর কাড়ল হলের ছাদ। মস্ত বড় ঝাড় লন্ঠন। এটি রয়েছে ছাদের মাঝখানে। এছাড়া আরো মাঝারি মাপের ঝাড় লন্ঠন আছে।

নিচে মেঝেতে বিভিন্ন সেকশান করা হয়েছে। চারদিকের দেওয়ালে মাঝে মাঝে কার্পেট টাঙ্গানো। বাম দিক থেকে দেখছি ১৬৫০ সালে তৈরি কার্পেট। পাশাপাশি দু'পিস কার্পেট, সাইজ — ২৭.১০´´ × ১৫.৫´´। পাশের দু'পিস লাহোরে তৈরি সাইজ - ২৭.৫ × ৯.৪´´ এবং ৫৭.৫´´ × ১৬.২´´ এরকম অনেক কার্পেট ঝুলছে দেওয়ালে। কার্পেটের মাঝে মাঝে বিভিন্ন মহারাজাদের তৈলচিত্র এবং আর্টের সম্ভার।

তৈলচিত্র প্রচুর। তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নৃত্য এবং রাগমালা খুব ভাল লাগে।

চিত্র দেখতে দেখতে এলাম পুঁথিখানায়। এই গ্রন্থাগার বিশ্বের প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম। প্রাচীন পুঁথির সম্ভার। ফার্সী এবং আরবী ভাষায় লেখা বহু পুস্তক, তার মধ্যে রয়েছে রাজনামা'র পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ মহাভারতের ফার্সী অনুবাদ। এটি অনুবাদ করেছেন আবুল ফজল—মহামতি আকবরের সুযোগ্য সখা ও সভাসদ পণ্ডিত। ইনি যেমন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তেমনি ছিলেন ঐতিহাসিক।

বিভিন্ন পুস্তক কাচের বাক্সে খোলা অবস্থায় রয়েছে যাতে পড়া যায়। মহারাজা জয়সিং-এর সংগৃহীত মানচিত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও দর্শনের বই এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রপাতি সবই কাচের বাক্সের মধ্যে রয়েছে। প্রত্যেক প্রদর্শনীতে লেখা রয়েছে তার উৎস স্থান কাল ও অন্যান্য বিবরণ। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

সব শেষে এলাম বড় ঝাড় বাতির নিচের গ্যালারীতে। এখানে দোলনা, পালকি— বিভিন্ন রকম পালকি সাজানো। এসব মহারাজাদের সময়ে ব্যবহার হত। একে একে সব দেখতে ভাল সময় লাগল। আজ আর কনডাকটেড ট্যুর কর্তৃপক্ষের তাড়া নেই। কেননা একাই এসেছি।

মিউজিয়াম থেকে এলাম দেওয়ান - ই - খাস মহলে।

দেওয়ান - ই খাস ঃ

খাস মহলের চারদিকে রয়েছে পাকা উঠান। উঠোনের পরেই বিভিন্ন মহল। গোলাপী রংএর বাড়ি। খাস মহলের ছাদ অনেকগুলো স্তম্ভের উপর ধরা রয়েছে। ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড় লন্ঠন। খাস মহলের চার দিক দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমান আলো ঢোকার ব্যবস্থা রয়েছে।

রাজাদের সময়ে এখানে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হত। আর এখন হচ্ছে গঙ্গাজলির প্রদর্শনী।

খাস মহলের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথের দুদিকে দুটি করে শ্বেত হস্তী। লন থেকে কয়েক ধাপ উঁচুতে গোলাকৃতি ছাদের নিচে বিরাট হল। প্রবেশ মুখে পিতলের তৈরি মজবুত দরজা।

দক্ষিণ দিকের প্রবেশ মুখে প্রদর্শিত হচ্ছে দুটি গঙ্গাজলী। দুটি মস্ত বড় পিতলের পাত্র। এই সিটি প্যালেসে বসেই গোবিন্দ নারায়ণ এবং মহাদেব নারায়ণ দু'ভাই দুটি পাত্র তৈরি করেন। পাত্র তৈরি করতে সময় লেগেছিল দু'বছর।

বড়টির ওজন ৩৪৫ কেজি, উচ্চতা ৫´ ৩´´, পরিধি ১৪´ ১০´´। পাত্রটিতে ৯০০ লিটার জল ধরে। এই বিস্ময়কর জলের পাত্র দুটি তৈরি করান মহারাজা সোয়াই মাধোসিং। তিনি পাত্র দুটি করে গঙ্গার পবিত্র জল নিয়ে গিয়েছিলেন।

দেওয়ান - ই - খাস দেখে এলাম চন্দ্র মহলে। দেওয়ান - ই - খাসের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এ মহল।

চন্দ্র মহল ঃ

সাততলা বিশাল প্রাসাদ। গোলাপী রংএর প্রাসাদ।

সবচেয়ে ওপরের মহলটির নাম 'মুকুট মহল'। মুকুট মহল থেকে সারা শহর এবং চারদিকের পাহাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে খুব মুগ্ধ হলাম।

চন্দ্র মহল অনেকগুলো মহলের সমষ্টি। যেমন, প্রীতমমহল— মহারাজাদের শীতকালীন আবাস। শিলেখানা—অস্ত্রাগার, রঙ্গমন্দির, সুখনিবাস, ছবিনিবাস এবং শ্রীনিবাস। নিচের তলায় চন্দ্রমন্দির ও প্রীতমহল। আর ওপরের তলায় মুকুট মহল।

এবার বলি, কিভাবে দেখা শুরু করেছি। খাস মহল থেকে চন্দ্রমহল চত্বরে ঢুকে দেখি এখানেও বিশাল লন। তার চারদিকে বিল্ডিং। চন্দ্র মহলের দিকেই লোক ঢুকছে।

ত্রিশ টাকার টিকিটে তিনটি দ্রষ্টব্য দেখা যায়-মিউজিয়াম, শিলেখানা এবং টেক্সটাইল গ্যালারী। এক একটা দ্রষ্টব্য স্থানে ঢোকার মুখেই টিকিটে ছাপ মেরে দেওয়া হয় যাতে দর্শক দ্বিতীয় বার ঐ টিকিটে সে দ্রষ্টব্য না দেখতে পারে। এছাড়া অন্যান্য মহল যত খুশি ঘুরে দেখা যায়।

মিউজিয়াম রয়েছে দেওয়ান - ই - আম এ, তা আমার দেখা হয়ে গেছে। শিলেখানা রয়েছে চন্দ্রমহলে। সব দেখে শিলেখানায় ঢুকব। আর টেক্সটাইল গ্যালারীতে টিকিট দেখাতে হয়। সেটি রয়েছে মুবারক মহলে। চন্দ্রমহল দেখার পর যাব মুবারক মহলে।

প্রথমে চন্দ্রমহল চপ্র মন্দিরে।

গ্রাউন্ড ফ্লোর অর্থাৎ নিচের তলাটি তৈরি করেন মহারাজা জয়সিং। এখানে কাছাওয়ার মহারাজাদের তৈলচিত্র এবং প্রচুর মৌর্য চিত্র দেখতে পাচ্ছি। ছাদ এবং দরজার কাজ খুব আকর্ষণীয়। ছাদে পিতলের কাজ আর দরজায় চন্দন কাঠের উপর হাতির দাঁতের কাজে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখে অবাক হই।

পাশেই শ্রীতম নিবাস—মহারাজাদের শীতকালীন আবাস। শ্রীতম মহল শ্বেতপাথরের তৈরি। এখানে রাজসিংহাসন সহ রাজাদের অনেক ব্যবহার্য বস্তু রয়েছে।

মহারাজা জয়সিং-এর পরে বিভিন্ন মহারাজাদের হাতে সংযোজন হয়েছে বিভিন্ন মহলের। কিন্তু কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই। উপরের দিকে এগিয়ে চলি। সর্বত্র দেখছি রাজপুত চিত্র। মানসিং-এর গার্ড অফ অনার এবং বিভিন্ন সময়ের শীর্যোচিত চিত্র দেখছি দেওয়াল গাত্রে। সিঁড়ি পথের দু'পাশে এসব চিত্র শোভা পাচ্ছে।

প্রচুর টুরিস্ট এসেছেন। কেউ দেখছেন। কেউ দেখতে আসছেন। কেউবা দেখে চলে যাচ্ছেন। ফলে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছে। এরমধ্যে একদল টুরিস্ট হুড়মুড় করে উঠে আসছেন। তাদের মধ্যে বাঙ্গালী বেশি।

তাদের টিকিট নিয়ে নিয়েছেন গাইড ছাপ মেরে নেবেন বলে। সবাই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে শীলেখানায়। আমিও তাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ি।

শীলেখানা মানে মহারাজাদের অস্ত্রাগার। অস্ত্রেরতো আর শেষ নেই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অস্ত্র। বিভিন্ন গ্যালারিতে সাজানো। মহারাজারা যে সব যুদ্ধ করেছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহাসিক যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত অস্ত্রের বিশাল সংগ্রহ।

সব চেয়ে ভাল লাগল মহারাজা মানসিং-এর ইতিহাস প্রসিদ্ধ তরবারিটি। যার ওজন এগার পাউণ্ড। এই তরবারিটি সম্রাট আকবর মহারাজাকে উপহার দিয়েছিলেন। আর ভাল লাগল সোনার বন্দুক দেখে।

বন্দুকটি সোনার না পিতলের! কেউ বলতে পারল না।

যেহেতু এই দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম, এদের সঙ্গেই বাকিটা দেখলাম। দ্বিতলে রয়েছে রঙ্গমন্দির। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠতলে শোভা নিবাস এবং শ্রীনিবাস। আর সাততলার

মুকুট মহল। মহারাজাদের সময় এই মহলে রাজ্যাভিষেক উৎসব হত। শোভা নিবাস কয়েক হাজার আয়নায় সাজানো। এই সব বিভিন্ন রং এর আয়নায় প্রতিবিম্বিত ঝলমলে আলোয় উদ্ভাসিত শোভানিবাস সত্যিই শোভা বিতরণ করে চলেছে, যা লোভনীয়।

এসব দেখে নেমে আসি চন্দ্রমহলের সামনের লনে। এখানে একটি মজার ঘটনা ঘটল। কয়েক জন কর্তব্যরত রাজপুত প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘিরে রয়েছে কয়েকজন বিদেশী পর্যটক. বিদেশী পর্যটকদের অনুরোধে একজন রাজপুত তার মাথার পাগড়ী খুলে নিলেন পাগড়ীর কাপড় মুড়ো করে দেখালেন।

তারপর পুরো কাপড়খানা খুলে দেখানো হল। বেশ লম্বা কাপড়।

বিদেশী পর্যটকগণ দেখে খুশি।

আমরাও খুশি বিদেশী পর্যটকদের কাণ্ডকারখানা দেখে। বিদেশী পর্যটকগণ মেলে ধরা কাপড়ের ছবি নিলে. কেউ মুভি ক্যামেরায়. কেউবা সাধারণ ক্যামেরায়।

রাজপুত প্রহরী এবার যত্নের সঙ্গে পাগড়ী পরে দেখালেন এবং বিদেশী পর্যটকদের সালুট করলেন। তাতে বেশ ভাল বকশিস মিলল।

চন্দ্রমহল থেকে এলাম মুবারক মহলে। এই মহলটি দেওয়ান - ই - খাসের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

মুবারক মহল ঃ

মহারাজা মাধোসিং কর্তৃক নির্মিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি অতিথিদের থাকার প্রয়োজনে মুবারক মহল তৈরি করেন। এই জন্য মহলটির নাম অতিথি আলয় বা মুবারক মহল।

জয়পুর মার্বেল পাথর এবং স্থানীয় পাথরে তৈরি। মহলটিতে প্রচুর খোদাই কাজ দেখা যাচ্ছে মহলের বাইরের দিকের স্ক্রীন বেলকনি আর্চ এবং ব্রেকেটের আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য দেখবার মত। এখানে রয়েছে টেক্সটাইল সেকশন এবং কস্টিউমস গ্যালারী।

ঢুকে এলাম দিতলে। উনিশে শতাব্দীর তৈরি পোষাকের উপর এমব্রয়ডারীর কাজ। তারপর বাদ্য যন্ত্র। তানপুরা, সারেঙ্গি, মৃদঙ্গ ...... ইত্যাদি পর পর সাজানো রয়েছে।

আত্ম সুখ---গুড়গুড়ি মহারাজা মাধোসিং এর রাজত্বকাল ১৭৫০ থেকে ১৭৬৮ সালের মধ্যে তিনি ব্যবহার করতেন এই গুড়গুড়িটি। এই গ্যালারীতে তার ব্যবহৃত কোট জ্যাকেট ও অন্যান্য জিনিস রয়েছে. পরের গ্যালারী শাড়ীর গ্যালারী। এখানে উড-ব্লকে তৈরি শাড়ি. চাদর. অন্যান্য বস্ত্র. কাশ্মীরি শাল এবং অন্য প্রদেশের শাল রয়েছে।

৩০০ বছরের পুরানো নাচের ব্যবহৃত সরঞ্জাম।

কস্টিউমস গ্যালারীতে রয়েছে সাজের প্রদর্শনী। বলাবাহুল্য সাজের নায়িকারা সব পুতুল। আসরের কেন্দ্রমণি রানী মহারানী সাজতে বসেছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য

দশজন দাসী দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকের হাতে এক একটা সাজের জিনিস ধরা। সবই রানীর সাজের জন্য দরকার হত।

কস্টিউমস মিউজিয়ামে কোট, শাড়ি, এমব্রয়ডারির কাজ করা আরো অনেক সংগ্রহ যেমন লম্বা কুর্তা, কাঁচুলি, ওড়নি আরো কত কি !

মুবারক মহল দেখে উদয় পোল দিয়ে প্যালেসের বাইরে আসি। জালিব চক। জালিব চকের উত্তর সীমানার দিকে চলেছি। জালিব চকের উত্তর দিকের গেট দিয়ে প্যালেস কমপ্লেক্সেসের বাইরে আসি।

প্যালেসের পিছনে রয়েছে গোবিন্দজীর মন্দির। বাঁধানো পথ ধরে চলেছি গোবিন্দজীউর মন্দিরে। পথের বামদিকে প্যালেস। ডানদিকে মহাসতী সাবিত্রীর মন্দির বা কোটড়ীধাম। মন্দিরের সামনে রয়েছে কিছু দোকান পাট। খাবার, বই, ব্যসন-কোসন, মালা, দেবস্থানের এবং গোবিন্দজীউর ফটো। এছাড়া পাথরের মূর্তি এবং পাথরের জিনিস।

এসব ছাড়িয়ে আসতেই পড়ল একটি তোরণ। প্যালেসের পিছনে বাগান এলাকায় ঢোকার প্রথম তোরণ। বেশ মজবুত তোরণ। বাগান এলাকায় দুটি মহল রয়েছে। একটি বাদল মহল। অন্যটি মহারাজা জয়সিং-এর বাসস্থান। বাদল মহল এখনও আছে আর জয়সিং এর বাসস্থান পরিণত হয়েছে দেবস্থানে—গোবিন্দজীউর মন্দির।

সিটি প্যালেস তৈরি হওয়ার পরে জয়সিং এই বাসস্থান তৈরি করেন। প্রথম রাতে জয়সিং যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন এক স্বর্গীয় আভা বলছেন "এটি দেবস্থান, এখানে তোমার থাকা চলবে না।" মহারাজ সে দেব নির্দেশ পালন করেন। পরদিন সকালে মহারাজ চন্দ্র মহলে চলে আসেন। মনে আন্দোলন হতে থাকে—কোথায় সে বাঞ্ছিত দেবতা?

কিছুদিনের মধ্যে দিল্লীর মুঘল দরবার থেকে খবর এল—"বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব আদেশ করেছেন মথুরা এবং বৃন্দাবনের সমস্ত দেবালয় ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দাও এবং ঐ দুই নগরীর নাম রাখ ইসলামাবাদ ও সেমিনাবাদ।" মুঘল দরবারে উপস্থিত জয়পুরের রাজপ্রতিনিধি যথাসময়ে সে খবর পাঠালেন জয়পুরে।

মহারাজার স্বপ্নের মর্মার্থ যেন এখানে নিহিত রয়েছে।

জয়সিং অন্তর থেকে উপলব্ধি করলেন কয়েকদিন আগের দেখা স্বপ্নাদেশের মর্মবাণী। ভগবান আর তার ভক্তের অন্তরের বোঝাপড়া যেন মূহুর্তে ঘটে গেল।

না!

আর দেরী নয়। এখনই যেতে হবে বৃন্দাবনে।

তিনি কয়েকখানি রথ ও কয়েকশ সৈন্য নিয়ে ছুটলেন বৃন্দাবনের পথে। ঔরঙ্গজেবের সৈন্যগণ মথুরার ধ্বংসলীলা শেষ করার আগেই মহারাজ পৌঁছালেন বৃন্দাবনে। তিনি

অনেকগুলো বিগ্রহ সঙ্গে নিয়ে নিলেন যেমন—গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন মোহন, রাধামাধব, রাধা দামোদর ও বৃন্দাদেবী।

জয় ভগবানের জয়।

অসীম সাহসে ভর করে জয়সিং বিগ্রহদের নিয়ে রাজপুতানার পথে পা বাড়ালেন। তিনি জানতেন অনিষ্টকারীরা মানসিক ভাবে দুর্বল। বিগ্রহদের রাজপুতানায় নিয়ে আসতে পারলে ঔরঙ্গজেবের সাহস হবে না তাদের কলুষিত করতে।

মহারাজের অনুমান সে দিন সত্য হল। তিনি বৃন্দাদেবীকে কাম্যবনে রেখে নির্বিঘ্নে জয়পুরে এলেন। তারপর গোবিন্দজীকে প্রতিষ্ঠা করলেন সিটি প্যালেসের বাগিচায়। আর সেই থেকে গোবিন্দজী জয়পুরের মহারাজাদের গৃহদেবতা।

হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, মন্দির এলাকায় ঢোকার শেষ তোরণের আগে পথের এক পাশে ফুলের দোকান অন্যপাশে ভিক্ষুক বসে আছে। উভয়েরই জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে গোবিন্দজীউর ভক্তদের কেনা ফুল কিংবা দানে। প্রাচীর এবং বাগিচার এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে কিছু হনুমান।

এসব চালচিত্র পেরিয়ে পৌঁছালাম মন্দির প্রাঙ্গণে। শ্বেত পাথরের বাঁধানো প্রাঙ্গণ। ইতোমধ্যে অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে, তার মধ্যে বিদেশী ভক্তও আছে। ভগবানের কাছে সব ভক্তই সমান। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই ভক্ত সবাই ধৈর্যধরে অপেক্ষা করছেন কখন ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করতে পারবেন?

আটটি গোলাকার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে মন্দির গৃহ। মন্দিরের মেঝে অনেকখানি উঁচু। শ্বেত পাথরের মেঝে। চৌকোণা মন্দির। চারদিকে বারান্দা। মন্দিরের দেওয়ালের খোদাই করা কাজ বেশ দর্শনীয়।

নানা ভাষা নানা পোষাকের মানুষ ভগবানের দর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। মন্দিরের দ্বার খোলা কিন্তু দরজায় পর্দা ঝুলছে কেননা এখন দর্শন বন্ধ। ভক্তগণ মাঝে মাঝে গোবিন্দ ভগবানের জয়ধ্বনি করছেন।

অনেক অপেক্ষার পর এল সেই শুভক্ষণ।

সহসা পর্দা সরে গেল। পরম সুন্দররূপে গোবিন্দজীউ দেখা দিলেন ভক্তের কাছে। আমরা নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছি সেই পরম সুন্দরের দিকে।

আহা!

কী সুন্দর! লাবণ্য কান্তিময় এবং মাধুর্যে সমুজ্জ্বল। মুহূর্তে সবার দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ধারা নেমে এল। সবাই মুগ্ধ এবং স্তব্ধ। ভগবানের কী অপার মহিমা। তিনি যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন করুণাবর্ষণ করছেন সবাইকে।

স্বাভাবিক ভাবাবেগে কোন এক ভক্ত ভগবানের জয়গান শুরু করলেন।

গোবিন্দ জয়! গোপাল জয়! জয়!

কেউ কাউকে কিছু বলার আগে সবাই সমবেত কণ্ঠে গোবিন্দের জয়গানে কণ্ঠ মেলালেন। সঙ্গে হাততালি দিয়ে ছন্দোবদ্ধ তালে তালে গোবিন্দের উদ্দেশ্যে ভক্তিগীতি গাইতে লাগলেন। সবার চোখে মুখে এক পরম প্রশান্তি!

জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে ভক্তি বিনম্র কণ্ঠে ভক্তি-সঙ্গীতের সামিল হতে পেরে সবাই পুলকিত।

এরই মধ্যে ভাল করে তাকিয়ে দেখি কারুকার্যখচিত রুপোর সিংহাসনের দিকে। গর্ভ মন্দিরের অধিকাংশ জায়গা অধিকার করে রয়েছে এই সিংহাসন। সিংহাসনের উপরে মন্দিরের উপরাংশে মখমলের চন্দ্রাতপ, আর সিংহাসনে শ্রীরাধা গোবিন্দের দণ্ডায়মান বিগ্রহ মূর্তি।

শ্রীমূর্তি দর্শন করে মনে অর্নিবচনীয় আনন্দ পেলাম। অনুভব করলাম মনেপ্রাণে এক সুন্দর স্পর্শ। আমি ধন্য, পরম সুন্দরের চরণে প্রণতি জানাই। যে কাঙ্খিত বিগ্রহ দর্শনের জন্য একদা শ্রীরূপ গোস্বামী পাগল হয়ে উঠেছিলেন—হায় গোবিন্দ! হায় প্রাণনাথ! বলে ব্রজের গ্রাম ও বনে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

আমি আজ সেই পরম সুন্দরের আশীর্বাদে ধন্য হলাম। ভক্তি নম্রচিত্তে তাঁরই ধ্যান করছি! তিনি যে সবার আপন দীপ্তিময় রাধাগোবিন্দের পরণে মূল্যবান বস্ত্র এবং অলঙ্কার। মাথায় মণিমাণিক্য খচিত সোনার মুকুট। তিনি পুষ্পসজ্জিত দোলায় দণ্ডায়মান। তাঁর পায়ের কাছে দুজন সেবারত সখী। মাথার উপর রুপোর ছত্র।

চন্দন নৈবদ্যের সুগন্ধে মন্দির ম-ম করছে। মেঝেতে ভক্তদের দেওয়া মালা, যেন স্বর্গ ভূমি। রজত-শুভ্র সিংহাসন ও মন্দিরের সামগ্রিক পরিবেশ অপূর্ব শ্রীধারণ করেছে যা সহজে যে কোন ভক্তের মনে শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগ আনয়ন করে।

বেজে উঠল পুরোহিতের হাতের ঘণ্টা, সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ও কাড়া। শুরু হল আরতি —রাধা গোবিন্দের আরাধনা। শব্দ তরঙ্গে বাতাস কম্পমান। মন্দির এবং তার আশেপাশে নেমে আসে ভাব গম্ভীর পরিবেশ। এই স্বর্গীয় পরিবেশের শান্তিস্বর্গ ছুঁয়ে যায় ভক্তের হৃদয়। আরতি শেষ।

পুরোহিত জলন্ত ঘিয়ের প্রদীপ রাখলেন মেঝেতে। তারপর এগিয়ে দিলেন ভক্তজনের সামনে। আমরা দু'হাতে সেই মধুর উত্তাপ গ্রহণ করে যে যার চোখে মুখে হাত বুলাই এবং তৃপ্ত হই।

এর পর পুরোহিত শান্তি জল বর্ষণ করে আমাদের ধন্য করলেন। ভগবানের করুণা ধারা যেন আমাদের অঙ্গে বর্ষিত হল।

দ্বিপ্রাহরিক দর্শন শেষ।

এখন রাধাগোবিন্দজী বিশ্রাম নেবেন। সুতরাং আবার পর্দা টেনে দেওয়া হল। অনেকে পূজা দিয়েছেন তারা প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি চলেছি অন্যত্র।

গার্ডেনের বাইরে আসতেই এক জন যুবক অনুরোধ করল—স্যার, মহারাণী ট্রাস্টে শাড়ি দেখবেন চলুন। ছেলেটির কাতর আবেদনে সাড়া দিই।

—কতদূর যেতে হবে?

—এই—খানিকটা দূরে।

এগিয়ে যাই যুবকটির সঙ্গে। গোবিন্দজী মন্দিরের কাছেই "All Rajasthan Shilpa Gram Udyog" এই শিল্প গ্রাম উদ্যোগ পোষাক পরিচ্ছদ হোলসেলে এবং শোরুমে খুচরা বিক্রি করে। ছেলেটির সঙ্গে ওদের কারখানায় হাতে প্রস্তুত পদ্ধতি দেখলাম। কিনলামও হ্যাণ্ডলুমের তৈরি শাড়ি, বিশুদ্ধ সিল্কের। এরা শুধু পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি করে তা নয় পাথরের রকমারি জিনিষও তৈরি করে।

ওখান থেকে আসি হাওয়া মহলে। সিটি প্যালেস থেকে সামান্য হাঁটলেই হাওয়া মহল।

হাওয়া মহল ঃ

এটি মহারাজাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সোয়াই প্রতাপ সিং মহলটি নির্মাণ করেন। প্রতাপ সিং-এর রাজত্বকাল ১৭৭৮ থেকে ১৮০৩ সাল।

হাওয়া মহলের প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার মুখে টিকিট কাউন্টার। দক্ষিণা দু'টাকা। ভিতরে ঢুকতেই পড়ল নহবৎ খানা, এর স্থাপত্যশৈলী মুগ্ধকর।

রাজপথের পাশে হাওয়ামহল।

রাজপথ থেকে হাওয়া মহলের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখায়। কেননা গঠনশৈলী এমনই, ছোট বড় অনেক গবাক্ষ এবং জালির কাজ। অসংখ্য ঝুলন্ত কক্ষ। সবটাই কারুকার্যখচিত। অর্ধচন্দ্রাকৃতি [illegible]।

সামনে [illegible] থেকে লক্ষ্য [illegible] দেখা যায় এক একটা তলা ছাড়ালে দুদিক থেকে একটু করে কম। [illegible] উপরের দিকে দেখা যায় সরু হয়ে পিরামিডের আকার ধারণ করেছে [illegible] দিয়ে মহলে ঢোকার পথ এবং মহলের প্রাঙ্গণ ও [illegible]।

একটি উঁচু [illegible]কৃতি সিঁড়ি পথে উপরের তলাগুলোতে উঠতে হয়। এই [illegible] সিঁড়ি [illegible]। উঠার পথে দেওয়াল গাত্রে হিন্দু দেবদেবীর [illegible] বারান্দা, বসগৃহ [illegible] অর্থাৎ মহলের [illegible] দ্বিতীয় [illegible] দেখা যায় মার্বেল পাথরের জলাধার।

হাওয়া মহলের সামগ্রিক [illegible] বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার এক আশ্চর্য সংমিশ্রন। একেবারে [illegible]পরের তলা থেকে সমগ্র জয়পুর শহরকে সুন্দর দেখায়। মহলের যেখানেই বসা যাকনা [illegible] প্রাকৃতিক ভাবে হাওয়া ঢোকে হুহু করে। অট্টালিকার গঠনশৈলী এমনই। আর প্রচুর [illegible]ওয়া পাওয়ার কা[illegible]ণেই নাম হয়েছে হাওয়ামহল।

হাওয়ামহল দেখে ফিরে এলাম রামনিবাস গার্ডেনে। এখানে রয়েছে মিউজিয়াম। সকালবেলা তখনও মিউজিয়াম বন্ধ ছিল। এখন খুলেছে।

মিউজিয়াম :

মিউজিয়ামটি রামনিবাস গার্ডেনের মধ্য স্থলে অবস্থিত। ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যকলার একটি সুন্দর নিদর্শন। এই যাদুঘরের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগ্রহ দেখলে রাজস্থানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জানা যায়। মিউজিয়ামটির পোশাকী নাম এ্যালবার্ট হল।

১৮৭৬ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজ এ্যালবার্ট (প্রিন্স অফ ওয়েলস) ভারত দর্শনে আসেন। মহারাজ সোয়াই রামসিং এর অনুরোধে ঐ বছরের ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি এই হলটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই জন্য এই ভবনের নাম এ্যালবার্ট হল।

শ্বেত পাথরের তৈরি ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৮৬ সালে। ১৮৮৭ সাল থেকেই অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং কারুশিল্প বিষয়ক বিভাগ নিয়ে সংগ্রহশালাটির উদ্বোধন হয়।

মিউজিয়ামে প্রচুর সংগ্রহ, বহু গ্যালারী। জয়পুরী শিল্পকলা যেমন—ধাতুমূর্তি, কাঠ ও পোড়া মাটির নিদর্শন। ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র—সাধারণ এবং সামরিক, গয়না, দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা ও পাণ্ডুলিপি। ইজিপ্টের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ যেমন—মৃন্ময় পাত্র, কাঠের কাজ, কাঠের পালিশ, হাতির দাঁত ও চীনামাটির বহু দর্শনীয় জিনিস।

এছাড়া লোকশিল্পের সম্পদ—বিভিন্ন পুতুল ও খেলনা। বিবিধ গ্যালারী। এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি রয়েছে মিউজিয়ামটিতে।

আর রয়েছে আশ্চর্য নকশা। অন্যান্য গ্যালারীর মধ্যে বর্ণবিন্যাসময় পারস্যের উদ্যান গালিচা। মূল কক্ষে রয়েছে এই বিশেষ কার্পেট। ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি কার্পেটটির দৈর্ঘ্য ৯ মিটার এবং ৪ মিটার চওড়া। মির্জা রাজা জয়সিং এটি সংগ্রহ করেন।

নিচের তলার দেওয়াল গাত্রে রাজপুত চিত্রকলা ও বিদেশী চিত্রকলা সম্ভার এবং পাণ্ডুলিপি রয়েছে প্রচুর।

আজকের মত ভ্রমণ শেষ।

সুতরাং জয়পুরের বাকি কথাও সেরে নিই। জয়পুরে মোট তিনদিন ছিলাম। তার মধ্যে ২রা অক্টোবর বিশ্রাম এবং রেলস্টেশান, ইন্টার স্টেটবাস স্ট্যান্ড এবং ট্যুরিস্ট অফিস গুলোর খোঁজ করেই কাটিয়ে দিলাম। ৩রা অক্টোবর কনডাকটেড ট্যুরে দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে বেরিয়ে অনেক স্থান বন্ধ থাকার জন্য দেখা হয়নি। তার জন্যই ষোল তারিখ রণথম্বোর দেখে ফিরে আসতে হল জয়পুরে। অদেখা দ্রষ্টব্যগুলো দেখার জন্য।

জয়পুরে দুদিন ঘুরেও দেখা হল না অনেক কিছু।

যেমন—**নাহারগড় দুর্গ**

গাতোরের বাম দিকে অশ্বক্ষুরাকৃতি পাহাড় শ্রেণী দেখা যায়। এই পাহাড় শ্রেণীর শীর্ষ

দেশে নাহারগড় দুর্গ অবস্থিত। নাহারগড় দুর্গের আর এক নাম সুদর্শন দুর্গ। দুর্গটি যে পাহাড়ে অবস্থিত সেটিকে অনেকটা বাঘের মত দেখায়। এজন্য দুর্গটিকে টাইগার ফোর্টও বলে। দুর্গটির নির্মাণকৌশল এবং অলঙ্করণ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়।

আগে এই দুর্গে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এখন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। সিটি প্যালেসের পশ্চিম দিক থেকে নাহার-রোড ধরে যাওয়া যায় দুর্গে। ১৭৩৪ খৃস্টাব্দে সোয়াই জয়সিং দুর্গটি তৈরি করেন। তারপর ১৮৬৮ - ৬৯ সালে সোয়াই রাম সিং উপরের তলা তৈরি করেন। আরো পরে অর্থাৎ ১৯০২ - ১৯০৩ সালে সোয়াই মাধো সিং আরো কিছু মহলের সংযোজন করেন।

পাহাড়ের উপর দিয়ে ছয় কিলোমিটার দূরে অম্বরের জয়গড় দুর্গের সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে। জয়গড় দুর্গ অম্বর দুর্গ নামেই খ্যাত।

পুরানো ঘাট (পুরানা ঘাট) :

আগ্রারোডের উপরে এই পথটির সঙ্গে রামনিবাস গার্ডেন, সাঙ্গানীর গেট এবং ঘাট গেট-এর সংযোগ রয়েছে। এই রাস্তা ধরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে যেতে পড়ে অমরগড় দুর্গের পথ।

অমরগড় দুর্গের পথের দুপাশে উপত্যকায় দেখা যায় বাগিচা, মন্দির, প্রাসাদ এবং সব শেষে অমরগড় দুর্গ। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা খুব সুন্দর। পুকুর, বাগিচা, ঘন গাছ - গাছালি পাহাড় - অরণ্যের ছায়া শীতল পরিবেশে গ্রীষ্মে যেমন শরীর শীতল হয় তেমনি গ্রীষ্ম ও বর্ষায় এখানকার আরণ্যক পরিবেশ মুগ্ধকর হয়ে উঠে।

গলতা :

জয়পুর শহরের পূর্ব দিকে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। জয়পুর থেকে দূরত্ব ৮ কিমি। শহরের যে কোন জায়গা থেকে কিংবা সুরযপোল থেকে মোটরযোগে পুরানো ঘাট হয়ে গলতা ভ্যালি পর্যন্ত যাওয়া যায়। তারপর পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হয়। অথবা পুরানো ঘাট পর্যন্ত বাসে এসে এখান থেকেও যাওয়া যায় হাঁটা পথে। ১৯৮১ সালে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের দরুণ পুরানো ঘাট ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে তা সারানো হয়েছে। গলতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব সুন্দর। এখানে একদা গালব ঋষি কিছুকাল অবস্থান করছিলেন। তাঁর নামানুসারে জায়গাটির নাম হয় গলতা। কৃপারাম জৈন নামে কোন এক ধনী ব্যক্তি গলতার সূর্যমন্দিরটি তৈরি করেন। সূর্য মন্দির থেকে শহরের দৃশ্য খুব মনোরম। পাহাড়ের পাদদেশে কদম্ব কুণ্ড, চৌবেদি, গোমুখী কুণ্ড ও সূর্য কুণ্ড নামে চারটি সরোবর আছে। সরোবরের তীরে মৌর্যকলায় শোভিত মন্দিরে রয়েছে শ্রী রামচন্দ্রের মূর্তি।

একটি গরুর মুখের মত পাথরের মধ্য দিয়ে পরিস্কার জল সব সময় ঝর্ণাধারার আকারে গড়িয়ে পড়ছে কুণ্ডে। এই ধারাকে গঙ্গা জলের মত পবিত্র মনে করা হয়। এখানে স্নানে পূণ্য হয়।

সাঙ্গানীর ঃ

জয়পুর থেকে ১৬ কিমি দূরে অমনিশ নদীর পশ্চিমতীরে এর অবস্থান। জয়পুর শহরের দক্ষিণ দিকের এই পুরানো শহরে ট্রেনে কিংবা বাসে যাওয়া যায়।

মহারাজা পৃথ্বীরাজের তৃতীয় পুত্র সঙ্গবাবাজীর নামানুসারে এই শহরের নাম হয় সাঙ্গানীর।

এই পুরানো শহরের কিয়দংশ ধ্বংস হয়ে ঘন গাছ গাছালির আড়ালে থাকায় দূর থেকে এর কিছুই বোঝা যায় না। কাছে গেলেই বোঝা যায় অন্য রাজপুতশহরের মত এই শহরও এক সময় কতখানি ঐশ্বর্যশালী ছিল। অন্য রাজপুত শহরের মত এখানেও শহর ছিল উঁচু প্রাচীর বেস্টিত, ছিল কয়েকটি মজবুত তোরণ।

মন্দির, রাজপ্রাসাদ এবং বাগিচা নিয়ে এই শহরের জৌলুষ এখনও অনেকখানি অম্লান। একাদশ শতাব্দীতে তৈরি সঙ্গজীর জৈন মন্দিরও সৌন্দর্যে এবং গঠনশৈলিতে মাউন্ট আবুর জৈন মন্দিরের পরবর্তী স্থান অধিকার করে আছে।

এখানকার নানাবর্ণের সূতীর ছিট কাপড়, প্রিন্টিং এর সূতী বস্ত্র, ফেব্রিক্স ও হাতে তৈরি কাগজের যথেস্ট কদর আছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য চাঁদপুর বাজারে শ্রীরাধা গোপীনাথের মন্দির।

ছয়

জয়পুরের কথা এখন থাক।

যেহেতু রাজস্থান ভ্রমণ শুরু করেছি জয়পুর থেকে। শেষও করেছি জয়পুরে। সুতরাং বাকি কথা শেষেই বলব।

পুরানো কথাতেই ফিরে আসি।

৪ঠা অক্টোবর।

আজ ভোর হয়েছে আজমীরে। গতকাল রাতেই এসেছি এখানে। জয়পুর থেকে আজমীর সড়ক পথের দূরত্ব ১৩২ কিমি। সুতরাং এক্সপ্রেস বাসে সময় লেগেছে তিন ঘণ্টা।

আমি উঠেছি ময়ূর হোটেলে। পর্বত সিনেমার কাছে এই হোটেল। সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙ্গেছে। প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করতে সাড়ে সাতটা বাজল। তারপর তৈরি হয়ে নেমে পড়েছি রাজপথে। খোঁজখবর নিয়ে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান ব্যুরো—আজমীর-এ আসতেই বাজল আটটা। আর তখনই অফিস খুলল।

অফিসটি দু শিফটে খোলে। সকাল ৮টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ৩টা থেকে ৬টা। আজমীরে দুটি ইনফরমেশান অফিস আছে—

(ক) ট্যুরিস্ট অফিস, ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান ব্যুরো। কেয়ার অফ খাদিম ট্যুরিস্ট বাংলো। আজমীর, টেলিফোন নং ২১৬২৬।

আর একটি অফিস আছে রেলস্টেশানে। মেইন গেটের সামনে।

আজমীরে যানবাহনের মধ্যে রিকশা, অটো-রিকশা ট্যাক্সি এবং টাঙ্গা, আর দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু জীপ গাড়ি।

ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান অফিস থেকে বলা হয়েছে আজমীরে কোন কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা নেই।

সুতরাং আমাকে একাই ঘুরতে হবে আজমীরে। ভাবছি কি করা যায়? একার পক্ষে শেয়ার যান ছাড়া ঘোরা ব্যয় সাপেক্ষও। ভাবতে ভাবতে এসে পড়ল একটি অটো রিকশা।

অটোতে চেপেই বললাম চলো আনাসাগর লেক। লেকের ভাড়া দশ টাকা। গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ি একটি বাগিচায়। এটি দৌলতবাগ। সকাল বেলা অনেকে পায়চারি করছে দৌলতবাগে।

দৌলত বাগ ঃ

আনাসাগরের তীরে এই সুন্দর বাগিচাটি তৈরি করেন জাহাঙ্গীর । সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। দৌলতবাগের উঁচু পাড় ঘেঁসে লাগানো হয়েছে অনেক গাছ গাছালি। আজ সব মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বাগিচায় ফুলের উদ্যান।

সম্রাট সাজাহান দৌলতবাগের শেষ সীমানায় শ্বেত পাথরের একটি বাঁধ তৈরি করে দেন। এই বাঁধকে বলে বড়দড়ি। এছাড়া বাঁধের উপর তিনি পাঁচটি ছত্রী তৈরি করেন। এগুলি পথিকের ক্ষণিকের বিশ্রামাগার। নয়নাভিরাম উদ্যান।

আজমীরের অভিজাত পল্লী ছাড়িয়ে দৌলতবাগে নেমেছি। অনেকে এখানে পায়চারী করছেন। আমি এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। সামনে দেখছি একটি বিশাল জলাশয়। জলাশয়ের তিন দিকে দূরে দূরে পাহাড়। এসে পড়েছি আনাসাগরের তীরভূমিতে।

আনাসাগর লেক ঃ

আজমীরের উপকণ্ঠে এটি একটি রমণীয় হ্রদ। দুটি পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ দিয়ে এই কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে। সংযুক্তার স্বামী তৃতীয় পৃথ্বীরাজের পিতামহ অর্নোরাজ বা অনাজি ১১৩৫ থেকে ১১৫০ সালের মধ্যে বাঁধের কাজ সম্পন্ন করেন।

আনাসাগরের পশ্চিম তীরে দাঁড়িয়ে আছি। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি সুউচ্চ পাহাড়। সকাল বেলা যারা পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করি।

— ঐ পাহাড়টির নাম কি ?

— নাগ পাহাড়।

— পুষ্কর কোন দিকে?

— দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, নাগ পাহাড়ের ওপারে।

— আর এই যে ডানদিকের পাহাড়ে একটি মন্দির দেখছি ঐ মন্দিরের নাম কি?

— হনুমান মন্দির।

আনাসাগর একটি সুবিশাল হ্রদ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। হ্রদের উত্তর দিকে দেখছি কয়েকটি বাঁধানো ঘাট। স্থানীয় লোকেরা অনেকে সেখানে স্নান করছেন। দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণে হ্রদের তীরভূমির অনেকটা শুকিয়ে গেছে। এছাড়া বাকি হ্রদ জলে টলমল করছে।

আর এই যে পশ্চিম দিক।

এই তীরে রয়েছে একটি দীর্ঘ ৩৭৮ মিটার নিচু এবং মসৃণ শ্বেত পাথরের পাঁচিল (Parapet), এই পাঁচিলকে বলে বড় দড়ি। পাথরে বাঁধানো বাঁধের উপর রয়েছে পাঁচটি সুন্দর ছত্রী (Pavilion)। তারপরে চমৎকার উদ্যান - দৌলতবাগ

বাঁধের উত্তর দিকের একটি ফলকে লেখা রয়েছে -

THE MARBLE BUILDINGS
ERECTED ON THE EMBANKMENT OF
THE EMPEROR SHAH JAHAN
IN THE YEAR 1047 HIJRI CORRESPONDING
WITH THE YEAR 1637 OF THE CHRISTIAN ERA
WERE RESTORED BY THE ORDER OF
THE GOVERNMENT OF INDIA
IN THE YEAR 1902

জ্যোৎস্না রাতে এই আনাসাগরের সৌন্দর্য খুব মোহময়ী হয়ে ওঠে। যারা সে সময় এখানে উপস্থিত থাকেন তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। আর এই যে শহরের স্থানীয় মানুষ সকাল বিকাল এখানে এসে বিশ্রাম নেন, পায়চারী করেন কিংবা স্বাস্থ্য লাভের জন্য ব্যায়াম করেন তারাও ভাগ্যবান। আরাবল্লীর পাহাড় শ্রেণীর গা ছুঁয়ে আসা মলয়বাতাসে এঁদের শরীর জুড়ায়, প্রাকৃতিক শোভার গুণে মন হয় প্রফুল্ল।

আমারও খুব ভাল লাগছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ থাকার উপায় নেই। আমি যে পর্যটক। ঘুরে ঘুরে আনন্দ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই আমার কাজ। সুতরাং এগিয়ে চলি। ভ্রাম্যমান মানুষদের কাছেই জানতে পারি দৌলত বাগের উত্তর দিক দিয়েই শহরের দিকে একটি পথ চলে গেছে। শহরের পথ ধরে মিনিট দশেক হাঁটলেই পাওয়া যাবে দরগা। হ্যাঁ পবিত্র দরগা। আজমীর শরীফ।

এখানেই রয়েছে খাজা মুইন - উদ - দিন চিস্তির সমাধি। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়ার লক্ষ লক্ষ ধার্মিক মুসলমান প্রতিবছর এই দরগায় তীর্থযাত্রায় আসেন।

এই তীর্থ যাত্রার প্রচলন করেন মহামতি আকবর। তিনি বহুবার এই তীর্থযাত্রায় অংশ

গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে কয়েক বার এসেছেন পায়ে হেঁটে। আর এই তীর্থ ক্ষেত্রেই বিহার মল্ল মহামতি আকবরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে সখ্যতার বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল।

দরগা :

হজরত মুইন - উদ -দিন চিস্তির প্রচলিত নাম খাজাসাহেব। খাজাসাহেব ইরানের লোক। তিনি আজমীরে প্রথম আসেন ১১৮৯ সালে। প্রায় তিরিশ বছর পর তখনকার দিল্লীর সুলতান শামস - উদ - দিন ইলতুৎমিস তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর তখন থেকে খাজাসাহেব আজমীরে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

হজরত মুইন - উদ - দিন চিস্তি সুফি ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। এই ধর্মের মূল বক্তব্য ছিল ধনী - দরিদ্র, পণ্ডিত - মূর্খ, মুসলমান - অমুসলমান সবই সমান। মোটের উপর মানবতাবাদই ছিল এই সুফি ধর্মের মূল কথা।

১২৩৫ খৃষ্টাব্দে এই দরগাতেই তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ইলতুৎমিস দরগা নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু শেষ করা সম্ভব হয়নি কেননা ইলতুৎমিসও ঐ বছর দেহ-ত্যাগ করেন।

এর পর তিনশ বছর দরগা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। যদিও সম্রাট হুমায়ুন দরগার প্রাথমিক নির্মাণ কাজ শেষ করেন কিন্তু সম্রাট আকবরই দরগার বর্তমান অবস্থার রূপ দান করেন। পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান অবশ্য এর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটান।

সম্রাট আকবরের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। সে কারণে তিনি দরগায় পুত্রলাভের জন্য মানত করেন। অবশ্য তৎকালীন ইমামের পরামর্শে তিনি একাজ করেন। কিছুকাল পরে তিনি পুত্র সন্তানের জনক হন। পুত্রের নামকরণ করা হল সেলিম। সম্রাট আগ্রা থেকে পায়ে হেঁটে এসে মানত শোধ করলেন আর তখনই তিনি সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করেন।

১৫৭০ সালে সম্রাট আকবর দরগায় মানত রক্ষা করতে আসেন। তার পর থেকে ১২ বছর আসেন শুধু দরগা দর্শনের জন্য। হজরত মুইন উদ - দিন চিস্তির প্রতি তিনি কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এ ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খাজা সাহেবের জন্মদিন উপলক্ষে এখানে প্রতি বছর উৎসব পালিত হয়। প্রতি হিজরী সালের ১—৬ রজাব তারিখ পর্যন্ত উৎসব হয়। খুব আকর্ষণীয় উৎসব। একে বলে উর্স। সব ধর্মাবলম্বীর লোক এই উৎসবে যোগদান করতে পারেন। তীর্থযাত্রীরা ফেরার পথে দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা দর্শন করেন। আর তাহলেই তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হয়।

হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, দৌলতবাগ থেকে হেঁটেই এলাম শহরে। শহরে এসে চা খেয়ে নিলাম। ক্লান্তি দূর হলে আবার হাঁটতে শুরু করি। চলি সোজা উত্তর দিকে.

উত্তরেই যেতে হবে।

পথের দুদিকে দোকানপাট সবই আছে। তবে জায়গাটা ঘিঞ্জী। জনবসতিও খুব ঘন।

খুব একটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নয়। যত এগিয়ে চলেছি লোকসমাগম বাড়ছে দেখছি। মাঝে মাঝে উর্দু এবং হিন্দী গানের আওয়াজ ভেসে আসছে।

অতীত কালের কথা ভাবতে ভাবতে এসে পড়ি দরগার সামনে। এখানে ত্রিমুখী রাস্তা। রাস্তার সামনে দরগার প্রবেশ তোরণ-এজন্য জায়গাটা জমজমাট এবং লোকে গিজ গিজ করছে। তোরণের গঠন লক্ষ্য করছি এমন সময় মাথায় টুপি, গায়ে পাঞ্জাবী এবং পরণে লুঙ্গি পরা এক ব্যক্তি অভ্যর্থনা করে—চলুন স্যার, আমি খাজা সাহেবের দরগা দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি তো দেখতেই এসেছি। গাইড একজন সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। এগিয়ে চলি তার সঙ্গে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকি। তোরণ দিয়ে উঠতে উঠতেই জিজ্ঞেস করি।—

— তোরণটির কি নাম ?

— বুলন্দ দরওয়াজা। দেখছেন এর কারুকার্য কত সুন্দর! পাঁচটি দেখবার জিনিসের মধ্যে এটিই একটি।

— বাকি চারটি কি?

— দুটি মসজিদ, মহফিলখানা এবং খাজা সাহেবের সমাধি।

তোরণের উপর ঝুলানো বারান্দা। তাতে পাঁচটা চন্দ্রাকৃতি দরজা। উপরে নিচে দুটি করে জানলা। তোরণের দু'পাশে দুটি পাথরের মিনার।

তোরণ পেরিয়ে চলতে থাকি। গাইডের পাশাপাশি চলেছি। গাইড না বলে পাণ্ডা বলাই ভাল। কেননা হিন্দু ধর্মস্থানের পাণ্ডাদের মতই এদের এটাই ব্যবসা। দরগাকে ঘিরে পাণ্ডাদের রমরমা ব্যবসা চলছে তা পরে জানলাম।

যাই হোক পাণ্ডা বললেন—এই বেলেপাথরের মসজিদটি তৈরি করেছেন সম্রাট আকবর। এর নাম আকবরী মসজিদ। আর ঐ যে সমাধি মন্দির দেখছেন তাও সম্রাটের নিজের তৈরি। শুধু ঐ শ্বেত পাথরের গম্বুজটি তৈরি করেছেন তাঁরই পৌত্র শাহজাহান। ডান দিকে ঐ যে বড় বড় দেগ দেখছেন এতে সিন্নি রান্না হয়।

— বড় দেগে কত মণ চাল ধরে?

— সত্তর মণ।

— ছোটটিতে?

একটা বাচ্ছা আমাদের পাশে ছিল। সে শুনে বলে উঠে—

— আঠাশ মণ।

এখানকার আকাশে বাতাসে যেন এসব খবরগুলো চাউর হয়ে আছে। স্থানীয় বাচ্ছারাও জানে এসব খবর।

তাহলে! ছোট হাঁড়িতে আঠাশ মণ চাল ধরলে নিশ্চয় ঐ হাঁড়ি আজ ব্যবহার হয়নি।

আর ঐ যে দুজন লোক এঁটো সিন্নি পরিষ্কার করছে তা নিশ্চয় গত কালের এবং অপেক্ষাকৃত ছোট হাঁড়িতে রান্না।

—এত সিন্নি কখন কাজে লাগে ভাই?

—উরস উৎসবের সময়, মানে খাজা সাহেবের জন্মোৎসবের সময়। দু'লাখের মত ভক্তের সমাগম হয় তখন এ পবিত্র দরগায়।

কথা বলতে বলতে এসে পড়ি সমাধি মন্দিরের সামনে। পাণ্ডা বলে মাথায় রুমাল বেঁধে নিন। সমাধি মন্দিরের বারান্দায় কার্পেট পাতা। তাতে দুজন লোক বসে আছে। এক জন মিঞার সামনে কাঠের বাক্স—বোধ হয় ইনি সেরেস্তাদার। তার পরনে লুঙ্গি মাথায় সাদা টুপি এবং গায়ে ফুল হাতা জামা। মুখে এক গাল দাড়ি। আর এক জনের হাতে একটা বড় খাতা।

যার কাছে ক্যাশ বাক্স তিনি বললেন—বসুন।

বসলাম।

যার কাছে খাতা তিনি প্রশ্ন করলেন—

— কোনখান থেকে এলেন?

— কোলকাতা থেকে।

— দরগায় পূজা দেবেন?

— না, আমি দেখতে এসেছি, আমি ট্যুরিস্ট।

(কিন্তু কোথাও দেখলাম না পূজোর ব্যবস্থাদি)

— তাহলেও এগারটি টাকা দান করুন।

(মনে মনে ভাবি দান আবার বাঁধাধরা হয় নাকি !)

— আমার যা ভাল লাগে তাই দান করবো, এই নিন পাঁচ টাকা।

(এবার দুজনেই খাতা দেখাতে ব্যস্ত)

— এই দেখুন আপনাদের কোলকাতার লোকেরা কত দিয়েছে!

(আমি ও লেখার ভাষা বুঝি না আর দেখবই বা কেন?)

আমার গাইডও সমর্থন করে। বলে, দিয়ে দিন। এখানে এই নিয়ম।

ওরে ব্বাস!

নিয়ম দেখাচ্ছে! আর কথা বাড়ালাম না। এ অপরিচিত স্থানে পাণ্ডারা দুর্ব্যবহার করলেও আমার কিছু করার থাকবে না। সবাই দেখছি একসূত্রে গাঁথা। টাকা দিতেই আমার গাইড বলে—

"আপনি সমাধি মন্দির দর্শন করে আসুন। আমি এখানে আছি, ফিরে এলে বাকিটা দেখাব"

আমি কোন কথা না বলে ঢুকে পড়লাম মূল সমাধিস্থলে। ঘরখানি খুব বড় নয় কিন্তু

বেশ সুন্দর মসৃণ পাথরে তৈরি। মন্দিরের মাঝখানে সেই মহামানবের সমাধি: চারদিকে পাথরের রেলিং। প্রায় মাথা সমান উঁচু। আমার আগেও প্রচুর ভক্ত এসেছেন। কিন্তু সবাই সুশৃঙ্খল।

সেবাইতগণ দর্শন করাচ্ছেন এবং মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন। কিন্তু সে মন্ত্রের ভাষা আমি বুঝি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি ভাব গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে সুন্দরের আরাধনা হচ্ছে। আমি গৃহের চারদিকে লক্ষ্য করছি। এই মহামানবের সমাধিতে এ পর্যন্ত কত হাজার হাজার মানুষ এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন, এখনও জানাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও জানাবেন সে কথাই ভাবছি। এখানে এসেছিলেন সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের মত ক্ষমতাবান মানুষ, এসেছেন সাধারণ এবং অসাধারণ মানুষও। সবাই কিন্তু একই রীতিতে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মহত্ত্বের মৃত্যু নেই। হজরত সৈয়দ খাজা মুইন - উদ - দিন হাসান - সানহাজারী চিস্তি যে অমর!

আমি ভাবছি লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন হজরতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাহলে ওঁর মহামানবতা বোধ তাদের মধ্যে জাগরিত থাকার কথা। তারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছেন; তাহলে তো মানবতার দীক্ষায় মানুষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে দেশের শুভকাজে লাগতে পারে। তা না হয়ে সারা দেশে আজ এত গোঁড়ামী, এত হানাহানি, পরস্পরের প্রতি এত হিংসা বিদ্বেষ কেন?

তাহলে কি মানুষ ধর্মস্থানের মহান নীতিতে অনুপ্রাণিত হয় না! দ্বন্দ্ব জাগে মনে।

মন্ত্র পাঠ শেষ হলে মহামানবের সমাধি প্রদক্ষিণ করে এগিয়ে চলি। ফুল ধূপ আর আতরের সুগন্ধে পূণ্যক্ষেত্রটি একটি স্বর্গীয় পরিবেশে পরিণত হয়েছে।

মনে মনে প্রার্থনা জানাই—হে মহামানব, যারা তোমার আশীর্বাদ নিতে এসেছেন বা নিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে নেবেন অন্ততঃ তাদের মনে তোমার মহামানবতা বোধ জাগরুক থাকুক। তোমার মহামন্ত্রে ভারতবাসী যেন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। আজ চারদিকে যে বিচ্ছিন্নতার হুমকি ছড়াচ্ছে তার অবসান হোক। ভারত শান্তিভূমি হয়ে উঠুক।

সমাধি মন্দিরের বাইরে এসে দেখি আমার পথ প্রদর্শক নেই। থাকবেন কেন? তিনি যে খদ্দেরের খোঁজে গেছেন। সেরেস্তাদারকেই জিজ্ঞেস করি।

— উনি কোথায় ?

— তিনি চলে গেছেন।

— তিনি যে আমায় মহফিল খানা দেখালেন না!

— দেখুন না! ঐ যে ওখানে অনেকে বসে আছেন ওখানেই গানবাজনা হয়।

বুঝেছি! রোজগারের ধান্ধা!

রোজগারের সুবিধার জন্য এরা পুণ্যার্থী আর দর্শনার্থী এক করে ফেলেছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি বুলন্দ দরওয়াজার দিকে।

দরজার সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি। আরো উপরের দিকে তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে শহর। চড়াই পথ ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে চলেছি।

তারাগড় আরাবল্লী পাহাড় শ্রেণীর অন্তর্গত।

আমি চলেছি তারাগড় দুর্গের পথে। তারাগড় দুর্গটি সমুদ্র সমতল থেকে ২৮৫৫ ফুট. আর পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ৮০০ ফুট উঁচুতে অবস্থান করছে। সুতরাং সিঁড়ি পথ ধরে উপরে উঠতে হচ্ছে।

মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছি।

সিঁড়ি পথের জায়গায় জায়গায় বাঁধানো চড়াই পথ। আবার কোথাও খাড়াই।

অনেকটা উপরে উঠে এসেছি। সামনে দেখেছি একটা দরগা। এতক্ষণ পথের দুদিকে দেখেছি জনবসতি। পথে দু'চার জন ভিক্ষুকও মিলেছে। কিন্তু এখানে দেখছি প্রচুর ভিক্ষুক। পুণ্যার্থী এবং দর্শনার্থীদের কাছে করুণা ভিক্ষে করেই এদের সংসার গুজরান হয়।

একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার।

পথের পাশে সমতল ধাপে দাঁড়িয়ে দেখছি নিচের দিকে। দক্ষিণ দিকে দেখা যাচ্ছে আনাসাগর লেক। শহর ছাড়িয়ে অনতিদূরে লেক। আমি উত্তর দিকের তারাগড় পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। পাহাড়ের পাদদেশে সামনে - ডানে - বাঁয়ে বিস্তৃত শহর। ডানদিকে আজমীর রেল স্টেশন।

এই প্রাচীন জনপদের প্রায় চারদিকেই দেখছি পাহাড় শ্রেণী। এই যে বেষ্টনকরা গিরিশিরা এর নামে অজয়মেরু।

চৌহান বংশীয় অজয়রাজ এই প্রাচীন নগর সৃষ্টি করেন। তারই স্মৃতি বহন করছে অজয় মেরু। আর অজয়মেরুর অপভ্রংশই আজমীর।

ডানদিকে দেখছি দরগা শরীফ (DARGA SHARIF)--হজরত পীর সফি সাহ মহম্মদ ইব্রাহিম চিস্তি নিজামীর দরগা।

না, দরগার ভিতরে ঢুকিনি!

আবার যে এগার টাকা দিতে হবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে। আরো উপরে উঠতে থাকি।

দরগা শরিফের সরাইখানার উপর দিয়ে পথ পার হতে হয়। এখানেও দেখছি দুটো বড় হাঁড়ি। একটিতে জং ধরে আছে। মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত। লোহার পাত রিভেট করে হাঁড়ি তৈরি হয়েছে।

দরগা শরীফের বাঁক ছাড়তেই দেখছি মানুষের মিছিল। কেউ উপরের দিকে যাচ্ছে,

কেউ নিচের দিকে, এখান থেকে মেঠো পথ। ভিক্ষুকেরা পাহাড়ের দিকেই বসে আছে সারি দিয়ে। কেউ ভিক্ষা পাচ্ছে। কেউ বা ভিক্ষার জন্য করুণ আবেদন করে যাচ্ছে। দলে দলে লোক যাচ্ছে উপরের দিকে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পথ।

পথ মোটামুটি মসৃণ! বামদিকে খাড়াই পাহাড়। ডান দিকে বিরাট খাদ। চলতে চলতে কথা হচ্ছে। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারছি তাদেব মধ্যে বেশির ভাগ বাঙ্গালী মুসলমান। দুর্গাপূজার সুযোগ নিয়ে এরাও এসেছেন তীর্থ ক্ষেত্রে।

দুর্গাপুর, বর্ধমান, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গ সব জায়গা থেকেই লোক এসেছে।

হাওড়ার একটি দলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

— মিঞা, খাজা সাহেবের দরগায় কত দান করেছেন?

— এগার টাকা।

— দরগাশরীফে ঢোকেননি। কেন? আপনারাতো তীর্থ করতে এসেছেন।

— উপরে মিরণ সাহেবের দরগায় মুনাজাত করে ফেরার পথে ঢুকব।

দৃষ্টি যায় নিচের দিকে। পাহাড়ের পাদদেশে এবং শহরের পূর্ব দিকে দেখা যাচ্ছে এক ছোট্ট পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে তারাগড় পাহাড়ে উঠার আর একটি রাস্তা আছে। ঐ রাস্তা দুর্গের পিছনে এসে মিশেছে। ঐ পথ দিয়ে লোক যাতায়াত করছে। তবে সংখ্যায় কম। আমি ও পথ দিয়েই শহরে ফিরব। কেননা ঐ পথের পাশেই রয়েছে আড়াই - দিনকা -ঝোপড়া।

অনেকটা উঁচু - নিচু পথ পার হওয়ার পর আর একটু উঁচুতে উঠতে হয়। পাশেই একটি স্টল। পাকা কলা এবং কাঁকরুলের মত এক রকম কাঁচা ফল বিক্রি হচ্ছে। খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

তেষ্টাও পেয়েছে।

পাকাকলা খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেই শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠে।

ক্ষীণস্বরে কোথাও ক্যাসেট বাজছে। কিন্তু কোন্ দিক থেকে সুরটা আসছে বোঝা যাচ্ছে না। যত উপরের দিকে উঠছি সুরের তীক্ষ্নতা তত বাড়ছে। তাহলে পাহাড়ের উপর থেকেই এই সুর ভেসে আসছে। পাহাড়ের আড়ালের জন্য ভাল শোনা যায়নি। ঠাণ্ডাও লাগছে। আরো কিছুটা উপরে উঠার পর সামনে দেখছি বেশ কয়েকটি স্টল। তাহলে ওখানেই ক্যাসেট বাজছে।

উঠে আসি ঐ উঁচু জায়গাতে।

আ!

কী সুন্দর হাওয়া! শরীর মন জুড়ায়। সব জায়গা থেকেই ফটো তুলি। এখানে যেন

ফটো তোলার আনন্দ থেকেও আরো বেশি কিছু আছে। এ চোখে দেখা যায় না অনুভব করা যায়। দূরের শহরের ঘর বাড়ি আজমীর শহর সব ছায়াছবির মত দেখাচ্ছে।

এখানে খাবার এবং পানীয় পাওয়া যাচ্ছে। জলতেষ্টা মিটিয়ে আবার চলতে থাকি। যত এগোচ্ছি হাওয়ার বেগ তত বাড়ছে। বামদিকে সুউচ্চ পাহাড়। আস্তে আস্তে একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছাই।

হাওয়া যেন আরো উদ্দাম! উত্তাল! কেননা ঐ পাহাড়ী টিলাটি ক্রমেই নিচু হয়ে খোলা জায়গার সঙ্গে মিশে গেছে।

কী আনন্দ! কী আনন্দ!

বুঝতে পারছি বামদিকের পাহাড় চূড়ার জন্য দুরন্ত হাওয়া এতক্ষণ আটকে পড়েছিল। উপরে ওঠার পরে খোলা জায়গায় হ[illegible] বেগ টের পেলাম। এখন সে হাওয়া যেন আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়! আমরা যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়তে পারি। সামনে আর একটি পাহাড়। উৎরাই পথে চলেছি। দুটি পাহাড়ের মধ্যে যোগ রয়েছে। সামনের পাহাড়ের চারদিকে গভীর গিরিখাদ। অনেকটা খাড়াই এবং উঁচু পাহাড়। দুর্গের পক্ষে আদর্শস্থান। যে রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছি তারই পাশে বিরাট পরিখা। অজানা লোক ভুল করে ছুটে এলেই পড়বে পরিখায়। এইই ছিল তখনকার দিনে শত্রুকে ঠেকাবার কৌশল।

সরু সিঁড়ি পথ ধরে উপরে উঠছি।

সামনে তোরণ।

তারাগড় দুর্গের প্রবেশ পথ।

তোরণের ভগ্নদশা দেখে মনে আঘাত পেলাম। কি ছিল আর কি হয়ে গেছে। কাঠামো সবই ঠিক আছে। অন্য দুর্গের তোরণে যেমন পাহারার ব্যবস্থা থাকে এখানেও সে সবই আছে। শুধু পাহারাদার নেই। জীর্ণদশা। মূল দরবারটি এখন নেই।

তোরণ দিয়ে ভিতরে ঢুকি। এসে গেছি দুর্গে। হ্যাঁ এই সে ঐতিহাসিক তারাগড় দুর্গ। বহু ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সাক্ষী এই দুর্গ। আমি সে ঐতিহাসিক দুর্গে পা রেখেছি। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

তারাগড় দুর্গ ঃ

বহু পুরানো দুর্গ। Tourist Guide to Rajasthan বইতে তারাগড় দুর্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

This 'Star Fort' was built by Ajapal Chauhan in the 7th century A.D. It has witnessed many historic battles and providing a fine view of the city. A winding bride path takes you to the fort crowning a hill rock. It is 2855 ft high from the M.S level and 800 ft from the ground level. Inside the fortress are five water tanks and mosque of mir Saiyed Hussain Khangwan..

সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি দুর্গ।

১১৯৩ সাল পর্যন্ত চৌহান বংশের হিন্দু নরপতিদের আয়ত্বে ছিল এই দুর্গ। স্বাভাবিক কারণে হিন্দু মন্দিরে স্থাপত্য এবং সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করব এটাই ভেবেছিলাম।

কিন্তু প্রবেশ তোরণ দিয়ে ঢুকে খানিক এগোতেই লক্ষ্য করলাম পথের পাশে সৈয়দ জাফর হোসেনের সমাধি। বিশ্বাসে ফাটল ধরল। সাংস্কৃতিক পটভূমির আমূল পরিবর্তন। মুসলমান যুগে হিন্দু মন্দির এবং স্থাপত্যকলা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সমতল ভূমি। পাহাড় চূড়ায় মালভূমি। চারদিকে ধ্বংসাবশেষ। অযত্নে নষ্ট হয়েছে। নেই কোন প্রাসাদ বা বাগিচা। ডানদিকের ছাদহীন দেওয়ালগুলো যেন তারস্বরে বলতে চাইছে—তারাগড় দুর্গ এখনও মুছে যায়নি। আমার কাছে দুর্গের কোন গাইড ম্যাপ নেই। সুতরাং কোথায় কি ছিল বুঝতে পারছি না।

এগিয়ে চলি সামনের দিকে। কয়েকটি ক্যাসেটের স্টল। স্টলগুলো থেকে উর্দু গজল এর বিকট আওয়াজ ভেসে আসছে। বুঝতে পারছি ঐ দিকেই মিরণ সাহেবের দরগা। পথের ডানদিকে জরাজীর্ণ বাড়ি। এগিয়ে চলি। সামনে বেশ ককেটি দোকান। খাবার থেকে শুরু করে খেলনা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সবই পাওয়া যায়।

দোকানগুলোর পরেই প্রাচীর বেষ্টিত দরগার প্রবেশপথ। প্রবেশপথের মুখে তিনটি বড় বড় ডেগ। ছোট ডেগে ৪০ কেজি, মাঝারিতে ৬০ কেজি এবং বড়টিতে ৮০ কেজি চাল রান্না হয়। সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে ২টি পুষ্করিণী। তারাগড় দুর্গে মোট ৫টি পুষ্করিণী আছে।

প্রবেশ তোরণে খোদাই করা আছে—

ROZA – EA – PURNOOR
HAZRAT MIRANI SAYED HUSSAIN
KHING SAWAR. TARAGARH.

প্রবেশ তোরণ দিয়ে ঢুকতেই পড়ল একটি প্রাচীর। প্রাচীর বেষ্টিত চৌহদ্দি। তারপর আর একটি। তার পরেই মিরণ সাহেবের সমাধি মন্দির। সমাধির উপর গম্বুজ, পাশে মসজিদ।

সমাধি মন্দিরে ঢুকতেই একজন জিজ্ঞেস করে—

— পূজো দেবেন না?

— না। মিরণ সাহেবের সমাধি প্রদক্ষিণ করে আসতেই একজন জিজ্ঞেস করে—

— পূজো দিয়েছেন?

— না। (তার হাতে সূতোয় বাঁধা কিছু তাবিজ। সে ফের বলে)

— মিরণ সাহেবের আশীর্বাদ, তাবিজটা নিন।

— না, আমার দরকার নেই।

(জোর করে আমার গলায় পরিয়ে দেয়)

— এ জন্য এক পয়সাও দেব না।

— পাঁচটা টাকা অন্ততঃ দিন।

— না, এই নাও তাবিজ।

(খুলে দিই তাবিজ)

সব জায়গাতেই ধান্দা!

ফিরে আসি দুর্গের পিছনের তোরণে। নামতে থাকি নিচের দিকে। পাথরের পথ। কোথাও পাথর ধসে গেছে। কষ্ট করে নামতে হচ্ছে। যেখানে পথ ভাল সেখানে হন হন করে এগোচ্ছি। আমার যে অনেক কিছু দেখার বাকি !

কিছুটা পথ নামার পরেই দেখছি মানুষের জটলা। একটা বড় পাথর দেখিয়ে টুপিপরা এক জন বলছেন। "এই পথদিয়ে মীরণ সাহেব যাচ্ছিলেন। তখন এই পাথরটি উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে। তিনি পাথরটি রুখে দেন।"

যে দু জায়গায় তিনি হাত দিয়ে ধরেছেন তার নির্দিষ্ট জায়গা লোকটি দেখাচ্ছেন! দর্শকরা অভাবনীয় ঘটনা স্মরণ করে কিছু পয়সাও দিচ্ছে। সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে। লোকটি আরো কিছু বলবে ......। আমার সময় কম।

এগিয়ে চলি।

পাহাড়ি পথের প্রায় শেষ। তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে দেখছি আর একটি সমাধি। 'হজরত শেখ সুলতানের সমাধি'।

এখানে একটি নিমগাছ আছে। নিমগাছের পাতা নাকি মিষ্টি! এজন্য হজরত শেখ সুলতানের আর এক নাম 'মিষ্টি বাবা'।

নিমের পাতা চেয়ে নিয়ে মুখে দিই। তেতো কম। তবে মিষ্টি নয়। যে লোকটি মাজার দেখাশোনা করে এবং আমাকে নিমপাতাটি দিল সে আমার দিকে চেয়ে আছে। তাকে খুশি করার জন্য বলি—'হ্যাঁ একটু মিষ্টি লাগছে'।

আবার চলা শুরু করি।

পৌঁছে গেছি সমতলে।

পথের পাশে পড়ল আড়াই দিনকা - ঝোপড়া।

আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া :

এটি একটি মসজিদ। একটি সংস্কৃত কলেজের কাঠামোর উপর গড়ে উঠেছে উপাসনা গৃহটি। সংস্কৃত কলেজটি ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে বিশালদেব-এর রাজত্বকালে তৈরি হয়।

১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর কাছে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন। কার্যত তখন থেকে আজমীর পরাধীন হয়ে পড়ে। তখন ঘুরীর নির্দেশে এই অনিন্দ্য সুন্দর কলেজটি ভেঙ্গে তারই কাঠামোর উপর মসজিদটি তৈরি হয়।

ফার্গুসনের মতে ১১৫৩ সালে নির্মিত সংস্কৃত পীঠস্থান ও সরস্বতীর মন্দিরকে ভাঙ্গতে আড়াই দিন সময় লেগেছিল। এইজন্য মসজিদের নাম আড়াই - দিনকা - ঝোপড়া।

কেউ কেউ আরও এক কদম এগিয়ে বলেন আড়াই দিনে মসজিদটি তৈরি হয়েছে। তা কি বিশ্বাসযোগ্য!

কেননা মসজিদের গায়ে হিন্দু স্থাপত্যকলার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। ২০০ x ১৭৫ ফুট আয়তাকার অঙ্গণটিতে যে পাঁচ সারি স্তম্ভ গড়ে উঠেছে তাতে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না হিন্দু মন্দির-এর পরিকাঠামোর উপর মসজিদ তৈরি হয়েছে?

আবার কেউ কেউ বলেন উরস উৎসবের সময় ফকির এবং দরবেশগণ এই প্রার্থনা গৃহে আড়াই দিন অবস্থান করতেন বলে মসজিদটির এমন নাম হয়েছে।

যাইহোক সিঁড়ি বেয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে উঠে লক্ষ্য করি পুরাকীর্তির কিয়দংশ নষ্ট করার চিহ্ন এখনও বর্তমান।

খোলা প্রাঙ্গণের পর দশটি গোলাকার গম্বুজযুক্ত ঝোপড়া। সামনে কপাটহীন দরজা। মাঝখানের গোল গম্বুজ উঁচু এবং বড়। ভিতরে সুষমামণ্ডিত অপরূপ কারুকার্য। ১২৪টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে ছাদ। সিলিং-এর কারুকার্যও অপরূপ।

বহু জ্ঞানি গুণীব্যক্তি ঝোপড়ার শিল্প কর্মের উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। তার মধ্যে ফার্গুসন, ডঃ ফুরাব, জেনারেল এ কানিংহাম অন্যতম। ঝোপড়া দেখে আসি আজমীর দুর্গে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই দুর্গ।

আজমীর দুর্গ :

আকবরের প্রাসাদও এই দুর্গে অবস্থিত। ১৫৭১- ৭২ সালে আকবর এই দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেন। দুর্গের তোরণটি বেশ সুন্দর।

এই ঐতিহাসিক দুর্গে বসেই সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজদের ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ প্রদান করেন। আর সে সূত্র ধরে দেড়শ বছরের মধ্যে ইংরেজগণ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য কায়েম করেন। দুর্গের তোরণটির উপরে দাঁড়িয়ে সম্রাট সেদিন অর্থাৎ ১৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী স্যার টমাস রোকে অভ্যর্থনা জানান। পরবর্তী কালে এই দুর্গের মধ্যে গড়ে ওঠে গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম।

গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম (ম্যাগাজিন) :

আকবরের দুর্গে গড়ে ওঠে মিউজিয়াম। গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামের আর এক নাম ম্যাগাজিন। ১৯০৬ সালে লর্ড কার্জন এবং তখনকার আর্কিওলজি বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল জন মার্শাল-এর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। তারপর প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট গৌরিশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝাও এর যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু হয়। খোদাই (ভাস্কর্য), উৎকীর্ণ লিপি, মুদ্রা, প্রাক্-ঐতিহাসিক নিদর্শন, ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কণ, অস্ত্র-শস্ত্র, শিল্প বিদ্যা এবং কারুশিল্পের বহু প্রদর্শনী হচ্ছে।

ম্যাগাজিন শুক্রবার বন্ধ থাকে। প্রবেশ মুল্য দুটাকা। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

আমার সময় কম। ভেবেছিলাম এগারটার মধ্যে পুষ্কর চলে যাব। কিন্তু এখানেই এগারটা বেজে গেছে। এগিয়ে চলি বাস স্ট্যান্ডের দিকে।

আজমীরে অনেক কিছুই অদেখা রয়ে গেল যেমন—

অজয়পালের মন্দির ঃ

প্রতি বছর ৬ই ভাদ্র এখানে বিরাট মেলা বসে। আজমীরের অধিবাসীগণ আজমীরের প্রতিষ্ঠা দিবসকে মেলার মধ্যে দিয়ে স্মরণ করেন। সপ্তম শতাব্দীর কোন এক বছর ঐ দিনে অজয়পাল আজমীরের গোড়াপত্তন করেন।

জৈন মন্দির (সোনিজী- কি - নাশিয়ানা) ঃ

শেঠ মূলচাঁদ নামে এক ধনী ব্যক্তি ১৮৬৫ সালে এই মন্দিরটি তৈরি করেন। তিনি মন্দিরটি প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

মন্দিরটির কারুকার্য খুবই সুন্দর।

মূল দর্শনীয় ঘরের সোনালী রংয়ের সিলিং এবং কাচের খোদাই যে কোন মানুষকে আকর্ষণ করে। আর মোজাইকের কাজে সৌন্দর্য আরো বেশি করে ফুটে উঠেছে।

দেওয়ালে মোজাইক টালির মধ্যে ফুটে উঠেছে জৈনধর্মের জীবনযাত্রার কথা। আর অযোধ্যা ও প্রয়াগের মনোরম দৃশ্য।

ঋষভদেবের মর্মর মূর্তিও রয়েছে মন্দিরে। নাসিয়ানা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশ মূল্য দুটাকা।

মেয়ো কলেজ ঃ

কলেজটি শহর থেকে ৪ কিমি দূরে অবস্থিত। ১৮৭০ সালে শ্বেত মার্বেল পাথরে তৈরি বিল্ডিংটি তৎকালীন ভারত সরকারের গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োর নামে উৎসর্গীকৃত। এই ভারত বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে।

মেয়ো কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় রাজপুতানার রাজপুতদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে। কলেজটির কারুকার্যও দেখার বিষয়। কলেজ কম্পাউন্ডে একটি মিউজিয়াম আছে। কলেজে পড়ুয়াদের পিতামাতারাই মিউজিয়াম দেখার সুযোগ পান।

কিষাণগড় ঃ

আজমীর থেকে ২৭ কিমি দূরে অবস্থিত। এক সময় কিষাণগড় ছিল রাজপুতানার রাজ্য। বর্তমানে আজমীর জেলার একটি শহর। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজ কিষাণ সিং রাজ্যটি গড়েছিলেন। রাজপ্রাসাদ, বাগিচা, দুর্গ সবই আছে।

জাঁকজমকপূর্ণ শহর। মধ্যযুগীয় শহরটিতে গুন্ডেলা লেক, ফুলমহল প্রাসাদ, দুর্গ খুব আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। মহারাজা প্রাসাদ এবং মোকরাম ভিলাও কম আকর্ষণীয় নয়। কল্যাণ

রাই-জী মন্দিরে শান্তির পরশ খুঁজে পাবেন। আর মহারাজা সায়ন্ত-সিং এর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা কিষাণগড় স্কুল রংচিত্রের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। মহারাজার গুরু নিহাল চাঁদ এবং সীতারাম চিত্রকলা জগতে এক উজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন।

যে কথা বলছিলাম। আমি যাব পুষ্কর।

পুষ্করের বাস পেয়ে গেলাম পথে। বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে হল না। লোকাল বাস। ভিড় আছে। তবু উঠে পড়লাম। দেরী করা যাবে না।

পুষ্কর ঃ

পুষ্কর তীর্থস্থান আজমীর শহর থেকে ১১ কিমি। কেননা জয়পুর থেকে আজমীর ১৩২ কিমি (ভায়া কিষাণগড়, ডুডু) সড়ক পথে।

আজমীর রেলস্টেশনের উল্টো দিকে বাস স্ট্যান্ড। বাস, অটোরিকশা, শেয়ার ট্যাক্সি, টাঙ্গাও যাতায়াত করে। আর রেল পথে অবশ্যই আজমীর আসতে হবে। তারপর স্থানীয় যানবাহনে পুষ্কর।

পুষ্করে থাকার জায়গার অভাব নেই। হোটেল, ধর্মশালা এবং সরাইখানা সবই আছে। এছাড়া সরোবর ট্যুরিস্ট বাংলো-পুষ্কর, RTDC- র ট্যুরিস্ট ভিলেজ উল্লেখযোগ্য।

নভেম্বরে পুষ্কর মেলা হয়।

চারদিন চলে এ মেলা। আজ অক্টোবরের চার তারিখ ঠিক এক মাস পরে অর্থাৎ নভেম্বরের চার তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে মেলা। পুষ্কর আজমীর জেলার একটি ছোট শহর। আজমীর শহরের উত্তর পশ্চিমে এবং সমুদ্র থেকে ২৩৮৯ ফুট উঁচুতে এই পবিত্র হিন্দু তীর্থস্থান অবস্থিত। এর ভৌগোলিক অবস্থান ২৬^{o} ৩৫ উঃ অক্ষ রেখা এবং ৭৪^{o} ৩৬ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে।

নাগপাহাড় পার হলে পড়ে পুষ্কর উপত্যকা। ঘন জঙ্গল দূর পাহাড়ের কোলে। তারই মধ্যবর্তী ঘন জনবসতির মধ্যমণি একটি সরোবর। এ সরোবরই হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান। সরোবরে স্নান করলে পূণ্য হয়। এই হল শাস্ত্রের বিধান।

সুতরাং লক্ষলক্ষ পূণ্যার্থী ছুটে আসছেন সারা ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল এবং পাকিস্তান থেকে। বস্তুতঃ সরোবরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে শহর। সরোবরের চারদিকে ধনী লোকদের বাস। বিরাট অট্টালিকা। সরোবরটি একে তো পূণ্যভূমি তার উপর স্বাস্থ্যকর। পূণ্যতোয়া জলে স্নান করলে রোগমুক্ত হওয়া যায় কেননা এই সরোবর স্বয়ং ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল। এই পূণ্যতীর্থে পিতৃ শ্রাদ্ধাদি, দানকর্ম অবশ্য করণীয়। আর তা হলেই সকল তীর্থের পূণ্য লাভ হয়। হিন্দুদের কাছে এটাই সরল সত্যি। এই পূণ্যভূমির পূণ্য কাহিনীটি এরকম —

লোক পিতামহ ব্রহ্মার মনে বাসনা জাগল তিনি যজ্ঞ করবেন। এই হেতু পূণ্যভূমির সন্ধানে বের হলেন। হাতে তাঁর পদ্মফুল। পদচারণা করতে করতে উপস্থিত হলেন অতি

সুন্দর এক বনময় পার্বত্য প্রদেশে। এই মনোরম ভূমিতে একটি পদ্ম ফেলে দিলেন। মহা শব্দে চতুর্দিক কেঁপে উঠল। সৃষ্টি হল এক রমণীয় হ্রদ।

এই সে কাঙ্খিত হ্রদ। ব্রহ্মা এখানে বেদী নির্মাণ করেন এবং ইপ্সিত যজ্ঞ সমাধান করেন।

পদ্ম পতনের মহাশব্দে দেবলোকে সাড়া পড়ে গেল। দেবগণ এসে এখানে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা তাঁদের বললেন—

"এখানে বজ্রনাভ নামে এক বালক হন্তা অসুর বাস করছিল। জগতের মঙ্গলের জন্য আমি তাকে কমল পাতে বিনাশ করেছি। আবার কমল দর্শন করে সেই অসুরও পূণ্যলোকে গমন করেছে। আমার এই নিক্ষিপ্ত পদ্মে সৃষ্ট হয়েছে বলে এই হ্রদ পুষ্কর নামে খ্যাত হবে। আমার এই পূণ্য যজ্ঞভূমি জগতের সকল প্রাণীর কাছে চিরকাল পূণ্যপ্রদ - মহাতীর্থরূপে অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

পথের কথায় আসি।

দু-তিনটে স্টপেজ পার হতেই ভিড় কমে যায়। বসার জায়গা পাই। কিন্তু ভিড় খুব একটা কমেনি। কেননা পুরাতন লোক নামে নতুন লোক ওঠে। আমার পাশে বসেছে একটি যুবক। কুড়ি কি বাইশ বছর বয়স হবে। ওর সঙ্গে আলাপ শুরু হয়েছে নস্যি নিয়ে। বসার পরে নস্যি নিই। তখন ছেলেটি জিজ্ঞেস করে।

— নস্যি ছাড়া আপনার আর কোন নেশা আছে?

— না ভাই, সাইনাস আছে বলেই নিই।

— কোনখান থেকে আসছেন?

— কোলকাতা।

(কোলকাতা বললে সবাইচেনে সুতরাং কোলকাতা শহরতলি বলি কেন !)

— আপনাদের ওখানকার লোকে আর কি কি নেশা করে?

— পান, সিগারেট, বিড়ি ওসব সাধারণ নেশা। এছাড়াও অনেকের অনেক নেশা থাকে।

এবার আমার প্রশ্নের পালা। ওর কোথায় বাড়ি, পরিবারে কে কে আছে?

তাতে জানতে পারি ছেলেটির বাড়ি পুষ্করে। তিন ভাই দু-বোন। সে নিজে পড়াশুনা করে। উচ্চমাধ্যমিক দেবে। দু দাদা পুষ্করে কাপড়ের ব্যবসা করে। আর বাবা পানের দোকান দেয়। পান আসে বর্ধমান, হুগলি থেকে।

এতক্ষণে বুঝলাম ছেলেটি প্রথম থেকে নেশার পিছনে লেগেছে কেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় এখানকার লোকেদের নেশা পান, সিগারেট, বিড়ি এবং খইনি। তারা ব্যবসা করলেও জাতিতে হিন্দু — ব্রাহ্মণ। কথাটা সে আমায় বার বার শোনায়। এসব মামুলি কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করি—

— পুষ্করে কতগুলো মন্দির আছে?

— চারশ'র বেশি।

— তার মধ্যে বিখ্যাত মন্দির কি কি?

— ব্রহ্মা, বদ্রীনারায়ণ, সাবিত্রী, বরাহ্ এবং আপ্তেশ্বর শিব।

— এই মহাতীর্থে পূজা পদ্ধতির নিয়ম কি ?

— অনেকে সরোবরে পূজা দেন, দান করেন। তারপর ব্রহ্মা মন্দিরে পূজা দেন। বাবাকে তুষ্ট করে মা সাবিত্রীর পূজা দেন। যারা বেশি দিন থেকে পুণ্য সঞ্চয় করতে চান তারা সরোবর পরিক্রমা করেন।

— পুষ্করে কোন্ উৎসব খুব জাঁকজমক পূর্ণ হয়?

— এখানে সবচেয়ে বড় উৎসব 'কার্ত্তিক স্নান'। ঐসময় মেলা হয় পুষ্করে।

— আজমীর ট্যুরিজম থেকে একটি লিফলেট পেয়েছি, তাতে দেখছি নভেম্বরের চার থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত এ মেলা চলবে।

— না, পাঁচদিন ধরে হয় এ মেলা। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দশমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয় পুষ্করে। তখন পুস্করে তিল ধারনের জায়গা থাকে না। ঐ সময় পশুমেলাও হয়।

— মেলায় কোন্ ধরনের পশু আনা হয়?

— গরু, ঘোড়া, উট।

— আচ্ছা, আর কি কি মেলা হয় পুষ্করে?

— সুধা বাঈ, নাগ-পঞ্চমী, সাবিত্রী, অগস্ত্য পাপমোচনী এবং বৈশাখী মেলা।

কথা বলতে বলতে এসে পড়েছি প্রায় সমতল জায়গায়। দেখা যাচ্ছে ছবির মত সুন্দর একটা জনপদ। আমার পথের বন্ধু বলে আমরা এসে পড়েছি পুষ্করে। ডান-বাঁয়ে আরাবল্লীর ধূসর রেখা। আর কাছে পথের দুদিকে দোকানপাট বাড়ি ঘর অট্টালিকা।

বাস যত এগোচ্ছে দুদিকের পাহাড় শ্রেণী ক্রমে অদৃশ্য হচ্ছে। এখন বারটা বাজে। বাস স্ট্যান্ডে এসে পড়েছি। আমার সদ্য পরিচিত বন্ধু বলে 'আগে পূজা দেবেন। তারপর ব্রহ্মা মন্দির এবং সাবিত্রী পাহাড়ে যাবেন। ব্রহ্মা মন্দির দেড়টায় বন্ধ হয়।'

হাতে সময় কম। পুষ্কর রাজের পথ ঘাট চিনতে একটু সময় লাগবে। সুতরাং বন্ধুকে বলি—

— তুমি ভাই আমায় একটু সাহায্য কর, আমাকে সরোবরে নিয়ে চল।

— একটু দাঁড়ান, পান রেখে আসছি।

দেখছি পথের পাশেই দোকান, পান রেখে ও কিছু প্রয়োজনীয় কথা সেরে এগিয়ে আসে আমার পথের বন্ধু শ্রী দীপক যোশী।

— চলুন।

— চল।

চলতে থাকি দুজনে। দুদিকে দেখতে দেখতে চলেছি। পথের ডানদিকে দেখছি একটি বড় মন্দির।

মন্দিরের বিমান এবং গোপুরম দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে গড়া। আমি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার পথপ্রদর্শক বলে, এই মন্দিরটি ১৯২৫ সালে মাগ্‌নীরাম বাঙ্গুর ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করেছেন।

'এখন থাক পরে দেখবেন।'

বিষ্ণু ঘাটে এসে আমরা থামি। পুরো সরোবর দেখা যাচ্ছে। পবিত্র সরোবরের চারদিক বাঁধানো। তার তীরে দোকানপাট, বাড়ি-ঘর অট্টালিকা। অনেকগুলো ঘাট। ঘাটে পূণ্যার্থীরা স্নান করছেন। তাদের দেখে লোভ হল—স্নান করি। কিন্তু আমি তোয়ালে কিংবা গামছা সঙ্গে আনিনি। আমার বন্ধু একজন পান্ডাকে ডেকে আনে। পরিচয় করে দেয়।

— ইনি কোলকাতা থেকে এসেছেন। পূজো দেবেন। এনাকে সাহায্য করুন।

আমার পথ প্রদর্শক দীপক যোশীকে বিদায় জানালাম।

তর তর করে নেমে আসি সরোবরে।

ঘাটের পাশে পূজার নৈবেদ্য নিয়ে বসে আছে তিন চার জন দোকানী। একটা শুকনো নারকেল, তিল-যব-নকুলদানা, ইত্যাদির দাম নিল এগারটাকা। এখানে পায়ের জুতো এবং ব্যাগ রেখে দিই। খালি পা। শানে পা রাখতেই ছ্যাঁত করে উঠে। শান গরম হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই সরোবরের জলের দিকে। সরোবরের মধ্যে আবার প্রাচীর ঘেরা পুষ্করিণী। স্নানের জন্য ঘেরাও করা হয়েছে। ডান দিকের মূল হ্রদে প্রচুর মাছ। পূণ্যার্থীরা মুড়ি খৈ ইত্যাদি মাছেদের খাওয়ায়।

হ্রদের মাঝখানে একটি ছোট দ্বীপ। দ্বীপে শ্বেত পাথরের একটি মন্দির। চারদিক খোলা। পাণ্ডাজী বলেন 'ঐ দ্বীপটি পিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল।'

— মন্দিরটি শিব মন্দির, আর পুষ্কররাজের চারদিকে দেখবেন ঘাট। এখানে ছেচল্লিশটি ঘাট আছে। আমাদের এই ঘাটের নাম বিষ্ণুঘাট। দক্ষিণ পাড়ে বিষ্ণু মন্দির।

তিনি বললেন—

'সকল তীর্থের জননী—গঙ্গা, জনক—প্রয়াগ, আর গুরু এই পুষ্কর। এখানে শ্রাদ্ধাদি এবং দান কর্ম করলে বৈকুণ্ঠে গমন।'

শিব এবং বিষ্ণু মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। ব্রাহ্মণ বললেন, —এবার হাত মুখ ধুয়ে নিন। ব্রাহ্মণের হাতে সব উপাচার তুলে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিই। তিনি নিজে আচমন করলেন এবং আমাকেও আচমন করালেন। তিন বছর হল আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেছেন। তাঁকে স্মরণ করি এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এর পর ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন। আমিও তার সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করতে থাকি। পূজা কর্মাদি শেষ হলে তিনি সংকল্প পাঠ করাতে থাকেন। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দানের অর্থ মনে মনে সংকল্প করতে বললেন।

— এগার, একুশ, একত্রিশ যা দান স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দেওয়া হবে তাহিতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—

— কত অর্থ দান করার সংকল্প করলেন?

— এগার।

— আরো বেশি হলে তাঁরা বেশি খুশি হতেন।

— তাঁরা এগারতেই খুশি থাকবেন।

— বেশ, ভাল।

এভাবে পূজা এবং দানক্রিয়া সম্পন্ন হল।

উঠে আসি রাজপথে।

এগিয়ে চলি।

কিছুটা পথ চলার পর পথের দুদিকে দেখছি প্রচুর মিষ্টির দোকান। মিষ্টি দেখে ক্ষুধার উদ্রেক হল। সকাল থেকে এক কাপ চা আর তারাগড় পাহাড়ে দুটো কলা খেয়েছি। এখন মিষ্টির দোকান দেখে ক্ষিদে এবং তেষ্টা দুই-ই পেয়েছে। মিষ্টি খেয়ে এবং জলপান করে শান্তি পেলাম।

আবার চলতে থাকি। এসে পড়েছি ব্রহ্মা মন্দিরের সামনে। জগৎপিতা ব্রহ্মার মন্দির। রাস্তার পর থেকে চড়াই পথ।

ব্রহ্মা মন্দির

পথের দুপাশে পূজার উপকরণ নিয়ে বসে আছে সারি সারি দোকান। কেউবা শুধু ফুল। পূজার উপকরণ নিয়ে এগিয়ে চলি। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের ডান দিকে দেব কুবের এবং বামদিকে দেব ইন্দ্রের মন্দির। উভয়ে শ্বেতহস্তির উপর উপবিষ্ট।

আরো কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি নাট মন্দিরে। দশটি কারুকার্যখচিত স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত নাট মন্দির। তারপর গর্ভ মন্দির।

গর্ভমন্দিরের দরজা রুপোর পাতে মোড়া। ছাদ ফুল সজ্জিত। ভিতরে রূপোর সিংহাসনে অবস্থান করছেন জগৎপিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পাশে গায়ত্রী। সিংহাসনের নিচের দিকে পদ্ম। জগৎপিতা ও মা গায়ত্রীকে প্রণাম করি। ব্রাহ্মণ আমার হাতে প্রসাদ তুলে দিলেন। তারপরই পর্দা পড়ে গেল।

এখন বিশ্রাম।

ভগবানের বিশ্রামের সময় থাকলেও আমার বিশ্রামের সময় নেই। আমি নেমে আসি রাজপথে। ব্রহ্মা মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে সাবিত্রী পাহাড় পর্যন্ত।

আমি সে পথ ধরে এগোতে থাকি।

দেখছি রাস্তার উপর দড়িতে ঝুলছে ত্রিকোণাকার রঙ্গিন কাগজের সারি। আর দেখছি ধর্মীয় পতাকা পৎ পৎ করে উড়ছে। দেখে শুনে মনে হয় কোথাও উৎসব হচ্ছে। দূরে মাইকে বক্তৃতা শুনছি। পথে মাঝে মাঝে দেখছি পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। এ কেমন ধরণের উৎসব? জানতে ইচ্ছা করে।

স্থানীয় লোকের কাছে জানতে পারি আজই একটি নতুন ধর্মশালার উদ্বোধন হয়েছে। বি-জে-পির বড় মাপের একজন নেতা এসেছেন ধর্মশালার উদ্বোধন করতে। এত সাজ সাজ রব তারই কারণ।

এগিয়ে চলি। সোজা রাস্তা চলে গেছে সাবিত্রী পাহাড় পর্যন্ত। রাস্তার ডান দিকে বালি আর বালি। রাস্তাও বালিময় হয়ে আছে।

পাকা রাস্তা।

চলতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। হচ্ছে শুধু দাবদাহ রোদের কারণে, দুপুরে আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে চরম ভাবে। খাঁ খাঁ রোদ।

পথের দুদিকে বাবলা কাঁটার ঝোপ ঝাড়। বাবলা কাঁটার ছায়ায় একটি মেয়ে বসে আছে ফুল নিয়ে। মা সাবিত্রীর মন্দিরে যারা পূজা দেবেন তাদের কাছে বিক্রি করবে বলে। দূরে আর এক জন ক্লান্ত মানুষ শুয়ে আছে। আমরা তিনজন ছাড়া আর কোন মানুষ জন নেই।

যিনি ব্রাহ্মণী তিনিই সাবিত্রী।

আমি চলেছি সে ব্রাহ্মণী মন্দিরে। সুতরাং ব্রাহ্মণী মন্দিরে পূজো দেবার বা শ্রদ্ধা জানাবার ভক্তের তো অভাব হবার কথা নয়! তবে এসময় পথ এত সুনশান কেন?

হয়তো ভক্তেরা দুপুর বেলা সাবিত্রী পাহাড়ে কম আসেন। বেলা বাড়ার আগেই পুষ্কর ঘাতে স্নান ও পূজা কর্মাদি সেরে ব্রহ্মার পূজো সেরে নেন।

তারপর ব্রাহ্মণীর পূজো দিতে আসেন। কিন্তু আমি এ ভর দুপুরে চলেছি সূর্যতনয়া সাবিত্রী মন্দিরে।

শুরু হয়েছে সিঁড়ি পথ। চারশ সাতটি সিঁড়ি। সিঁড়ির পর সিঁড়ি। পাথরের সিঁড়ি। মাঝে মাঝে পথের পাশে বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ঢালু সিঁড়ি পথ দিয়ে যতক্ষণ উঠেছি অসুবিধা হয়নি। এবার শুরু হল খাড়াই পথ। ক্ষণিকের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বিশ্রাম নিচ্ছি আবার ক্ষণিক উঠছি।

চরাচর নিস্তব্ধ। কোন সাড়া শব্দ নেই। নেই কোন হাওয়া। রাত নয়। ভর দুপুরেও যে ভয় পাওয়ার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা এই জনমানব শূন্য, এই খাঁ খাঁ করা রোদে করাল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ে এলেই বোঝা যায়। হঠাৎ নাগ পাহাড়ের দিক থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল। অনেকটা শেয়ালের ডাকের মত।

এ দুপুরে শেয়ালের ডাক !

কেমন যেন ভয় ভয় করছে। শেয়াল না হোক অন্য কোন জন্তু তো হতে পারে!

কয়েকটা বানরতো এর মধ্যেই দেখেছি। ওরা যদি খাবারের লোভে আমার ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করে তাহলেই হয়েছে।

গাছগাছালি দু একটা যা আছে তেমন বড় নয়। সুতরাং চরাচর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নিঝুম মধ্যাহ্ন কাল।

একা পেয়ে সুর্যদেব যেন রোষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন।

এত স্পর্ধা তোর! দেখাচ্ছি মজা।

মজা বটে!

দুঃসাহস বুকে নিয়ে চলেছি আমি। দুর্জয় সাহসে এগিয়ে যাওয়া আর ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার লড়াই! মা সাবিত্রীকে দর্শন করবোই। কোন ছলেই ফিরে যাব না। নিঝুম পাহাড়ের বুকে যতই ভয়ের উৎস থাকুক।

হ্যাঁ ভয় তো বটেই। 'যেখানে রাত সেখানে কাত' !

এক ফোঁটা জল নেই সঙ্গে। আমার চলার নীতি হল, যেখানে জলতেষ্টা সেখানকার জলেই স্থানীয় ভাবে তেষ্টা মেটানো। জলের ফ্লাস্ক সঙ্গে রাখা যেন বাহুল্য। কিন্তু এখানে যে সে সব জারিজুরি কিছুই খাটছে না। জলতেষ্টা ক্রমেই বাড়ছে তার উপর হার্ট বিট বাড়ছে।

একেতো খাড়াই পাহাড় চড়ার পরিশ্রম। তার উপর এই নিঝুম পাহাড়ের বুকে সূর্যদেবের দাঁত খিচুনি। যেন তপ্ত খোলায় রুটী সেঁকা !

আবার মাঝে মাঝে হাঁড় কাঁপানো শব্দ!

— টী- ই ...... টী ...... ই ......

এ কোন ধরণের পাখীর চিৎকার?

খোলা আকাশের বুকে কর্কশ শব্দ তরঙ্গ এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ কর্কশ ডাক যেন বলছে — খা ...... ই, খা ......ই, তোর মাথা খাই।

ভয় করবে না!

মনের জোরের সঙ্গে বিরুদ্ধ ভাবনার লড়াই। এ যে নিজের সঙ্গে নিজের বোঝা পড়া। নিঝুম দুপুরে সঙ্গহীনতার ভয়। জল তেষ্টার ভয়। আবার তাকে যুক্তি দিয়ে খান খান করে ভেঙ্গে দেওয়া, সব বিরুদ্ধ ভাবনা স্নায়ু দুর্বলতার কারণ বুঝতে পারা, তখন সব ভয় অমূলক মনে হওয়া। একি কম মজার বিষয়!

কিছুক্ষণ বিশ্রাম। অলস দৃষ্টি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আ!

কী- সুন্দর!

পুষ্কর হ্রদ এবং পুষ্কর শহর যেন স্বপ্নের দেশ। পুষ্কর উপত্যকার তিন দিকে পাহাড়। এক দিক খোলা। খোলা দিকেই সাবিত্রী পাহাড়।

বালি আর বালি!

বালির সমুদ্র যতদূর দৃষ্টি যায় মাড়োয়ারের সমতল পর্যন্ত বিস্তৃত। বালি শুরুর আগে এবং পুষ্কর জনবসতির পর পাহাড় চূড়ায় দেখা যাচ্ছে একটি শ্বেত পাথরের মন্দির। ঐ পাহাড় পিছনের দিকে প্রসারিত। আবার পুষ্কর উপত্যকায় ও পিছনের দিকে প্রসারিত হয়ে এক জায়গায় মিলেছে। খাঁ খাঁ রোদের মধ্যে ধূ - ধূ প্রান্তর দেখে পরীর রাজ্য বলে মনে হচ্ছে। ঐ মন্দিরওয়ালা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে দু - একটি জীপ গাড়ি বামদিকের ধূসর পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে—যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা।

ক্ষণিকের বিশ্রামের পর আবার চলা শুরু।

আরো কিছুটা ওঠার পর দেখেছি পাহাড়ের বুকে চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি ছাগল।

আরে!

পাহাড়ের বুকে ছাগল এল কিভাবে?

দাঁড়িয়ে পড়ি।

দেখি কালো একটি মানুষ লাঠি হাতে গাছের ছায়ায় বসে আছে। বুঝলাম ছাগলের দল নিয়ে এসেছে ঐ লোকটি।

অনেকটা ভরসা পেলাম। এতক্ষণে একজনের সাক্ষাৎ মিলল। দূরে একেবারে খাড়াই পাহাড়ে আর একটি লোক ছাগল চরাচ্ছে।

এত খাড়াই !

লোকটা নামবে কি করে?

নামবে ঠিকই। তবে একটু [illegible] লাগে মনে। কাছের লোকটিকে জিজ্ঞেস করি।

--আমার আগে কোন লোক ওপরে উঠেছে কি? হ্যাঁ, সামনে লোক আছে।

নিশ্চিন্ত হলাম। আরো লোক আছে। কিন্তু কাউকে দেখছি না কেন? দ্রুত গতিতে উঠতে থাকি। আরো কিছুটা ওঠার পর তাদের দেখতে পাই। ওরা এতক্ষণ একটা বাঁকের পিছনে ছিল বলে দেখতে পাইনি।

ওদের ধরে ফেলি। জানতে পারলাম ওরা দিল্লী থেকে এসেছেন। ওরাও আমার মত আজমীর দর্শন করে পুষ্করে এসেছেন। আবার পুষ্কর থেকে আজমীর হয়ে দিল্লী ফিরে যাবেন।

মন্দির আর দূরে নয়।

এক পঞ্চমাংসের মত বাকি । ওদের দলে পাঁচজন। বাকি পথ কথা বলতে বলতে উঠে আসি সাবিত্রী পাহাড়ের চূড়ায়।

সাবিত্রী মন্দির

পৌঁছে গেছি মহামতী সাবিত্রী মন্দির প্রাঙ্গণে। যিনি সরস্বতী গায়ত্রী ও ব্রাহ্মণী তিনিই সাবিত্রী। সেই সুর্যতনয়া সাবিত্রীর মন্দিরে পৌঁছাতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে দ্বিজগুণসম্পন্ন ব্যক্তি সাবিত্রীর উপাসনা করে দিনে সহস্রবার তাঁর নাম পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

বলা হয়েছে — দিনে একবার সাবিত্রী জপ করলে সেদিনের পাপক্ষয় হয়, দশবারে দিন এবং রাত্রির। শতবার জপে মাসের পাপক্ষয় আর সহস্রবার জপে সারা বছরের। এই ভাবে শত লক্ষ বারে মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তি।

কথিত আছে ভগবান কৃষ্ণ সাবিত্রীকে সৃষ্টি করে ব্রহ্মার হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু সাবিত্রী গোলক ছেড়ে ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে যেতে নারাজ। এ অবস্থায় কি করা যায়? ব্রহ্মা পড়লেন বিপাকে। শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ব্রহ্মা সাবিত্রীর স্তব করতে বসলেন। স্বামীর স্তবে এবার স্ত্রী সন্তুষ্ট হলেন।

তিনি ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

ব্রহ্মলোক কোথায় আছে জানি না কিন্তু ব্রাহ্মণীর মন্দির রয়েছে এ পুষ্করে। আমি সে মন্দিরে এসে পৌঁছেছি।

প্রাঙ্গণে উঠে কাউকে দেখতে পেলাম না। খোঁজ করতে করতে চলে আসি মন্দিরের সামনে। দেখি নাটমন্দিরে একজন মহিলা ফুল এবং ফল ডালিতে সাজাচ্ছেন। তিনি মন্দিরের সেবাইত। আমাদের জল তেষ্টার কথা শুনে বললেন মন্দিরের পিছনে কুয়ো আছে।

মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ কুয়ো আছে। জলও পরিষ্কার। তবে বালতি করে জল তোলার সময় শ্যাওলায় নাড়া পড়ে কিছুটা ময়লা হয়। আবার কিছুক্ষণের মধ্যে সে ময়লা থিতিয়ে বালতির তলায় জমা হয়।

সে জলই আমরা পান করলাম। কিন্তু অবাক হলাম মরুভূমির মাঝে পাহাড় চূড়ায় জল আসে কি করে? মন্দিরের সেবাইতের কাছে জানতে পারলাম এটি কুয়ো নয়— ট্যাঙ্ক। রাজস্থান সরকার লোহার ট্যাঙ্কটির ব্যবস্থা করেছেন। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে থাকে। সে জলই মহাসতীর স্মরণাগত ভক্তগণ পান করেন। পাহাড়ের উপর জল সরবরাহের আর কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রান্তি দূর হওয়ার পর মন্দিরের বাইরের দিকটা দেখছি। মন্দিরের তিন দিকে পাহাড় চূড়ার শেষ সীমানায় লোহার রেলিং। মাঝখানে পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গন। সিঁড়ি পথের দিকে থাকার ঘর। বেশ কিছু গাছগাছালী আছে। ছায়া শীতল জায়গা।

মন্দিরে ওঠার ধাপে বসে পড়লাম।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শরীর জুড়ানোর পক্ষে উত্তম জায়গা। পথে বানর দেখেছি কিন্তু এখানে দেখছি না। রেলিং ধরে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরি। পুবে নাগ পাহাড়। ওখানে অনেক গুহা আছে। এক সময় অগস্ত্য, কন্ব এবং ভর্তৃহরি প্রভৃতি মুনিগণ ওখানে বাস করতেন।

ঐ নাগ পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে রয়েছে পঞ্চ-কুণ্ড নামে একটি জলাশয়। জলাশয়ের

তীরে সমতল জায়গায় ছিল মহর্ষি কন্বের আশ্রম। সে আশ্রমেই শকুন্তলার শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে। ওখানেই দেখা হয়েছে দুষ্মন্তের সঙ্গে। রাজস্থানীরা এই দাবীতে অটল।

নাগপাহাড়ের পাদদেশে গায়ত্রী এবং ভৈরব সর্বানন্দের মন্দির রয়েছে। এই দেবস্থান নাকি একান্ন পীঠের অন্যতম। জনশ্রুতি এই যে বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব এই অঞ্চলে কয়েক বছর কাটিয়ে গেছেন।

পশ্চিমে একাদশী পাহাড়। পাহাড় চূড়ায় শ্বেতপাথরের মন্দির—একাদশী মাতার মন্দির। দক্ষিণে সাবিত্রী পাহাড়। মাঝখানে বিস্তৃত পুষ্কর উপত্যকা।

পুষ্করের পশ্চিমদিকে বালিয়াড়ি। আবার একাদশী পাহাড়ের পাদদেশ থেকে এই সাবিত্রী পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বালি। বালিয়াড়ি প্রসারিত হয়েছে! বালির সমুদ্র যেন রাজস্থানের অহংকার। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলাম। হৃষ্টচিত্তে ঢুকলাম মন্দিরে। চৌকোণা মন্দির। মন্দিরের দুটি অংশ। নাট মন্দির এবং গর্ভ মন্দির। আমরা দাঁড়িয়ে আছি নাট মন্দিরে। গর্ভ মন্দিরে সরস্বতী-সাবিত্রীর বিগ্রহ। বেশ বড় বিগ্রহ। ব্রাহ্মণীর পূজা একমাত্র মেয়েরাই করতে পারে। সুতরাং মাকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে আসি।

পাহাড় থেকে নেমে সোজা চলতে থাকি। পাকারাস্তা বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকে তারপর উত্তর দিকে ব্রহ্মা মন্দিরের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ঐ রাস্তা ধরেই এসেছিলাম সাবিত্রী পাহাড়ে। এর বাঁক থেকে একটি রাস্তা সোজা চলে গেছে গাঁয়ের দিকে। মনে হচ্ছে এই রাস্তা ধরে এগোলে পুষ্কর হ্রদের দক্ষিণ পাড়ে গিয়ে উঠব।

গাঁয়ের চাল-চিত্র দেখব বলে এপথ ধরে এগোতে থাকি। পথের ডান দিকে খেত খামার। শাকশব্জি ফলেছে প্রচুর। বামদিকে বসতি। প্রত্যেক বাড়িতে গাছগাছালি।

কিছুটা পথ এগোবার পর দেখি কয়েকটা বানর পথে ছোটাছুটি করছে। আরো পথ যাওয়ার পর দেখি প্রাচীরের উপর বেশ কিছু বানর বসে আছে। বানর প্রাচীর থেকে গাছের ডাল বেয়ে এবাড়ি ও বাড়ির ছাদে ছোটাছুটি করছে।

একটি ছেলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতে পাশের বাড়ির কদম গাছের ডাল ধরে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দেয়। বোধহয় বানরের রাগ হয়েছিল। একটি ডাল শুকনো ছিল। ঝাঁকুনিতে মড়াৎ করে ভেঙ্গে যায়। আর একটু হলে একটা বাচ্চা মেয়ের গায়ে পড়ে আর কি !

চেঁচামেচি সুরু হয়। বাড়ির বাইরের দরজা খোলা ছিল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ঘটনা দেখছি। বানরের বাঁদরামি সহ্য হবে কেন? এবার তাড়া খেয়ে বানরগুলো আরো উপরের ডালে উঠে গেল। প্রচীরের উপরে থাকা বানরগুলো ঝুপঝাপ মাটিতে পড়ে আমার আশ পাশ দিয়ে ছুটতে থাকে।

এই রাস্তা ঘুরে ব্রহ্মা মন্দিরের আগে রাজ পথের সঙ্গে মিশেছে। এখান থেকে সোজা চলে আসি বিষ্ণু মন্দিরে। গোপুরমের নিচে মজবুত দরজা। সামনের ফটকে দুজন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বলি—

— মন্দির দর্শন করব। সঙ্গে ক্যামেরা আছে নিয়ে যাব কি ?

— না, ক্যামেরা তো নয়ই আপনার ব্যাগও এখানে রেখে যান।

— আচ্ছা।

বিষ্ণু মন্দির

মজবুত কাঠ এবং লোহার গেট। দরজায় পিতলের কাজও আছে। গেট পেরিয়ে দেখি লন এর চারদিকে প্রায় দোতলা সমান উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের উপর দিকে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। বামদিকের মূর্তি গুলো দেখতে দেখতে আসি দ্বিতীয় গেটে।

আর একটা গোপুরম। দক্ষিণ ভারতীয় স্টাইলে তৈরি। দ্বিতীয় গেট পার হতেই নজরে পড়ল সোনার তালগাছ। তার পরেই মন্দির। খুব ঐশ্বর্যশালী মন্দির । বুক সমান উঁচুতে মন্দিরের মেঝে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। মন্দিরের সামনে সিঁড়ির দু'পাশে দুটি করে চারটি শ্বেত হস্তি যেন, বিষ্ণু মন্দির টেনে চলেছে—এমনি ভঙ্গি। বিষ্ণু মন্দির যেন রথ।

মন্দিরের দুটি অংশ ।

নাটমন্দির এবং গর্ভমন্দির।

নাটমন্দিরের মেঝে শ্বেত পাথরের। নাটমন্দিরটি অনেকগুলো স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভ, ছাদ এবং স্তম্ভের উপরদিক শোভাময়।

গর্ভ মন্দিরের সামনে রেলিং। ভগবান বিষ্ণু সিংহাসনে উপবিষ্ট। গর্ভমন্দিরের তিন দিকে অলিন্দ। মন্দির গাত্রে মহাভারতের কাহিনী উৎকীর্ণ। সবই খোদাই করা। আবার চৌহদ্দির দেওয়ালের সঙ্গে ছোট ছোট মন্দির। মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবী অবস্থান করছেন। একেবারে পিছনের বামদিকে লক্ষ্মী মন্দির এবং ডান দিকে শ্রী গীদন্তজী মন্দির। শ্রী বিষ্ণুকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলি প্রচীরের উপরি ভাগেও বিভিন্ন মূর্তি।

খুব আকর্ষণীয় মন্দির। ১৯২৫ সালে মাগনীরাম বাঙ্গুর আটলাখ টাকা খরচ করে মন্দিরটি তৈরি করেন।

মন্দির দেখা শেষ। নেমে আসি রাজপথে। মনে পড়ে পুষ্কর রাজের পূণ্য কাহিনী। 'খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মান্দোদরের একজন পরিহার রাজা এপথ দিয়ে শিকারে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে সরোবরের জলপান করে জলের রোগ নিরাময় শক্তি দেখে বিস্মিত হন। সেই থেকে পুষ্কর রাজ্য হিন্দু তীর্থে পরিণত হয়।' আমি ধন্য সে পূণ্য তীর্থে বিচরণ করতে পেরেছি; ফিরে আসি আজমীরে।

আজমীরে চেক আপ টাইম ২৪ ঘণ্টা। গত রাতে এসেছি আজমীরে। আজ রাতে চলে যাব চিতোর। জয়পুর দেখে সান্ধ্য বাসে আজমীর আসাই ভাল। এক্সপ্রেস বাসে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। তাহলে পরের দিন পুষ্কর এবং আজমীরে মোটামুটি সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখা সম্ভব।

ময়ূর হোটেলে স্নান করলাম। বিশ্রাম নিচ্ছি।

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত থাকায় নিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। হোটেলের রিসেপশান কাউন্টারে বলা আছে যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে এগারটার মধ্যে যেন তুলে দেয়।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত এগারটায় হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাত বারটায় বাস ছাড়ল। আজমীর থেকে চিতোরের দূরত্ব ১১৮ কিমি। ভেবেছিলাম শেষ রাতে চিতোর গিয়ে পৌঁছাব। আর তখন হোটেল ঠিক করে চিতোর দর্শনে বেরিয়ে পড়ব।

এক্সপ্রেস বাস। তিন ঘণ্টায় চলে এল চিতোরে। এখন বুঝতে পারছি ভোর রাতে বাসে চাপলে ভাল হত।

রাত তিনটা।

এখন কি করি! আমার এখনকার মত ভাবনা কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা যেখানে আছে তার আশপাশে কোথাও থাকি। স্থানীয় লোকের কাছে জানতে পারলাম R.T D C-র হোটেলে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। এই হোটেল স্টেশানের কাছে।

R T D C-র অফিস রাজপথের পাশেই। রিসেপশান কাউন্টারে আলো জ্বলছে। গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকি। রাতের প্রহরী জানায় ট্যুরের ব্যবস্থা এখানে নেই। শেয়ার অটো-রিকশা আগেই ছেড়ে দিয়েছি।

হোটেল ছেড়ে বাইরে আসি। কেননা এখানকার আবাসিক চার্জ আমার নাগালের বাইরে। রাস্তায় এসে দাঁড়াই। কোন যানবাহন এদিকে আসছে না। আগেই জেনেছি স্টেশন কাছে। স্টেশন মুখো হাঁটা দিই। এত রাতে পথে কোন লোকজন নেই।

হোটেল কমপ্লেক্স-এর পরে মোড়। তিনদিক থেকে রাস্তা এসে মিশেছে। কোন্ দিকে যাই ভাবছি। এমন সময় দেখি একজন লোক এদিকেই আসছে। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি।

— দয়া করে বলবেন স্টেশান কোন্ দিকে?

— এইতো কাছে। এ রাস্তা ধরে গেলেই পাবেন।

— আচ্ছা, এখানে কোন ধর্মশালা আছে কি ?

— হ্যাঁ, ঐ মোড়ের মাথা থেকে বামদিকে গেলে দু-তিনটে দোকানের পর ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান অফিস। তারপর জৈন ধর্মশালা।

— আচ্ছা; (মনে মনে এইতো চাই)।

রাজস্থান ট্যুরিজমের পর ফুটপাথে একটি পরিবার সংসার পেতেছে। গৃহকর্ত্রী জেগে আছেন। তাকে জিজ্ঞেস করি।

— ধর্মশালা কোন্‌টি?

— ঐ যে কাঠের গেটওয়ালা বাড়ি।

গেট বন্ধ।

মহিলাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, সকাল [illegible] খুলবে। [illegible] আছে [illegible]ক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এগিয়ে চলি। স্টেশনে বসেই বাকি রাতটা কাটানো যাক।

স্টেশন রোডে দেখি কয়েকটি হোটেল। হোটেলের রেটটা কেমন দেখা যাক। পঞ্চাশ টাকায় পেয়ে গেলাম ঘর। সিঙ্গল রুম। হোটেলের ঠিকানা—হোটেল সানভারিয়া টেলিফোন—৪০৫৯৫। চিতোর গড় (রেলস্টেশানের কাছে)।

হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় উঠি।

ঘুম আসে না। ভাবছি ……

প্রথিতযশা ভারত গৌরব চিতোরগড়ের কাহিনী আমার মানসপটে ভেসে উঠে। স্বাধীনতা সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে যে চিতোর গড় বার বার বীরত্ব, শৌর্য, বীর্যের পরিচয় দিয়েছে; ভারতবাসী তথা বিশ্বমানবের সমীহ আদায় করতে পেরেছে আমি সে চিতোরগড় শহরের দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত।

মেবারের রাজধানী চিতোর গড়।

চিতোরগড়ের কথাই আলোচনা করা যাক।

চিতোর গড় ঃ

ছোট শহর। দেশীয় রাজ্য সমুহের অন্তর্ভূক্তির পর থেকে জেলা সদর।

চিতোরগড় জেলার সীমানা।

পূর্বে—রাজস্থানের কোটা এবং মধ্যপ্রদেশের মান্দাউর জেলা।

পশ্চিমে—উদয়পুর।

দক্ষিণ—পশ্চিমে—বাঁশওয়ারা জেলা।

উত্তরে—ভিলওয়ারা এবং বুন্দি জেলা।

যান বাহন—রেলে, দিল্লী থেকে জয়পুর এবং আজমীর হয়ে দূরত্ব ৬৩১ কিমি।

সড়ক পথে, রাজস্থানের প্রত্যেক বড় বড় শহরের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে।

থাকার ব্যবস্থা—R.T.D.C- র হোটেল পান্না, প্রতাপ নগর

(টেলিফোন নং - ৩২৩৮)।

(হোটেল। স্টেশনের কাছে)— সানভারিয়া (৪০৫৯৭), শালিমার (৪০৯৪২),অলোক (৪০৬৫৩), কেশব (৩৮৯২), সতকর (৪০৫৭৫), চেতক (২৯৮০), মীরা (৪০২৬৬), গাম্ভেরী নদীর কাছে—ভগবতী (৩২২৬), বাস স্ট্যান্ড রোডে—নটরাজ (৪১০০৯)ফোর্ট রোডে—লক্ষ্মী লজ (২০৯৬), সদর বাজারে—মহেশ্বরী (২৩৪১), রাণা সঙ্গ বাজারে—সুখ সুবিধা গেস্ট হাউস (২৫৫৮), রাণা সূর্য বাজারে—রাজলক্ষ্মী (২৫৪৮) এবং পুরানো বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে—অরুণোদয় লজ, কেশরী লজ, ওমহনুমান, সৈনিক স্কুলের কাছে—পদ্মিনী।

ধর্মশালা।

স্টেশনের কাছে—জৈন ধর্মশালা, এছাড়া—ডাক বাংলো, গভর্নমেণ্ট সরাই, মিঠারামজী ধর্মশালা, রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম, আনন্দ লজিং এন্ড বোর্ডিং, সোনম ইত্যাদি।

২৩° ৩২´ ও ৭৫° ৪৯´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই জেলা প্রাক্তন মেবার, প্রতাপ গড়, টঙ্ক ও ঝালোরা দেশীয় রাজ্য সমূহের সঙ্গে এবং মধ্য ভারতের কিছু জায়গা সংযোজন করে গড়া হয়েছে।

বহু ঘটনার কেন্দ্রস্থল চিতোর যেমন আকর্ষণীয় তেমনি বহু স্মরণীয় এবং বরণীয় মানুষদের আত্মত্যাগের কাহিনী এর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে।

একদা চিতোরের সিংহাসনে বসেছিলেন বাপ্পা রাওয়াল, মহারাজা হামির, মহারাণা কুম্ভ, সংগ্রাম সিংহ এবং মহারাণা প্রতাপ সিংহ।

আজকের চিতোরের জেলা সদর চিতোরগড় সেকালে ছিল দুর্গনগরী. সে যুগের দুর্গনগরীর ইতিহাসই চিতোরের ইতিহাস।

চিতোরগড় (চিত্রকূট)।

চিত্রকূট > চিত্রকোট > চিতোর।

চিতোরগড় মধ্যযুগের বীরগণের বীরধর্ম,রাজানুগত্যতা এবং আত্মত্যাগের এক সুমহান আদর্শস্থান। চিতোর ভারতের গর্ব. স্বমহিমায় যশস্বী এবং স্বীকৃত।

এই পবিত্র ভূমি মহারাণা প্রতাপের মত বীর যোদ্ধা, ভীম সিং এর মত দেশপ্রেমিক, ধর্মনিষ্ঠ মীরাবাঈ, ধর্মভগ্নী কর্ণাবতী, রণচর্চার সঙ্গে সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও মিউজিয়াম দক্ষ মহারাণা কুম্ভ। সম্ভ্রম রক্ষায় জহরব্রত উদযাপিতা পদ্মিনী এবং দেশের স্বার্থে রাজপুত্রের পরিবর্তে নিজের পুত্রকে হত্যাকারীর হাতে তুলে দেন যে পান্নাবাঈ, এই সব মহান মহীষীদের জন্ম দিয়েছে।

সেই ভারত শ্রেষ্ঠ, পৃথিবী খ্যাত চিতোরগড় দুর্গের জন্ম কবে?

স্থানীয় মানুষদের ধারণা দ্বাপর যুগে মধ্যম পাণ্ডব ভীম এর হাতে গড়া। আর এর পিছনে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা এরকম—

একদিন ভীম ধনান্বেষণে বের হলেন।

চলার পথে পাহাড়ে দেখা হল দুজন সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে। একজন যোগী নির্বাণনাথ আর একজন জ্যোতি কুকারেশ্বর। ভীম তাদের কাছে পরশ পাথরের জন্য আবেদন করেন। যোগীগণ সম্মত হলেন। তাঁরা পরশ পাথর দেবেন— যদি ভীম রাতারাতি ঐ পাহাড়ের চূড়ায় একটি দুর্গ তৈরি করতে পারেন!

শুরু হল কর্মযজ্ঞ। প্রয়োজনীয় পাথর আনা হল। একদিন রাতে ভীম তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে ভাইদের সহায়তায় দুর্গের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করল। শুধু পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে খানিকটা কাজ বাকি।

যোগী তখন ছলনার আশ্রয় নিলেন। তিনি জ্যোতিকে ডেকে বললেন—তুমি মোরগের ডাকের মত ডাক। জ্যোতি তাই করলেন।

ভীম বুঝলেন রাত্রি শেষ। তখন তিনি কাজ বন্ধ করলেন। রাগে দুঃখে পায়ের গোড়ালী দিয়ে পাহাড়ের বুকে সজোরে ঠুকলেন। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। ফলে একটা গুহার সৃষ্টি হল। ঐ গুহার নাম ভীমলাট রিজারভার। আর হাঁটু যেখানে রাখা হল তার নাম ভীম গদি এবং জ্যোতি যেখান থেকে মোরগের মত ডাক দিলেন তার নাম কুকাদেশ্বর।

অবশ্য কালক্রমে সে দুর্গ ধ্বংস হয়ে যায়।

ঐতিহাসিকগণ এই মত মানেন না। কিন্তু তাঁরা মনে করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে মৌর্য রাজত্ব কালে চন্দ্রগুপ্ত দুর্গটি তৈরি করেন। যে পাহাড়ে এই দুর্গ তৈরি হয় তার নাম চিত্রকোট। কালক্রমে চিত্রকোটের অপভ্রংশ চিতোর গড় নামে পরিচিত হয়। মেবারের প্রাচীন মুদ্রায় চিত্রকোট নামটি পাওয়া যায়।

রাণা রাজবংশ।

রাণা রাজবংশের আদি পিতা বাপ্পা রাওয়ালের তৎকালীন মোরি রাজা মান সিংকে বিতাড়িত করে এই দুর্গ দখল করেন। তখন থেকে অর্থাৎ ৭৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চিতোর সিসোদিয়া রাজপুতদের রাজধানী ছিল। অবশ্য ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের আগে মহারাণা প্রতাপ সিং-এর পিতা উদয় সিং রাজধানী স্থানান্তরিত করেন উদয়পুরে।

কর্নেল জেমস টডের Annals and Antiquites of Rajasthan বই থেকে জানা যায় বাপ্পা ৭১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুহিল বা গিহ্লোট বংশীয় একজন ক্ষত্রিয় রাজা। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রী রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর। তিনি ছিলেন পাহাড়ী জনপদ ইদরের রাজা। তাকে ভীলগণ হত্যা করেন।

আত্মীয়স্বজন শিশু বাপ্পাকে নিয়ে ত্রিকুট পাহাড়ের কাছে নগেন্দ্রনগরে চলে আসেন। সেখানে এক ঝুলন পূর্ণিমায় বালক বাপ্পা খেলার ছলে সোলাঙ্কি রাজার মেয়েকে বিয়ে করেন।

একথা জানাজানি হতে বাপ্পা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসেন এই নির্জন গুহায়। সেখানে বলীয় এবং দেব নামে দুজন ভীলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। পরবর্তী কালে এই দুই ভীল বন্ধুদের সহায়তায় বাপ্পা মেবারের সিংহাসনে বসতে সক্ষম হন। এই কারণে উদয়পুরের মহারাজাগণ বংশ পরম্পরায় আজও অভিষেকের সময় ভীলদের রক্ততিলক ললাটে ধারণ করেন। তৎকালীন চিতোরের মোরিরাজা মানসিং ছিলেন সম্পর্কে বাপ্পার মামা। বাপ্পা চিতোরে চলে আসলেন মান সিং তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বাপ্পার বিচক্ষণতা ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মান সিং তাঁকে সামন্ত সমিতির অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন।

এতে সামন্ত রাজারা বাপ্পার উপর খুব চটে গেল। তারা বাপ্পাকে জব্দ করার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

এসময় মহম্মদ বিন কাসিম নামে জনৈক আরব রাজা চিতোর আক্রমণ করেন।

সামন্তরা মহারাজা মানকে কোন সাহায্য করল না।

বাপ্পা আপন বীরত্ব ও বিচক্ষণতায় শত্রুকে পরাজিত করেন। তারপরই বাপ্পা ছুটে গেলেন গজনী অভিযানে কেননা সেলিম নামে জনৈক মুসলমান ঐ হিন্দু রাজ্য দখল করে নেয়। রণে সেলিম পরাজিত হয়। একজন সুর্যবংশীয় সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে বসিয়ে বাপ্পা চিতোরে ফিরে আসেন।

যুদ্ধে বিজয়ের স্মারক স্বরূপ তিনি সেলিমের এক রূপসী যুবতী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এজন্য রাজা মান তাঁকে তিরস্কার করেন। ফলস্বরূপ বাপ্পাও মাতুলের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। সামন্তগণ মামা - ভাগ্নের ঝগড়ার সুযোগ নেয়। তারা সেলিমের কন্যার সাহায্যে বাপ্পাকে রাজা মানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

বাপ্পা তার আশ্রয়দাতাকে বিতাড়িত করে চিতোরের সিংহাসনে বসেন। মেবারের সিংহাসনে নবযুগের সূচনা হল।

চিতোর গড় লুণ্ঠন প্রথম।

একের পর এক অতীতকালের ঘটনা মানসপটে ভেসে ওঠে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মহারাজা রতন সিং চিতোর গড়ের সিংহাসনে বসেন। মহারাজার স্ত্রী পদ্মিনী ছিলেন অসামান্য রূপসী এবং খুব বুদ্ধিমতী।

তখন দিল্লীর মসনদ অলংকৃত করছেন আলাউদ্দিন খিলজী। খিলজীর কর্ণগোচর হয় পদ্মিনীর রূপ এবং গুণের কথা। শোনার পর দুশ্চরিত্র আলাউদ্দিন খিলজীর মনে রূপ লালসা তীব্র হয়ে উঠে।

আলাউদ্দিন ১৩০২ খৃষ্টাব্দে পদ্মিনীকে পাওয়ার আশায় চিতোর আক্রমন করেন। বহু চেষ্টার পরও তিনি চিতোর জয় করতে পারলেন না. তখন তিনি রতন সিং-এর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন— আপনার স্ত্রীকে একবার দেখতে পেলে আমি দিল্লী ফিরে যাব।

বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে পদ্মিনী এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পরামর্শ দিলে রতন সিং আলাউদ্দিনকে জানালেন—যদি আরশিতে প্রতিবিম্ব দেখে খুশি হন, তবে সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি।

কামুক সুলতান তাতেই রাজি হলেন। তিনি কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে অগণিত রাজপুত সৈন্যবেষ্টিত চিতোর দুর্গে প্রবেশ করলেন। সুলতান জানতেন তাঁরা কখনো অতিথিকে অসম্মান কিংবা আঘাত করে না। এই মহান নীতিই রাজপুতদের বৈশিষ্ট্য।

রতন সিং তাঁর অতিথি—সুলতানকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। ঐ কক্ষে ঝুলানো ছিল আয়না। আর কক্ষের পাশেই ছিল একটি লেক। লেকের সোপানে কেউ দাঁড়ালে তার প্রতিবিম্ব আয়নাতে এসে পড়ে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য পদ্মিনী লেক সংলগ্ন প্রাসাদের সোপানে দাঁড়ালেন। আর আলাউদ্দিন নির্দিষ্ট স্থানে বসে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখলেন। কিন্তু সে অসামান্য রূপসীকে দেখে কামুক সুলতানের কামনা বহ্নি প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে বহুগুণ বেড়ে গেল।

সরল মানুষ রতন সিং সে ছলনা বুঝতে পারেননি। তিনি গেলেন দুর্গের বাইরে সুলতানকে এগিয়ে দিতে, কেননা সুলতানের শিবিকা সেখানেই অপেক্ষা করছিল। বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দিন রাণাকে সেখানে বন্দী করেন। সুলতানের আদেশ জারি হয়—একমাত্র পদ্মিনীর পরিবর্তেই রতন সিংকে মুক্তি দেওয়া হবে।

মুহূর্তে খবর চড়িয়ে পড়ল।

খবরটা যথাসময়ে পদ্মিনীরও কর্ণগোচর হয়। বুদ্ধিমতি পদ্মিনী সুলতানের শর্ত মেনে রাজি হলেন।

তিনি সুলতানের কাছে খবর পাঠান -- আমি আপনার হারেমে যেতে রাজি আছি কিন্তু কোন গোপনস্থানে আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার সঙ্গে কয়েকজন সখী ও পরিচারিকা যাবে। এছাড়া চিতোরের মেয়েরা আমাকে চিরবিদায় জানাবার জন্য সাতশত পালকি করে আপনার শিবির পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তাদের নিরাপত্তার জন্য পত্রপাঠ আপনাকে চিতোরের অবরোধ তুলে নিতে হবে।

আলাউদ্দিন সে প্রস্তাবে রাজি হলেন। তিনি চিতোরের অবরোধ তুলে নিলেন। পদ্মিনীর সঙ্গে সাত শত দোর দেওয়া পালকি আলাউদ্দিনের শিবিরে এল। পদ্মিনীর সঙ্গে তাঁর কাকা গোরা এসেছিলেন।

সুলতানের অনুমতি নিয়ে পদ্মিনী রতন সিংকে মুক্ত করে দেয়। কিছুক্ষণ বাদে পালকির শোভাযাত্রা দুর্গের দিকে ফিরে চলল। সুলতান বুঝলেন রাজপুত মেয়েরা পদ্মিনীকে পৌঁছে দিয়ে চিতোর গড়ে ফিরে যাচ্ছেন।

প্রায় আধঘন্টা হয়ে গেল। পদ্মিনী রতন সিং-এর শিবির থেকে ফিরে আসছেন না দেখে চিন্তিত হলেন। তবু আরো কিছুক্ষণ তিনি অপেক্ষা করলেন। ততক্ষণে রাণা রতন সিং পদ্মিনীকে নিয়ে প্রসাদে পৌঁছে গেছেন।

এদিকে সুলতান অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তিনি ছুটে গেলেন রতন সিং-এর তাঁবুতে। হায়! প্রাণের পদ্মিনী কোথায়? নেই, পদ্মিনী নেই। সেই সঙ্গে রাণা রতন সিং উধাও।

আলাউদ্দিন রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি আদেশ দিলেন — যেমন করে পার ওদের ধর। সুলতানের গ্রেপ্তারীবহিনী বেশি দূর এগোতে পারল না। তার আগেই প্রতি পালকি থেকে ছয়জন সশস্ত্র রাজপুত যোদ্ধা বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপর।

শুরু হল যুদ্ধ।

গোরা এবং কয়েক জন বীর রাজপুতকে প্রাণ দিতে হল। কিন্তু সে ক্ষতির তুলনায় আলাউদ্দিনের ক্ষতি হল আরো বেশি। সেবারে সুলতান ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন দিল্লী।

দিল্লী ফিরে আলাউদ্দিন শোকে এবং রাগে অস্থির হয়ে উঠলেন। সর্বক্ষণ পদ্মিনী আর চিতোরগড় বিজয়ের কথা ভাবতে থাকেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন আরো বেশি সৈন্য নিয়ে চিতোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দ্বিতীয়বার সুলতান সফল হন। চিতোর গড়ের পতন হল। পদ্মিনী নিজের ইজ্জত

রক্ষার জন্য জহরব্রত পালন করেন। পদ্মিনীর সঙ্গে তার সহচরী এবং পরিচারিকাগণও নিজেদের আত্মাহুতি দেন।

চিতোর পতনের পর ব্যর্থ প্রেমিক আলাউদ্দিন তাঁর পুত্র খিজির খাঁর হাতে চিতোরের শাসন ভার দিয়ে দিল্লী ফিরে যান। কয়েক বছর পর খিজির খাঁ জালেবের চৌহান সর্দার মালদেওর হাতে শাসন ভার ন্যস্ত করেন।

এরপর চিতোরের শাসন ক্ষমতা আবার সিসোদিয়া রাজপুতদের হস্তগত হয়। সে এক চমকপ্রদ কাহিনী।

অরিসিং ছিলেন সিসোদিয়া সামন্ত। তিনি এক কৃষক পরিবারে বিবাহ করেন। চৌহান পরিবারের দরিদ্র রাজপুত কন্যা ছিলেন পরমা সুন্দরী। অরিসিং তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হনএবং তাকে গোপনে বিবাহ করেন। বিবাহের পর স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতে রেখে দেন। কালক্রমে অরিসিং-এর স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জননী হন। পুত্রের নাম রাখা হয় হামীর।

এদিকে চিতোর গড় লুণ্ঠন (প্রথম) এর সময় যুদ্ধে অরিসিং মারা যান। অরিসিং-এর ভাই অজয় সিং সামন্ত হন। তিনি অরিসিং-এর গোপন বিবাহের কথা জানতে পারেন। হামীরকে তার মাতুলালয় থেকে নিয়ে আসেন। হামীর উত্তরাধিকার সূত্রে সামন্ত হন।

মহারাণা হামীর ।

হামীর চিতোর উদ্ধারের সংকল্প নেন। তিনি অনেক জাগিরদারকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। রাও মালদেব তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে হামীরকে অপদস্থ করতে চাইলেন। হামীর বিচলিত না হয়ে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

বিবাহের পর মালদেবের কন্যা তার পিতাকে পরাজিত করার জন্য স্বামীর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

হামীরের পুত্র সন্তান জন্মাল।

মালদেবের কন্যা তার পুত্র সন্তানকে নিয়ে চিতোর গেলেন গৃহদেবতার আশীর্বাদ নিতে। আর এ সুযোগে মালদেবের সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে হামীরকে সমর্থন জানানোর ব্যবস্থা পাকা করলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হামীর চিতোর আক্রমণ করে এবং মালদেবকে পরাজিত করেন।

১৩২৬ খৃষ্টাব্দে হামীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিসোদিয়া রাজবংশে চিতোরের ক্ষমতা পুনরায় ফিরে এল। মহারাণা হামীর অন্নপূর্ণা মন্দির এবং একটি সরোবর খনন করেন।

ক্ষেত্র সিং।

হামীরের পর ক্ষেত্র সিং-রাজ্যের সীমানা অনেকটা বাড়িয়ে নেন। তিনি মান্দলগড়, আজমীর এবং জাহাজপুর জয় করেন। মালবের সুলতান দিলাবার খান এবং ইদরের রাও রানমল তার কাছে পরাজিত হন।

রানমল তার কাছে পরাজিত হন।

ক্ষেত্র সিং এর রাজত্ব কাল ছিল ১৩৬৪ থেকে ১৩৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এসময়ে তিনি খতন রানীর প্রাসাদ তৈরি করেন।

মহারাণা কুম্ভ ।

ক্ষেত্র সিং-এর পরে উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন মহারানা কুম্ভ। তিনি চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৪৩৩ সালে।

কুম্ভ মেবারকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি যেমন ছিলেন মহাবীর যোদ্ধা তেমনি বিক্রমশালী শাসক। আর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কাব্যচর্চা করতেন। রণচর্চা আর কাব্যচর্চার সমন্বয় এমন আর কোন শাসকের মধ্যে দেখা যায়নি।

তিনি ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে মালবের সুলতান মোহম্মদ খিলজিকে সারঙ্গপুরের কাছে পরাজিত করেন। বিজয়ের স্মারক স্বরূপ চিতোরে জয়স্তম্ভ গড়েন। জয়স্তম্ভের অলঙ্করণের মধ্যে কুম্ভের স্থাপত্য কলা ও শিল্পপ্রীতি ফুটে উঠে।

কুম্ভ জীবনে বহু ছোট বড় যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বুন্দি, রনথম্ভোর, মান্দলগড়, সারঙ্গ পুর, খাতু, ছাতসু, টোঢা, আজমীর, সম্বর, জয়পুর, মালপুর, মান্ডোর, আমের (অম্বর), হামীরপুর, আবু এবং রণথম্বোরে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। এছাড়া মালব এবং নাগোর বহুবার জয় করেন।

মহারাণা কুম্ভ মেবারকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সামরিক শক্তিকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেন। তৈরি করেন দুর্গ। মেবারের ৮৪টি দুর্গের মধ্যে তিনি একাই তৈরি করেন ৩২টি। তার মধ্যে সিরোহির বাসন্তী, বাদনোরের বৈরাট, আবুর অচলগড় এবং কুম্বলগড় উল্লেখযোগ্য। কুম্বলগড় দুর্গটি উদয়পুর থেকে ৫০ মাইল দুরে অবস্থিত।

তিনি চিতোরগড় দুর্গে সাতটির বেশি তোরণ তৈরি করে দুর্গকে সুরক্ষিত করেন এবং পাহারার জন্য অনেকগুলো চৌকি তৈরি করেন। এছাড়া বহু মন্দির, প্রাসাদ এবং লেক তৈরি করেন। চিতোরের কুম্ভ-শ্যাম মন্দির এবং কুম্ভ প্রাসাদ তাঁরই কীর্তি।

একাধারে সৈনিক, স্থপতি, মহান শিল্পী এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ,— সাধারণত খুব কম লোকের মধ্যে এক সঙ্গে এত গুণের সমাবেশ হতে দেখা যায়। তিনি জয়দেবের গীত গোবিন্দ নিয়মিত পাঠ করতেন এবং তার উপর সঙ্গীত রাজ, সঙ্গীত মীমাংসা এবং রসিক প্রিয়া ভাষ্য লিখেছেন।

তাঁর রাজসভায় জ্ঞানীগুনীদের উচ্চ স্থান ছিল। এই মহাজীবন ১৪৬৮ সালে তাঁর পুত্র উদার হাতে নির্বাপিত হয়।

মহারাণা সংগ্রাম সিং (সঙ্ঘ)।

মেবারের ইতিহাসে উজ্জ্বল ব্যাক্তিত্বদের মধ্যে মহারাণা সংগ্রাম সিং (সঙ্ঘ) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

মহারাণা কুম্ভের দৌহিত্র সংগ্রাম সিং চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে। মহারাণা সঙ্ঘ ছিলেন বীরযোদ্ধা। তখনকার দিনে শক্তিশালী হিন্দু রাজা।

তাঁর সামরিক বিভাগে লক্ষাধিক সেনা, পাঁচশ হাতি ছিল। সাতজন শাসক, নয়জন রাও এবং ১০৪ জন রাওয়াত নিয়ে সংগ্রাম সিং শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন।

ছোটবেলায় তাঁর ভাইদের সঙ্গে এলোপাতাড়ি মারামারি করতে গিয়ে একটি চোখ নষ্ট হয়। দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে যুদ্ধে একটি হাত এবং একটি পা খোয়ালেন। এমনকি সারা শরীরে ৮০টি ক্ষত ছিল। তা সত্বেও তিনি পরবর্ত্তীকালে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন।

মহারাণা সঙ্ঘ মোট আঠারটি ছোট বড় যুদ্ধ করেন, দিল্লীর সুলতান এবং মালব রাজার সঙ্গে। ১৫২৭ সালে এই মহাবীর বিষক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করেন।

মীরা বাঈ।

রাজস্থানী ইতিহাসে এক ভগবৎপ্রাণা নারী উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। এই ভক্তিমতি মহিয়সীর আবির্ভাব ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। ইনি হলেন কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ।

মীরাবাঈ ছিলেন মেড়ত্রর রাও বুধাজীর নাতনী এবং রতন সিং এর কন্যা। এক রতন• সিং ছিলেন পদ্মিনীর স্বামী। আর এই রতন সিং ছিলেন মাড়বারের একজন রাঠোর সামন্ত। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে মেড়তা তালুকের কুকাড়ী গ্রামে এক বৈষ্ণব পরিবারে মীরার জন্ম হয়।

ছোটবেলা থেকে মীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা উজাড় করে দেন এমনকি তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে স্বামীজ্ঞানে পূজা করতেন।

শিশু মনে অনেক কৌতুহল থাকে। একদিন এক প্রতিবেশিনীর বিয়ে হয়। প্রতিবেশিনীর স্বামীকে দেখে মীরা মাকে প্রশ্ন করে—মা, আমার স্বামী কে ?

সাংসারিক কাজে ব্যস্ত মা বুঝলেন মেয়ের আগ্রহ না মেটালে সারাদিন ঐ এক কথা জানার জন্য বিরক্ত করবে। মা শিশুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য গৃহদেবতাকে দেখিয়ে বল্লেন ঐ গিরিধারী তোমার স্বামী।

বালিকা মীরা সে দিন থেকে গিরিধারীকে স্বামীজ্ঞানে সেবা করতে থাকেন।

এদিকে কৃষ্ণপ্রাণা মীরা বড় হয়ে উঠে। কৈশোরে উপনীত হতেই তাঁর গান ও রূপের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহারাণা সংগ্রাম সিং মীরাকে পুত্রবধূ করে চিতোরে নিয়ে আসেন।

মহারাণা সঙ্ঘের বড় ছেলে ভোজরাজের সঙ্গে মীরার বিয়ে হয়। সাত বছর পরে ১৫২৭ সালে খানুয়ার যুদ্ধে ভোজরাজ শহীদ হন।

শুরু হল মীরার বৈধব্য জীবন। বৈষ্ণব পরিবারে থেকে শাক্ত পরিবারে এসে জীবনযাত্রা ও স্বামী সহচর্যে মীরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন,—তার জীবন দেবতা 'গিরিধারীকে'। কিন্তু

কৃষ্ণ-প্রেমপরায়না মীরা এবার সংসারের সব চিন্তা দূরে সরিয়ে নিজের সাধনায় মন দিলেন। শুরু হল ভজন গানের সাধনা।

সংসারীদের সাধনার পথ নিষ্কন্টক নয়। মীরার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। শাশুড়ী ননদ চাইল না মীরা রাজপরিবারের তরুণী বিধবা হয়ে সাধু সঙ্গে মেশে। তারা নানাভাবে মীরাকে তার সাধনার পথে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু মীরা পূর্ব জন্মের সংস্কার কি করে ভোলে! সাধনার পথই তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল।

একদিকে শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা ও বাধা অন্যদিকে মীরার দেওর হল আর এক বিপদের প্রতিমূর্তি। ভোজরাজের মৃত্যুর পর তার ভাই বিক্রমাদিত্য মীরার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন। ভোগ সর্বস্ব এই লোকটি মীরার চরিত্র নষ্ট করার চেষ্টা করলেন। তাতে সফল না হয়ে মীরার নামে কলঙ্ক রটালেন।

এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কৃষ্ণ-প্রেমপরায়না তাঁর কঠিন সাধনায় অবিচলিত রইলেন।

শেষে রাণা ক্ষেপে গেলেন। একদিন হরিচরণামৃত বলে এক কাপ বিষ মীরার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মীরা পরম ভক্তিতে সে বিষ খেয়ে নিলেন। পরম করুণাময় ভগবানের ইচ্ছায় ভক্তের হাতের বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হল।

এ ঘটনার পর মীরা শ্বশুর গৃহের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং চিরকালের মত রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু যাবেন কোথায়?

প্রথমে গেলেন পিত্রালয়ে। সেখানে পিতা স্বর্গবাসী। দুঃখিনী মীরার ঠাঁই হল না সেখানে। সুতরাং বৃন্দাবনের পথে রওয়ানা হলেন তিনি। পথিমধ্যে বনাস নদীর তীরে কিছু দিন কাটালেন। সেখানে সাধনার মাঝে মনে জ্বাললেন অনির্বাদ দীপ। তারপর পৌঁছালেন বৃন্দাবনে। সেখানে প্রেম-ধর্মের অন্তহীন যমুনায় স্নান করে পূর্ণতা লাভ করলেন।

বৃন্দাবনের পথে পরিক্রমা শেষ করে কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করেন। কৃষ্ণ সেবা , সাধু সঙ্গ ও ভজন রচনার মধ্যে জীবন মধুময় হয়ে উঠল। এসময় সারা ভারতে শ্রেষ্ঠ সাধিকা ও রচয়িতার স্বীকৃতি পেলেন।

শেষ জীবনে কৃষ্ণ সাধিকা মীরা ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে চলে গেলেন দ্বারকায়।

চিতোর গড় লুণ্ঠন দ্বিতীয়। আলাউদ্দিনের পর চিতোর দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে, গুজরাটের সুলতান বাহাদুর সাহ কর্তৃক।

মহারাণা বিক্রমাদিত্য (বিক্রমজিৎ) চিতোরের সিংহাসনে আরোহন করেন ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন মদ্যপ এবং চরিত্রহীন। তিনি মদ আর মেয়েমানুয ছাড়া চলতে পারতেন না। এমনকি নিজের বড় বৌদি মীরাবাঈকেও অসম্মান করতে উদ্যত হলেন।

গুজরাটের সুলতান ১৫৩৩ সালে চিতোর আক্রমণ করলেন। মালবের কিছু অংশ দখল করে তিনি নিজ রাজ্যে ফিরে যান। বাহাদুর শাহ্ ১৫৩৫ সালে দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করলেন। আলাউদ্দিনের চিতোর অবরোধের ২৩০ বছর পর চিতোর দ্বিতীয়বার অবরুদ্ধ হল।

সামন্তগণ সংগ্রাম সিং-এর ছোট ছেলে উদয় সিংকে বুন্দির রাজার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেন। চিতোর রক্ষার আর কোন উপায় নেই দেখে রাজমাতা (সংগ্রাম সিং এর পত্নী) কর্ণাবতী তেরহাজার রাজপুত রমনীকে নিয়ে জহরব্রত পালন করেন।

কর্ণাবতীর রাখী ভাই ছিলেন দিল্লীর শাসক হুমায়ুন। আত্মাহুতির আগে তিনি হুমায়ূনের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠান।

কিন্তু হায়! রাখী ভাইয়ের কাছে সংবাদ পৌঁছবার আগেই চিতোর ধ্বংস হয়। সুতরাং হুমায়ূন সোজা গুজরাট রওয়ানা হন। নিজরাজ্য রক্ষার জন্য বাহাদুর এবার গুজরাটে ফিরে গেলেন। বাহাদুর প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন। চিতোর আবার সিসোদিয়া রাজপুতদের দখলে আসে।

হুমায়ূন চিতোর এবং গুজরাটের শাসন ভার বিক্রমজিৎ-এর হাতে দিয়ে দিল্লী ফিরে যান। হুমায়ুনের কৃপায় বিক্রমজিৎ চিতোরের সিংহাসনে বসতে পারলেন। কিন্তু তার স্বভাব বদলাল না। তিনি সামন্তদের সাথে কলহ শুরু করলেন।

সামন্তগণ বিক্রমজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। বাধ্য হয়ে তারা পৃথ্বীরাজের উপপত্নীর ছেলে (সংগ্রাম সিং এর ভাই) বনবীরকে উদয়ের অভিভাবক নির্বাচিত করলেন এবং তাঁরই হাতে উদয়ের হয়ে রাজ্য শাসনের ভার দিলেন। কেননা উদয় তখনও ছয় বছরের শিশু। বনবীর যোগ্যতার সঙ্গে রাজকার্য চালাতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যে বনবীর লোভাতুর হয়ে উঠলেন। তিনি বিক্রমজিৎ ও উদয়কে হত্যা করে নিষ্কণ্টক হতে চাইলেন। পান্নাদাই এই অভিসন্ধির কথা জানতে পারলেন।

পান্না দাই।

মাতৃহারা শিশু উদয় সিংকে যে লালন পালন করতেন তার নাম পান্না। পান্না নিজের ছেলের থেকেও বেশি ভালবাসতেন রাজকুমারকে।

রাজকুমার উদয় এবং পান্নার ছেলে উভয়ে সমবয়সী। বনবীরের অভিসন্ধি জানার পর পান্না খুব সতর্ক হয়ে থাকতেন।

একদিন রাতে ধাত্রী উদয়কে খাইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন এমন সময় বিক্রমের অন্তিম আর্তনাদ শুনতে পেলেন। পান্নাদাই বুঝতে পারলেন বিপদ আসন্ন। বনবীর উদয়কেও হত্যা করবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উদয়কে পাশের বাড়ির নাপিতের কাছে দিয়ে বললেন —

'এক্ষুনি উদয়কে নিয়ে দুর্গের বাইরে চলে যাও, আমি দুর্গের বাইরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

প্রাসাদে ফিরে পান্না নিজের ছেলেকে রাজপুত্রের পোষাক পরিয়ে উদয়ের বিছানায়

শুইয়ে দিলেন। ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে বনবীর রক্তাক্ত ছুরি হাতে ঘরে ঢুকে জানতে চাইল—

—উদয় কোথায়? পান্না সভয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। ভয়ঙ্কর বিপদের পরিণাম বুঝে বাকরুদ্ধ হলেন। পান্না নিরুত্তর। বনবীর পুনরায় হুঙ্কার ছাড়লেন—

—উদয় কোথায়?

মূহুর্তে পান্না কর্তব্য সচেতন হলেন। মুখে কোন কথা বলতে পারলেন না। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল উষ্ণ জলধারা। তিনি কোন মতে হাতের ইশারা করে দেখালেন রাজপুত্রের বিছানার দিকে। বনবীর ছোরা হাতে এগিয়ে গেলেন সে দিকে। পান্না চোখ বুজলেন। বনবীর ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত শিশুর বুকে ধারাল ছুরি আমূল বিদ্ধ করে দিলেন। নিরপরাধ শিশু কিছু বোঝার আগেই খানিক ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

মায়ের কর্তব্যনিষ্ঠার বলি হল শিশু পুত্র। আর বনবীর রাজপোষাক পরিহিত শিশুকে আলোতে উদয়সিং ভেবে নিশ্চিন্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাছাড়া তাঁর পরখ করে দেখার সুযোগ কোথায়! লোভে আচ্ছন্ন জ্ঞান-বিবেক-হীন মানুষের জ্ঞানটুকুও যে থাকে না।

কর্তব্যের প্রতীক পাষাণ প্রতিমা মা মূহুর্তে সচকিত হলেন। চোখের জল মোছার সময়ও নেই— উদয়! প্রভুপুত্র উদয় সিং, ভবিষ্যতে মেবারের মহারাণাকে বাঁচাতে হবে। দুর্গের বাইরে ছুটে আসেন পান্না। নাপিতের কাছ থেকে উদয়কে নিয়ে ছুটতে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

শ্রান্তিহীনা ধাত্রী উদয়কে নিয়ে অনেক জায়গায় ছুটে গেলেন। কিন্তু কেউই বনবীরের ভয়ে উদয়কে আশ্রয় দিতে চাইল না। শেষে পান্না কমলমীরের কুম্ভ মেরু দুর্গে গিয়ে আশা শার করুণা ভিক্ষা করেন। তিনিও প্রথমে উদয়কে আশ্রয় দিতে চাইলেননা। কিন্তু তাঁর মায়ের আদেশে শেষ পর্যন্ত উদয়কে আশ্রয় দিতে বাধ্য হলেন।

উদয় আশা-শার ভাগনের পরিচয়ে বড় হতে লাগলেন। উদয় যখন তারুণ্যে উপনীত হয় তখন একদিন পান্না শোনিগুরু সর্দারের কাছে উদয়ের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেন।

সর্দারজী কমলমীরে মেবারের সমস্ত সর্দার ও সামন্তদের নিয়ে একটি সভা করেন। সেই সভাতেই ধাত্রী পান্নার আত্মত্যাগ ও প্রভুভক্তির কথা জানাজানি হয়। সামন্ত ও সর্দারগণ ঠিক করলেন উদয়ই হবে চিতোরের মহারাণা।

তারপর সামন্ত ও সর্দারদের সহায়তায় মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে উদয় চিতোর দখল করলেন।

চিতোর গড় লুণ্ঠন তৃতীয়।

মহারাজা উদয়সিং বনবীরকে পরাজিত করেন ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে। সিংহাসনে বসার পর সামন্ত গণ বুঝলেন উদয় সিং রাণা বংশের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারবেন না। মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া তিনি আর কিছুই বোঝেননা। এমনকি তার রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানও নেই কেননা, কেউ জেনে শুনে কি তৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের শত্রুকে আশ্রয় দেয়!

উদয় সিংএর কার্যকলাপে মেবারের জনসাধারণ কিংবা সামন্তগণ যেমন নিরাশ হয়ে ছিলেন তেমনি আশাহত হয়েছিলেন কর্ণেল টড। তিনি মন্তব্য করেছেন "মেবারের রাণাদের তালিকায় উদয় সিংএর নামটি না থাকলেই ভাল হত।"

উদয় সিং এর সময়ে দিল্লীর বাদশাহ্ আকবর একটু একটু করে রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন। তিনি বহু রাজপুত রাজাকে পরাজিত করেন। তিনি মালব রাজ বাজবাহাদুরকে বিতাড়িত করেন। উদয় সিং বাজ বাহাদুরকে চিতোরে আশ্রয় দিলেন। আকবর বুঝলেন এই সুযোগেই চিতোর আক্রমণ করা যায়।

চিতোর আক্রান্ত হতে পারে বুঝেই উদয় সিং সপরিবারে আরাবল্লীর আরো গভীরে আশ্রয় নিলেন। সেখানেই তিনি নগর গড়তে শুরু করেন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পরবর্ত্তীকালে সে জায়গার নাম হয় উদয়পুর।

আকবর ১৫৬৭ সালের অক্টোবর মাসে চিতোর অবরোধ করেন। চিতোরগড়ে মহারাণা নেই। স্বাভাবিক কারণে যোদ্ধাগণ অনেকটা নিরাশ হয়ে পড়লেন। তাহলেও আকবর সহজে চিতোর গড় দখল করতে পারেননি। প্রায় দুমাস ধরে দুর্ভেদ্য চিতোরগড় দুর্গের কোন ক্ষতিই করতে পারেনি।

তখন কামানের গোলায় মুঘল সৈন্যগণ দুর্গ প্রাকারের একটা অংশ নষ্ট করে ফেললেন। রাতের বেলা বীর জয়মল ঐ প্রাকার মেরামত করতে গেলে আকবরের গুলিতে তিনি নিহত হন।

এরপর নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন তরুণ বীর পাট্টা। প্রচন্ড মুঘল শক্তির চাপে এক সময় তিনিও নিহত হন। তারপর চিতোর রক্ষার আর কোন আশা নেই দেখে হাজার রাজপুত রমণী জহরব্রত পালন করেন। লুঠেরাদের হাতে সম্ভ্রম নষ্ট করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

জহরব্রতের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই আগুনের ধোঁয়া দেখে মুঘল সৈন্যগণ বুঝতে পারেন চিতোরের পতন আসন্ন। মুঘল সৈন্যের চাপ আরো বাড়তে থাকে। তার পরেও রাঠোর জয়মল, সিসোদিয়া পাট্টা, রাওয়াত শ্যাম দাস শাহিদাস, প্রামার ও ঝালাপতি প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় বীরগণ যুদ্ধ করে বীরের মত মৃত্যুবরণ করেন। আকবর এই সব বীরদের মৃতদেহের উপর দিয়েই রক্তাক্ত পায়ে শ্মশানপুরী চিতোরে পৌঁছোন।

চিতোর ধ্বংস হয়। লুণ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এ লুণ্ঠন—চিতোর গড় লুণ্ঠন তৃতীয় নামে পরিচিত। কর্ণেল টডের মতে—চিতোর বিজয়ীদের মধ্যে আকবর ছিলেন নৃশংসতম। কেননা আলাউদ্দিন এবং বাহাদুরের তুলনায় তিনি চিতোরের বেশি ক্ষতি সাধন করেন। প্রায় সমস্ত দেবালয় ও প্রাসাদ ধ্বংস করেন। চিতোর রক্ষার জন্য আগত মেবারের প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষকে হত্যা করেন। হাজার হাজার রমণী জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হন।

সম্রাট আকবর মৃতপুরী জয় করেন ঠিক। কিন্তু তিনি কখনোই মেবার হস্তগত করতে পারেননি।

স্বাধীনতার শেষ সলতেটি উদয় সিং-এর পুত্র প্রতাপ সিং—প্রজ্বলিত রাখেন। সে কাহিনী অনত্র।

আমি ভাবছি সেই সুমহান তীর্থস্থানের কথা। তীর্থস্থান বৈকি ! যে স্থানের মানুষের আদর্শ, আত্মত্যাগ, বীরত্ব আপন মহিমায় ভাস্বর—যা সুন্দর, সত্য ও মহত্ত্বের প্রতীক। তারই পাশাপাশি অসুন্দর—লোভ, লালসা ও হীনতার প্রকাশ।

আর এজন্যই চিতোর গড়ের ইতিহাস এত উজ্জ্বল। চিতোর গড়ের আদর্শ সারা ভারতের মানুষের কাছে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। সে স্থান নিঃসন্দেহে তীর্থস্থান। আর এই তীর্থ স্থানের আদর্শই পারে ভারতকে আরো বেশী গৌরবান্বিত করতে। সেই মহাতীর্থের যে সব মহাবীরগণ লোভী মানুষর সৃষ্ট কলুষতাকে বুকের রক্ত ঢেলে ধুয়েছেন এবং সতীত্ব রক্ষার জন্য যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের জানাই প্রণাম।

সিসোদিয়া রাজবংশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭৩৮ থেকে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চিতোর ভাঙ্গা গড়া, ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী—প্রাসাদ, দেবালয়, নগরীর কীর্তি স্মারক, স্মৃতি স্মারক ও অন্যান্য দ্রষ্টব্যসমূহ আজকের দর্শনীয় বিষয়।

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাছন্ন হয়ে পড়ি। তারপর গভীর নিদ্রা। ঘুম যখন ভাঙ্গে ঘড়ি দেখি, সাড়ে আটটা বাজে। হোটেল সানভারিয়ার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াই।

ঐ তো! ভারতের গর্ব চিতোরগড় দুর্গ।

সেকালের দুর্গনগরী আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মন আনন্দে নেচে উঠে। মনে মনে বলি—আসছি, আমি তোমার কোলে বিচরণ করে জীবন সার্থক করব।

স্নান করে ট্যারিস্ট অফিসে এসে জানতে পারি চিতোর গড় দর্শনে কনডাকটেড ট্যুরের কোন ব্যবস্থা নেই। কি আর করা যাবে! একটা অটো রিকশা ঠিক করলাম। ড্রাইভার যেতে আসতে পথে যত খুশি লোক তুলে তার ভাড়া উসুল করবে। শুধু চিতোর গড় দুর্গে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে তোলা যাবে না।

নয়

অটো চলতে শুরু করে।

শুরু হল আজকের অর্থাৎ ৫ই অক্টোবর, ১৯৯৫ সালের পরিক্রমা। অটো প্রথমে পশ্চিম দিকে কিছুটা গিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলতে থাকে। এখানে কয়েকটা পথের সংযোগ হয়েছে। পথের মিলনস্থল থেকে ডান দিকের রাস্তা ধরে কিছুটা পূর্ব দিকে চলতে থাকে। উত্তরে যেতেই হবে। কেননা শহরের দক্ষিণ দিকে চিতোর রেলস্টেশন।

রেল স্টেশনের কাছেই হোটেল সানভারিয়া। হোটেল সানভারিয়া থেকে সোজা পূর্ব

দিকে রেল লাইন ও গাম্ভেরী নদী পার হয়ে গেলে দুর্গের দক্ষিণ দিকে ওঠা যায়। সোজা গেলে বড় জোর তিন কিলোমিটার যেতে হবে।

তা সম্ভব নয়।

এখন প্রায় ১০ কিমি উত্তরে গিয়ে দুর্গের পশ্চিম দিক দিয়ে পৌঁছাতে হবে উপরে। চলার পথের দুদিকে দেখছি জনবসতি, অফিস, বাড়িঘর অট্টালিকা। ডান দিকে দেখছি একটা প্রেক্ষাগৃহ। শহরে জৌলুস। সেকালে কিন্তু এসব ছিল না। সমতলে শহরও ছিল না। ছিল দুর্গনগরী চিতোর। আর দুর্গনগরীর ইতিহাসই চিতোরের ইতিহাস ।

কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়লাম গাম্ভেরী নদীর তীরে। এই নদীটি সেকালে দুর্গনগরী চিতোরের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে খুব সহায়ক ছিল। এখন নদী পারাপারে কোন সমস্যা নেই।

এই ব্রীজ তৈরি হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে।

সম্ভবতঃ আলাউদ্দিন খিলজির পুত্র খিজির খাঁর নামে ব্রীজটি উৎসর্গীকৃত। তাই আজও সে নামটি রয়েছে। খিজির খাঁ তৎকালীন চিতোরের শাসক ছিলেন। গাম্ভেরী নদী ছাড়িয়ে বাসস্ট্যান্ড। বাস স্ট্যান্ডের পর পথের পাশে বাড়ি ঘর অট্টালিকা। এসব ছাড়িয়ে এসে পড়লাম দুর্গের পাদদেশে। এখানে অটো থামল। তিনজন যাত্রী নেমে গেলেন।

এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ভারত গৌরব চিতোরগড়কে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতি মন্দির চিতোরগড় —'Citadel of Valour'

চিতোরগড় দুর্গটি যে পাহাড়ে অবস্থিত তা খুব উঁচু নয়। মাত্র ৫০০ ফুট। এই ঐতিহাসিক দুর্গের উপরি ভাগের দৈর্ঘ্য তিন মাইল এবং প্রস্থে আধ মাইলের মত। সমুদ্র সমতা থেকে ১৩৩৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। পাহাড়ের চারদিকের পরিধি আট মাইল। উপরি ভাগের জমির পরিমাণ ৬০৯ একর।

চড়াই পথ বেয়ে অটোরিকশা উঠতে থাকে। পাহাড়ের পাদদেশে দেখছি জঙ্গল এবং লতাগুল্ম।

এসে পড়েছি দুর্গের প্রথম তোরণ পদন পোলে। মজবুত তোরণ। সুন্দর তার গঠন এবং অলঙ্করণ. এখান থেকে নিচের দিকে চেয়ে দেখি। দৃষ্টি অনেক দূর চলে যায়। সেকালে শত্রুর প্রতি নজর রাখার উত্তম ব্যবস্থা।

এখানে দেখছি একটি স্মৃতিবেদী।

ড্রাইভার বললেন—এটি প্রতাপ গড়ের রাওয়াত বাঘ সিং-এর স্মৃতিবেদী।

১৫৩৫ সালের কথা। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর সরাসরি চিতোর আক্রমণ করলেন। কেননা তিনি ১৫৩৩ সালে মালবের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়ে বুঝেছিলেন চিতোরের দুর্বলতা কতখানি।

মহারাণা মিকুলের পৌত্র বাঘ সিং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে এখানেই শহীদ হন।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করি পদনপোল নাম হল কেন? — পদন মানে মহিষ। রাজস্থানের

মানুষ বিশ্বাস করে কোন এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রক্তনদীর ধারা বয়েছিল এখানে। সে রক্তনদীতে ভেসে এসেছিল একটি মহিষ। এই প্রথম তোরণের কাছে। তাই এমন নাম হয়েছে।

মনে মনে ভাবি যুদ্ধ মানেই তো রক্তপাত। যুদ্ধে রক্তনদীর ধারা না হ'ক রক্তের ধারাতো বইতে পারে। আর সে রক্তধারার মধ্যে একটা মহিষের আগমন নিশ্চয় সম্ভব।

এসে পড়লাম দ্বিতীয় তোরণ ভৈরণ পোলে। ভৈরণ পোলের ডানদিকে দেখছি দুটি ছত্রী। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন—'প্রাতঃস্মরণীয় বীর জয়মল এবং তার সহকারী কালার স্মৃতিসৌধ।'

জয়মলের মৃত্যুর পর সারা চিতোরের বীরাঙ্গনাগণ বুঝলেন লুঠেরাদের হাতে সম্ভ্রম এবং নারীত্ব লুণ্ঠিত হতে পারে। আলাউদ্দিন খিলজি এবং আকবর যে এক নন একথা তাঁরা জানতেন কিন্তু তাদের চরিত্র যে আলাদা তা তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন নি। সুতরাং সেদিন পুরনারীগণ সেচ্ছায় জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

অটো রিকশা স্টার্ট নেয়।

চিন্তাসূত্র কেটে যায়। গাড়ীতে উঠে পড়ি।

— ছত্রী দুটির কার কোনটি ?

— চার থামওয়ালা ছত্রীটি কালার আর ছয় থামওয়ালা ছত্রীটি জয়মলের।

প্রথম থেকেই দেখছি পথের পাশে প্রাচীর। দুর্ভেদ্য এবং অনতিক্রম্য। পাথর দিয়ে বাঁধানো। প্রাচীরের পাশ দিয়ে সৈন্য চলাচলের পথ। মাঝে মাঝে সিঁড়ি এবং চিলেকোটা। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোটায় উঠে সে সময় দুর্গের বাইরের শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করত রাজপুতগণ।

আর প্রাচীরে এই যে ফোকরগুলো! নিশ্চয় বন্দুকের নল বসাবার ব্যবস্থা!

এর পর তৃতীয় — হনুমান পোল। কাছে রয়েছে হনুমান মন্দির। এজন্য তোরণের এমন নাম হয়েছে। এখান থেকে দেখছি পথের পাশে দুসারি প্রাচীর। তখনকার দিনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমনই ছিল। আরো এগিয়ে চলি। চতুর্থ পোল। এই তোরণের নাম, গণেশ পোল। তোরণের কাছে রয়েছে গণেশজীর মন্দির। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ যথাক্রমে জোরল এবং লক্ষ্মণ পোল। এসব অতিক্রম করে অটো এসে থামল রামপোলের সামনে। এটি চিতোরগড়ে প্রবেশের শেষ তোরণ।

এখানে আরো দুজন যাত্রী নেমে গেল। পথ দেখছি দুদিকে চলে গেছে। একটি উত্তর দিকে আর একটি দক্ষিণ দিকে।

যে দুজন যাত্রী নামলেন তারা উত্তরদিকের গ্রামে যাবেন। দক্ষিণ দিকের পথে চিতোর নগরীর ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান অর্থাৎ একালের টুরিস্টদের দর্শনীয় স্থানগুলো পড়বে। আমি যাব সেদিকে।

সে পরের কথা।

এখন অটো থামতেই একজনকে এগিয়ে আসতে দেখেছি। ভাবলাম ইনিও প্যাসেঞ্জার। ড্রাইভারের সঙ্গে ভদ্রলোক কথা বলছেন। ড্রাইভার ইঙ্গিতে আমায় দেখিয়ে দেয়। কথা বলে বুঝলাম ইনি একজন গাইড। আমার একজন গাইডের দরকার।

ভারত গৌরব চিতোরের মাটিতে এই প্রথম পা রাখলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে দরদস্তুর করতেই নেমেছি। রফা হয়ে গেল। শুরু করলেন তিনি তার প্রথামত কাজ।

চিতোরগড়ের দ্রষ্টব্য দেখা শুরুর আগে চিতোরগড় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জেনে নিন।

'চিতোর ভারতের গর্ব এবং আদর্শস্থানীয়। রাজপুতানার হৃদ্‌পিণ্ড। চিতোরের আদর্শই রাজপুতানার আদর্শ। এটি সিসোদিয়া রাজপুতদের প্রাচীন রাজধানী। এর গৌরবময় ইতিহাস আজও মানুষকে প্রেরণা যোগায়। এই পবিত্র ভূমি বার বার আক্রান্ত হয়েছে। চিতোরের মানুষ ভেঙ্গেছে তবু মচকায়নি। তেজ, বীর্য, সাহসিকতা পৌরুষের লক্ষণ। তাঁরা পৌরুষতাহীন, আদর্শহীন মানুষকে জীবন্মৃত ভাবতেন। কোন সময়ে চিতোর আদর্শহীন হয়নি। এখানকার রমণীগণ জহরব্রত পালন করেছিলেন তবু সম্মান বিকোননি।

'স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তবু কোন বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নোয়ায়নি। সাম্রাজ্যবাদী অর্থলোলুপ পিশাচগণ বার বার চিতোরকে শ্মশানে পরিণত করেছে তবু এর গৌরব গাথাকে মুছে ফেলতে পারেনি। ন্যায়নীতি, পবিত্র কর্তব্য, রণনীতির আদর্শ এবং পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এমন আর কোথাও দেখা যায়নি।

'চিতোরের স্বাধীনতা ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য হাজার হাজার মানুষ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন। আদর্শ ছিল এ যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। চিতোরের বীরদের কাছে মাতৃভূমি ছিল—জননী স্বরূপ।

'বাপ্পা, কুম্ভ ও সংগ্রাম সিংএর হাতে গড়া চিতোর পদ্মিনী ও কর্ণাবতীর ভালবাসার চিতোর, রাণা প্রতাপ সিংএর প্রাণের চিতোর, যে পররাজ্যগ্রাসী নারীলোলুপ শয়তানরা ধ্বংস করতে এসেছিল তারা আজ ইতিহাসে কালীমালিপ্ত ও নিন্দিত। আর চিতোর বিশ্ব ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।'

তিনি বক্তব্য শেষ করে তাকিয়ে রইলেন রামপোলের দিকে। তার অলস দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকালাম সে দিকে। বুঝতে পাচ্ছি দৃষ্টি তার তোরণের দিকে গেলেও অন্তদৃষ্টিতে তিনি অতীতকে রোমন্থন করছেন।

রামপোলের কারুকার্য আমাকে আকৃষ্ট করে। আমি ঐদিকে কিছুটা এগিয়ে যাই। তিনিও এগিয়ে এলেন আমার পাশে। সহসা শুনি—'দেখুন, দেখতেইতো এসেছেন। দেখুন কি রকম মজবুত তোরণ। আর এর শিল্পকলাও কি অপূর্ব সুষমামণ্ডিত।'

অনতিদূরে রয়েছে একটি মন্দির। ঐদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—

'দেখুন ঐটি রামচন্দ্রের মন্দির । মন্দিরের পরিচয়ে তোরণের পরিচয়। গড়ের পথে এমন আরো ছয়টি তোরণ পেরিয়ে এসেছেন।'

বলি,—হ্যাঁ।

— ভৈরণ পোলে দেখেছেন দুটি ছত্রী।

— জী, হ্যাঁ, একটি বীর জয়মলের আর একটি তার সহকারী কালা'র।

'ঠিক, অবশ্য কেউ কেউ বলেন ঐ দুটি ছত্রী জয়মল ও পাট্টার। তা ঠিক নয়। পাট্টার ছত্রীটি রয়েছে এখানে। এই যে দেখছেন ছত্রীটি তোরণের দক্ষিণ দিকে, ওখানেই আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে পাট্টা নিহত হন।

লক্ষ্য করি নিচের দিকে। তোরণের অবস্থান দেখেই বোঝা যায় চিতোরবাসীগণ দুর্গের সুরক্ষার কথা কত গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন। এখান থেকে নিচের সমস্ত পথ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। সে কালে কারুর সাধ্য ছিল না পুররক্ষীদের চোখ এড়িয়ে গা ঢাকা দেয়।

অটোতে উঠে পড়ি।

গাড়ি চলতে থাকে। গাইড বললেন — দেখতে পাচ্ছেন প্রায় সমতল ভূমি, সে কালে দুর্গের জমিতে যে ফসল ফলত তাতে দুর্গনগরীর মানুষের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যেত। মাঝে মাঝে দেখছেন জলাশয়। মাটি নরম এবং উর্বর। ফসল ফলানোর উপযুক্ত মাটি।

— তার মানে দুর্গনগরী ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

— জী, হ্যাঁ।

ছয় মাস কিংবা এক বছর অবরুদ্ধ থাকলেও কোন অসুবিধা হত না।

— জী, হ্যাঁ।

দেখতে পাচ্ছি পথের দুপাশে পুরানো অট্টালিকা ধ্বংসাবশেষ। সপ্তম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের জনমানসে যে চিতোর ছিল আশা ভরসার প্রতীক, যে চিতোর অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীর ভিত নাড়িয়ে দিত এবং জাগ্রত যুবশক্তির পথিকৃত ছিল আজ সে চিতোর পরিত্যক্ত। কয়েকঘর গ্রামবাসী আর ট্যুরিস্টদের পদধ্বনিতে এখনও কোনওমতে সচল কিন্তু নিস্তেজ এবং বিকারহীন।

পথে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান ছেড়ে যাচ্ছি। ফেরার পথে এসব দেখা হবে। অনতিদূরে দেখছি কয়েকটি পাকা বাড়ি।

— ঐ দেখুন পাট্টার প্রাসাদ, পাশে বুন্দির সামরিক প্রধানের প্রাসাদ।

প্রাসাদ দুটি ধ্বংসের মুখে। গোমুখ কুণ্ড এবং কালীমাতা মন্দিরের মধ্যে এই প্রাসাদ অবস্থিত। অটো এসে থেমে গেল একটা উঁচু ভিতওয়ালা বাড়ির সামনে। দেখে মনে হয় এটি একটি মন্দির। মন্দির চূড়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এমন সময় গাইডের আহ্বান।

— চলুন, এটি চিতোরেশ্বরী—মানে কালী মন্দির।

কালী মন্দির

পথ থেকে ৩২ ধাপ উঁচুতে মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দিরের উত্তরে কিছু গাছ গাছালি আছে। তার মধ্যমণি একটা বট গাছ। বটের ছায়া শীতল পরিবেশ খুব আরামদায়ক। নাটমন্দিরের স্তম্ভগুলো সুন্দর কারুকার্যময় এবং গোলাকার। অনেকগুলো স্তম্ভ। উপরের ছাদ ধরে রেখেছে এই স্তম্ভগুলো। ছাদ থেকে তিনটি ঘন্টা ঝুলছে।

গাইড বলতে থাকেন---

'এই মন্দিরটি গুহিল রাজত্বে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে। গুহিল রাজত্বে সূর্য দেবের পূজা হত। তারপর মুঘলরা সে মন্দিরের ভীষণ ক্ষতি করে। ধ্বংসের পর কালীপূজার প্রবর্তন হয়। এই মন্দিরটি চিতোরের প্রাচীনতম মন্দির।'

আচ্ছা!

— আপনি বলেছেন মুঘলরা পুরানো মন্দির ধ্বংস করেন, তার মানে আকবরের সৈন্যবাহিনী এ ধ্বংস কাণ্ড ঘটায়।

— ঠিক।

— তার মানে চৌদ্দশ শতাব্দীতে মন্দির ধ্বংস হয়, এর আগে মন্দির অক্ষত ছিল?

— না, তার আগেও ধ্বংস কাণ্ড হয়েছে। মুসলমানরা তিন তিনবার চিতোর লুণ্ঠন করে। তিনবারই মন্দিরের ক্ষতি হয়। তবে আকবরের মুঘল বাহিনীর মত আর কেউ এত ক্ষতি করতে পারেনি।

গাইড আবার বলতে থাকেন -

'গুহিল রাজত্বে মূল মন্দিরটি তৈরি হয়। তারপর রাণা রাজারা এর সংস্কার করেছেন মাত্র। কিন্তু আদি কারুকার্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। এই যে স্তম্ভগুলো, মন্দিরের মেঝে এবং উঠান সবই কিন্তু গুহিল রাজত্বে তৈরি।

আশ্চর্য!

বারশ বছরের পুরানো স্থাপত্য, কিন্তু কত উন্নত!

"আশ্চর্য হওয়ার মত আরো কারণ রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন মন্দির গাত্রে প্রদক্ষিণ পথের দুদিকে এমনকি স্তম্ভগুলোতে কি সুন্দর খোদাই কাজ!

'মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বৈশাখী শুক্লা তিথির আট তারিখে। এজন্য নবরাত্রির সময় অর্থাৎ এপ্রিল - মে তে এখানে বিরাট মেলা বসে। দশ থেকে পনের হাজার লোকের সমাবেশ হয়।'

নাটমন্দির থেকে আসি গর্ভমন্দিরে। এখানে দেখছি তিনটি বিগ্রহ। মাঝে শ্বেত পাথরের তৈরি অম্বিকা। ডানে কষ্টি পাথরের তৈরি কালী অর্থাৎ চিতোরেশ্বরী। আর বামে বজরঙ্গবলী।

মা চিতোরেশ্বরীকে প্রণাম জানিয়ে মন্দিরের বাইরে আসি। বাহন চলতে শুরু করে।

অটো এসে থামল একটি প্রাচীর ঘেরা বাড়ির সামনে। সিংহদুয়ার দিয়ে ঢুকে দেখছি ডান দিকে ধ্বংসাবশেষ।

গাইড বললেন—

এটি রতনসিং-এর প্রাসাদ। আলাউদ্দিন খিলজি পদ্মিনীকে না পেয়ে রতন সিং-এর প্রাসাদটি চুরমার করলেন।

আরো কিছুটা এগিয়ে দেখি দোতলা একটা বাড়ি। গাইড বললেন—'মর্দানা (পুরুষ) প্যালেস।'

'এই বাড়িতে পদ্মিনী বাস করতেন। এই জন্য প্রাসাদকে, পদ্মিনী প্যালেসও বলে। এই বাড়িতে বসেই আলাউদ্দিন পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখেন। ভালবাসার মানুষটি যে বাড়িতে বাস করতেন তা ধ্বংস করতে হয়তো আলাউদ্দিনের মত পাষণ্ডেরও বুক কাঁপছিল। আর এজন্যই বাড়িটি এখনও অক্ষত আছে।'

— ভালবাসা বলছেন কেন?

ভালবাসলে কি মানুষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে! একটা জাতির স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে!

ধর্মান্ধ পররাজ্যগ্রাসী সুলতান বর্বরতার পরিচয়ই রেখেছেন।

— তাইতো সুলতান আজ ইতিহাসের আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত।

উঠে আসি দোতলায়। দেওয়ালে একটা আয়না ঝুলছে। বলা বাহুল্য এটি প্রতীকি আয়না। আলাউদ্দিন যেখানে বসে ছিলেন গাইড সে জায়গাটা দেখিয়ে বলছেন —

'এখানে বসেই আলাউদ্দিন, পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখেন আয়নাতে। আর তখনই মনে শান্তি পাওয়া দূরের কথা তাঁর ভোগ লালসা বহুগুণে বেড়ে যায়।'

হায়! রূপের কাঙ্গাল!

জহর ব্রতের আগুনে

রাত জাগা পাখিরও একটা সান্ত্বনা থাকে
সারা রাত তার পিয়ারীর ঠোঁটে
ঠোঁট লাগিয়ে, পাখার ঝাপটা ঝাপটিতে রাত কাটে
সে রাত জাগে পিয়ারীর সু-কণ্ঠী ডাকে ;
কিন্তু মরুভূমির প্রান্তরে —
ছয় ছয়টি মাস অবিশ্রান্তধারা
আর গ্রীষ্মের পোড়া রোদে
প্রতীক্ষা করেছ তুষের আগুন জ্বেলে অন্তরে
শুধু শুধু প্রতীক্ষা!
কি পেয়েছ!.

ভেবেছ তুলে নেবে মরুভূমির সেরা ফুল
জাননা আহাম্মক !
ফুল দেবসেবায় লাগে
তোমার আশায় মরীচিকা, ভাবনায় ভুল।
দেখনি কামুক পুরুষ
মহাসতী পদ্মিনী
তোমার অশুচি হাতের ছোঁয়ার আগেই
জহরব্রতের আগুনে পুড়ে হল ছাই।

পদ্মিনীর প্রাসাদের দক্ষিণ পাশে একটি জলাশয়। জলাশয়ের লাগোয়া আর একটি প্রাসাদ—জেনানা (মর্দিনি) প্রাসাদ। গাইড বললেন—রাওয়াত রতন সিং-এর অনুরোধে পদ্মিনী জেনানা প্রাসাদের সোপানে দাঁড়িয়েছিলেন।

চেয়ে দেখি দোতলা থেকে অনেকটা নিচে জেনানা প্রাসাদের সোপান। পদ্মিনী প্রাসাদ থেকে ফিরে আসি অটোতে। গাড়ি চলতে শুরু করে। এগিয়ে চলি।

পদ্মিনী প্যালেসের কিছুটা পরে একটি রাস্তা চলে গেছে উত্তর-পূর্ব দিকে। পথ এসে মিশল চিতোরগড়ের পূর্বদিকের রাস্তার সঙ্গে। রাস্তাটি উত্তর - দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ দিকে এ রাস্তা ধরে গেলে পাওয়া যাবে বাদল এবং গোরার বাসগৃহ। আমরা চলেছি উত্তর দিকে।

গড়ের পূর্বদিকে দেখছি চিতোরে প্রবেশের আর একটি তোরণ—সূরযপোল। আমি মন্তব্য করি।

— তাহলে দেখছি দুর্গনগরীতে প্রবেশের একাধিক তোরণ!

— জী হ্যাঁ, পশ্চিমে রামপোল, পুবে সূরয পোল এবং উত্তরে লাখোট বারি।

অটো এসে থামল জৈন মন্দিরের সামনে। পাথুরে পথ ধরে এগিয়ে চলি। এবড়ো খেবড়ো পথ।

সামনে দেখছি একটি স্তম্ভ।

গাইড বললেন — 'ঐ যে উঁচু স্তম্ভটি দেখছেন, ঐটি কীর্তি স্তম্ভ। তার থেকে দূরে ঐ যে মন্দিরটি দেখছেন ওটি জৈন মন্দির।

'ইন্দো সারসেনিক স্থাপত্যকলায় তৈরি এই স্তম্ভটি দ্বাদশ শতাব্দীতে জিজা নামে জনৈক মহাজন নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন দিগম্বর সম্প্রদায়ের লোক।'

আমি বলি—

— দেখুন চিতোরগড়ের একটা অ্যালবাম কিনেছি তাতে কীর্তি স্তম্ভটি দ্বাদশ শতাব্দীর কীর্তি বলেই সমর্থিত কিন্তু চিতোরগড় নামে গাইড বইতে দেখছি চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈরি।

— দেখুন সাল তারিখ নিয়ে অনেকক্ষেত্রেই নানা মুনির নানা মত, তবে বেশির ভাগ

পণ্ডিতদের মত — দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি। আবার মজার কথা দেখুন এই স্তম্ভের কাছে ৮৯৫ সালের একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল।

গাইড যেন দৃঢ়তা হারিয়ে ফেললেন।— আচ্ছা, ৮৯৫-তে কি স্তম্ভের কথা বলা ছিল?

— না, আমার সে রকম কিছু জানা নেই।

তিনি আবার সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন।

'শুনুন, সাততলা এই স্তম্ভটি চিতোরের প্রাচীনতম স্মারক, স্তম্ভটি ২৪তম জৈন তীর্থঙ্করের প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। স্তম্ভটি ৭৫ফুট উঁচু। নিচের অংশে ৩০ফুট পরিধি আর উপরে ১৫ফুট।'

পথ ক্রমশ একটা উঁচু ঢিবির সঙ্গে এসে মিশেছে। ঐ ঢিবির উপরেই স্তম্ভটি নির্মিত। কাছে এসে দেখি স্তম্ভের চারদিকে নগ্নমূর্তি। মূর্তিগুলো বেশ বড়। এছাড়া স্তম্ভের গায়ে ছোট মূর্তিও রয়েছে। গাইড বললেন ' বড় মূর্তিগুলো পাঁচফুট লম্বা, চার দিকে চারটি মূর্তি ভগবান আদিত্যনাথের। আর ছোটগুলো অন্য তীর্থঙ্করদের।'

ভিতরে দেখছি উপরে ওঠার সিঁড়ি আছে।

— কতগুলো সিঁড়ি মশাই?

— ৫৪টি,

— স্তম্ভটি এর আগে সংস্কার হয়েছে কি?

— হ্যাঁ, প্রথম সংস্কার করেন মহারাণা ফতে সিং। এরপর ইংরেজ আমলে আর একবার।

কীর্তি স্তম্ভ দেখে আসি মহাবীর স্বামী মন্দিরে।

মহাবীর স্বামী মন্দির

মন্দিরটি ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কব মহাবীরের নামে উৎসর্গীকৃত। এই মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। মন্দিরটি মহারাণা কুম্ভের সময়ে অসওয়াল গণরাই মহাজন প্রথম সংস্কার করেন। স্বাধীনতার পর আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয়বার সংস্কার করা হয়।

দেখছি মন্দির গাত্রে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি এবং ফুল খোদাই করা। গাইডকে জিজ্ঞেস করি —জৈনমন্দিরে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি কেন বলতে পারেন?

'মনে হচ্ছে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জৈন ধর্মের আদর্শগত কোন বিরোধ ছিল না। সৌম্য ও শান্তির বাতাবরণ রক্ষার্থে দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে কোন ভগ্ন হিন্দু মন্দিরের খোদাই করা পাথর এই মন্দিরে লাগানো হয়েছে।'

ওনার যুক্তি কতখানি অর্থবহ তা বোঝার জন্য গাইড আমার দিকে তাকান। আমি বলি —'সবই তো অনুমানের কথা। তবু আমার মনে হয় হিন্দু ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে কোন অবস্থাতেই হিন্দুর দেব-দেবী খোদিত পাথর জৈন মন্দিরে লাগান যেত না।'

আমরা উঠে আসি অটোতে। অটো ফিরে চলেছে রামপোলের দিকে। আমরা এসে পড়েছি আর একটা জৈন মন্দিরের সামনে।

সাত - বিশ - দেবরা

সাত - বিশ মানে সাতাশ। একই মন্দির এলাকার মধ্যে সাতাশটি মন্দির স্থাপত্যকলায় সুসমৃদ্ধ। এই জৈন মন্দিরটি স্থাপত্যকলার এক অনন্য নিদর্শন। এটি মাউন্ট আবু এবং রণকপুরের জৈনমন্দিরের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনীয়। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে।

উঠে আসি নাট মন্দিরে। দেখছি স্থাপত্যকলার এক অনবদ্য সৃষ্টি। এমন সুন্দর সৃষ্টি আজ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। নাট মন্দির থেকে আসি গর্ভমন্দিরে। গর্ভমন্দিরে মার্বেল পাথরের আসনে উপবিষ্ট আছেন আদিনাথজী। আদিনাথজীর ডানদিকে সুমতিনাথজী এবং বামদিকে উপবিষ্ট আছেন সীতানাথজী।

সারা মন্দির গাত্রে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নর্তকী খোদিত। মন্দির এলাকার মধ্যে রয়েছে ছোট বড় সাতাশটি মন্দির চূড়া। প্রতি মন্দিরে জৈন মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

সাত - বিশ দেবরা দেখে ফিরে এলাম অটোতে। অটো এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। গাইডকে জিজ্ঞেস করি—

— আচ্ছা, উত্তর দিকে আর দেখার মত কিছু আছে কি ?

— আছে তবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

— তবু তাদের সম্বন্ধে একটু বলুন শুনি।

'পাতালেশ্বর মন্দির, বিড়লা সরাই, চরভূজা বনমাতা, অন্নপূর্ণা এবং কুকরেশ্বর মহাদেব মন্দির।'

বিষ্ণু মন্দির

মন্দিরের চার দিকে প্রাচীর। পাথরের তৈরি তোরণ। তোরণ দিয়ে ঢুকতেই দেখি বাঁধানো মন্দির চত্বর। নজর যায় মন্দিরের চূড়ার দিকে।

অপূর্ব। ছাদ একটু একটু করে উঁচু হয়ে মন্দিরের চূড়ার সঙ্গে মিশেছে। আকারটা ঠিক পিরামিডের ন্যায়। ইন্দো - আর্য স্থাপত্য কলার জ্ঞান এবং গরিমায় কত উন্নত ছিল। মন্দিরের চূড়োটা নিরেট এবং গোটা পাথরে তৈরি।

প্রযুক্তি বিদ্যার কলাকৌশল ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রখ্যাত পর্যটক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক জে ফার্গুসন বলেছেন —"এই মন্দিরটি রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন মন্দির।"

দ্বাদশ শতাব্দীর এই পুরাকীর্তিটি আলাউদ্দিনের রোষানল থেকে রেহাই পায়নি। তিনি মন্দিরের অনেক ক্ষতি করেছেন। পরবর্ত্তীকালে সংগ্রাম সিং মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। আলাউদ্দিন আদিবিগ্রহটিও বিনষ্ট করেন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণপ্রাণা মীরার অনুরোধে সংগ্রাম সিং বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণু মূর্তির পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি নাটমন্দিরে। নাটমন্দিরের তিন দিক খোলা। ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো গোল এবং চৌকো স্তম্ভের উপর। প্রতিটি স্তম্ভ খোদাই করা।

নাটমন্দির থেকে আসি গর্ভমন্দিরে। গর্ভমন্দিরের চারদিকে ঘেরা বারান্দা। গর্ভ মন্দিরের বাইরের এবং ঘেরা প্রচীরের ভিতরের দেওয়ালে খোদাই করে প্রাচীন জীবন যাত্রার কথা তুলে ধরা হয়েছে। গর্ভমন্দিরে শোভা পাচ্ছে রাধা-কৃষ্ণ এবং বলরামের বিগ্রহ।

বিষ্ণু মন্দির থেকে আসি ভজন গানের জননী মীরাবাঈ-এর মন্দিরে। একই মন্দির চত্বরে দুটি বিখ্যাত মন্দির। মীরাবাঈ-এর মন্দিরটি বিষ্ণু মন্দিরের বাম দিকে।

মীরা মন্দির

মীরা মন্দিরের গঠনও ভারী সুন্দর। মীরা মন্দিরের সামনে আর একটি ছোট মন্দির। এটি মীরাবাঈ-এর গুরুদেব রুইদাস চামারের সমাধি মন্দির। মীরাবাঈ-এর মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। আছে শুধু দুখানি ছবি। বড়টি কৃষ্ণপ্রাণা মীরাবাঈ-এর — হাতে একতারা। যেন প্রভুর নাম গানে বিভোর, খুঁজে পেয়েছেন আরাধ্য দেবকে।

চোখে মুখে তারই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। আর ছোটটি তাঁর প্রাণের ঠাকুর— শ্রীগিরিধারী।

বাজে একতারা

আসে ঘনশ্যাম— মীরার ঠাকুর।
তার উদাস করা আহ্বানে
গৃহবাসী আসে আপন মনে
শ্রদ্ধাবনত এবং চোখে অশ্রুধারা,
ঝঙ্কার বাজে মন - মন্দিরে
ভজনের ধ্যান গম্ভীর সুর
ঐ বুঝি কিঙ্কনী পায়ে
ঐ শোন বাজে এক তারা……

মীরা মন্দির থেকে এলাম বিজয় স্তম্ভের কাছে। এখানে বটের ছায়াশীতল জায়গায় কিছু চায়ের দোকান বসেছে। এছাড়া অন্যান্য খাবারের দোকান। সবই অস্থায়ী। অনেকগুলো গাড়ি, যেমন টাঙ্গা, অটোরিকশা দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। চা জলখাবার খেয়ে চলতে শুরু করি।

বিজয় স্তম্ভ

স্তম্ভের গোড়ায় প্রায় দেড় মানুষ পাথর বাঁধানো উঁচু চাতাল। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা।

এই স্তম্ভটি মহারাণা কুম্ভের অনন্য সৃষ্টি। মহারাণা কুম্ভ ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে (কারুর মতে ১৪৩৭) মালবের সুলতান মহম্মদ খিলজির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মহারাণা, সুলতানকে সারঙ্গপুরের কাছে পরাজিত

করেন এবং বন্দী করেন। এই বিজয়ের স্মারক স্বরূপ তিনি চিতোরে জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

গাইড বলেন

'এই বিজয় স্তম্ভের স্থাপত্যকলার মধ্যে আমরা কুম্ভের কলা-বিদ্যা এবং স্থাপত্য কলার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা লক্ষ্য করি। দেখেছেন প্রতিটি তলার চারদিকে কি সুন্দর কারুকার্য! চারদিকে চারটি ছোট ছোট অলিন্দ। প্রত্যেকটিতে পদ্মফুল এবং অন্যান্য কারুকার্যে শোভিত।'

আমি বলি — 'স্তম্ভের মাঝখানটা দেখছি সরু আর উপর এবং নিচের দিক চওড়া।'

গাইড উত্তর দেন — ঠিকই বলেছেন, এটাই বিজয় স্তম্ভের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মাঝখানটা সরু হওয়াতে ওখানটার সিঁড়ি পথ ঘেরা এবং উপরের মত অত খোলামেলা নয়।

আমরা ভিতরে ঢুকি। ভিতরে অনেকটা খোলা জায়গা। সিঁড়ি পথের চারপাশে এবং দেওয়ালে সুন্দর অলঙ্করণ। এই সব অলঙ্করণে হিন্দুর দেব-দেবী মূর্তি, বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র শোভা পাচ্ছে। এভাবে সমাজ জীবনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। শুধু যে সমাজ জীবনের কথা তাই নয় — ঋতুর প্রভাব সমাজ জীবনে কতখানি তা বোঝাবার জন্য বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পোষাক পরিহিত ও কাজে ব্যস্ত মানুষের ছবি শিল্পীর অনবদ্য খোদাই কর্মের মধ্যে ফুটে উঠেছে। গাইড বলেন —'দেখুন, পুরো তলাটাই কি সুন্দর শিল্পমন্ডিত ! সেকালের এই সব অলঙ্করণ এখনও কত উজ্জ্বল! শিল্পীর স্পর্শে সবই আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। আর দেখুন প্রত্যেকটি তলার নাম এবং অলঙ্করণের বিষয় বস্তুর বিবরণ লেখা থাকার জন্য কত সহজবোধ্য হয়েছে।

'সবচেয়ে মজার কথা কি জানেন, শিল্প নিপুণতা ত্রুটিহীন। কোথাও কোন অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্যতা নেই। মূল কাহিনী এবং ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সব খোদাই করা হয়েছে।'

— আচ্ছা স্তম্ভের নির্মাতার আর কোন গুণের কথা জানা আছে কি?

— হ্যাঁ তিনি পরধর্মের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন।

— সেরকম কোন উদাহরণ আপনার জানা আছে কি?

— কেন নয়? একটু আগেই তো জৈন মন্দির দেখে এলেন। মহারাণা কুম্ভের সময়ে তার সংস্কার হয়। তাছাড়া এই জয়স্তম্ভের তিনতলা এবং আট তলায় 'আল্লাহ' কথাটি আরবী ভাষায় খোদাই করান।

মহারাণা কুম্ভ জ্ঞানী-গুণীর সমাদর করতেন। তিনি কলা ও স্থাপত্যকলার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন। রূপচর্চা করতেন সমানভাবে। তিনি শুধু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি মহাবীরও ছিলেন। তাঁর বহু সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা নিঃসন্দেহে মহত্বের পরিচয় রাখে।

মহারাণা কুম্ভের চরিত্রটি ছিল কঠোর - কোমল, বীরত্বপূর্ণ ও মানবিক। মালবরাজ

খিলজি যখন গুজরাটের সুলতানের সাহায্যে যৌথভাবে চিতোর আক্রমণ করেন তখন মহারাণা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে একলক্ষ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং চোদ্দশ হাতি নিয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করেন—এ যেমন তাঁর চরিত্রের দৃঢ় দিক তেমনি মহম্মদ খিলজিকে বন্দী করে চিতোরে নিয়ে এসে মহম্মদের সঙ্গে বন্দীর মত ব্যবহার না করে তাকে প্রচুর উপহার দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন—এতো তাঁর চরিত্রের কোমলতার পরিচয়।

একটা মানুষ কতখানি উদার হলে এবং চরিত্রে কতখানি দয়ামায়া ও মানবিকবোধ থাকলে শত্রুকে হাতে নাতে পেয়েও মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব! কেউ হয়তো বলতে পারেন মহারাণা তুখোড় রাজনীতিবিদ ছিলেন, শত্রুকে বশ করার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এ যুক্তি আংশিক সত্য হতে পারে কিন্তু মহানুভবতা ও মনের কোমলতা ছাড়া তা সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব হত না।

বিজয় স্তম্ভ দেখার পর আমরা চলেছি সমীধেশ্বর মহাদেব মন্দিরে। সমীধেশ্বর মহাদেব মন্দিরটি বিজয় স্তম্ভের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

পথে যেতে যেতে গাইড বলেন- এখন মহাসতী। এখানে কর্ণাবতী তাঁর সহচরীদের নিয়ে জহরব্রত পালন করেন।

মহাসতী ঃ

আলাউদ্দিনের চিতোর অবরোধের ২৩০ বছর পর চিতোর দ্বিতীয় বার অবরুদ্ধ হল। চিতোর রক্ষার আর কোন উপায় নেই দেখে রাজমাতা (সংগ্রাম সিং-এর পত্নী) কর্ণাবতী তের হাজার রাজপুত রমণীকে নিয়ে জহরব্রত পালন করেন।

সে পুণ্য স্থানটি এখন চারদিকে দেওয়াল ঘেরা। এই পুণ্য স্থানের পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়ে দুটি প্রবেশ তোরণ রয়েছে। তোরণ দুটিকে মহাসতী তোরণ বলে। মাটি খননের পরে এ মাঠে জহরব্রতের ছাই পাওয়া গিয়েছিল। চিতোর-বাসীগণ এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাসতীকে স্মরণ করেন।

কথায় কথায় আমরা এসে পড়ি সমীধেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সামনে।

সমীধেশ্বর মহাদেব মন্দির ঃ

এই মন্দিরটি মালব রাজ ভোজ একাদশ শতাব্দীতে তৈরি করেন, পরে ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণা মোকল মন্দিরটির আমূল সংস্কার করেন। এজন্য মন্দিরটি মোকলজি মন্দির নামেও খ্যাত।

মন্দিরের সামনে একটি শিবলিঙ্গ পূজা পাচ্ছেন। মন্দিরের পূজ্যদেবতা ত্রিমূর্তি শিব। এজন্য মন্দিরটির নাম সমীধেশ্বর মহাদেব মন্দির। মন্দির গাত্রের অপরূপ কারুকার্য ভারতীয় স্থাপত্যকলার নিদর্শন।

গাইড বললেন —এখানে দুটি শিলালিপি আছে। একটি ১১৫০ খৃষ্টাব্দের, গুজরাটের

সোলাঙ্কী রাজা কুমার পাল আজমীরের অর্ণোরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার পর চিতোর দর্শনে আসেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে এই শিলালিপি।

অন্যটি ১৪২৮ খৃষ্টাব্দের। মহারাণা মোকল এই মন্দিরটি সংস্কার করেন তখন এই শিলালিপিটি স্থাপন করা হয়।'

সমীধেশ্বর মহাদেব মন্দির দর্শন করে আমরা হেঁটে চলেছি গোমুখ কুণ্ডের দিকে। মহারাণা মোকলের প্রসঙ্গ আসতে অনেক কথা উঠে আসে। রাণা বংশের নিয়মানুসারে মোকলজি সিংহাসনের দাবী করতে পারেন না। অথচ তিনি মহারাণা হলেন। সে কথা জানতে হলে অবশ্যই মহারাণা লাক্ষার কথা স্মরণ করতে হয়।

মহারাণা লাক্ষার রাজত্বকাল ছিল ১৩৮২ থেকে ১৪২১ সাল পর্যন্ত। মহারাণার বয়জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন চুন্দা। একদিন মহারাণা রাজসভায় বসে আছেন। যুবরাজ চুন্দা কোন কাজে রাজপ্রাসাদের বাইরে ছিলেন সে সময় মাণ্ডোরের (Mandor's) রাঠোর রাণমল তাঁর বোন হান্সাবাঈয়ের সঙ্গে যুবরাজের বিবাহের প্রস্তাবস্বরূপ একটি সুদৃশ্য এবং সাজানো নারকেল পাঠালেন মহারাণা লাক্ষার রাজসভায়।

মহারাণা দূর থেকে রাজপ্রতিনিধির হাতে নারকেল দেখে রসিকতা করলেন।

— "কে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসছে এ বৃদ্ধের জন্য"

পরে যুবরাজ যখন এই ঘটনার কথা জানতে পারলেন তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন,

— "রাণমলজির বোন এখন আমার মা।"

শেষ পর্যন্ত মহারাণা লাক্ষার সঙ্গেই হান্সাবাঈ-এর বিয়ের ঠিক হয়। তার আগে রাণমল এর কাছে যুবরাজকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়—"হান্সাবাঈ-এর সন্তানই ভবিষ্যতে মেবারের মহারাণা হবেন।

পিতার সম্মান রক্ষার জন্য চুন্দা রাজসিংহাসন পর্যন্ত ত্যাগ করলেন। চিতোরের ইতিহাসে এ ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে কিন্তু এরকম পিতৃভক্তির নজির সংসারে খুব কম দেখা যায়। এর পর থেকে চুন্দাজী মেবারের বিশ্বমা নামে খ্যাত হন।

শেষ পর্যন্ত এই মহাত্যাগী মেবার থেকে মাণ্ডো (Mando) চলে যেতে বাধ্য হন। হান্সাবাঈ এর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। তার নাম রাখা হয় মোকল। মহারাণা লাক্ষা জীবিত থাকতেই যুবরাজ চুন্দার ত্যাগে খুশি হয়ে যুবরাজকেই মোকলের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এ জন্য তিনি একটি আইন প্রণয়ন করেন —ভবিষ্যতে রাজ্য সম্বন্ধীয় কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ এবং দানপত্রে যুবরাজ চুন্দার সই বলবৎ থাকবে।

মোকলের বয়স যখন বার বছর তখন মহারাণা লাক্ষা দেহত্যাগ করেন। মোকলের মামা এবং হান্সাবাঈ গোপনে পরামর্শ করলেন —"যুবরাজ চুন্দাকে মহারাণা যে ক্ষমতা দিয়ে গেছেন সে সুযোগে চুন্দা হান্সাবাঈ-এর ছেলের রাজত্ব ছিনিয়ে নেবেন।"

যুবরাজ চুন্দা যখন এই গোপন পরামর্শের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি মেবার ছেড়ে স্বেচ্ছায় মান্ডো (Mandoo) চলে যান।

আমরা কথায় কথায় এগিয়ে চলেছি গোমুখ কুণ্ডের দিকে।

গোমুখ কুণ্ড

গোমুখ কুণ্ডটি অনেক নিচুতে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম কুণ্ডের জলে। শীতল স্বচ্ছ জল। আমাদের সামনে উঁচু পাহাড়। ঐ পাহাড় থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে কুণ্ডে। গরুর মুখের মত একটি পাথর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। এজন্যই কুণ্ডটির এমন নাম হয়েছে।

কুণ্ডের উত্তর দিকে দেখছি একটি মন্দির। গাইড বল্লেন — 'ঐটি জৈন মন্দির, তেইশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ঐ মন্দিরের সঙ্গে কুম্ভের প্রাসাদের সংযোগ রয়েছে একটি সুড়ঙ্গ পথের সাহায্যে। এক কালে রাজ মহিষীগণ এই কুণ্ডে আসতেন ঐ সুড়ঙ্গ পথ ধরে।'

— চলুন না, ঐ সুড়ঙ্গ পথটা দেখে আসি।

— না, ঐ সুড়ঙ্গ পথ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

— কেন এমন হয়েছে বলুনতো! এত ট্যুরিস্টদের স্বার্থেই তো এই সব সচল রাখা দরকার।

— দেখলেন তো সচল রাখার নমুনাটা কেমন ? আমাদের সরকার বাহাদুর কত উদাসীন!

— এত উদাসীনতার কোন মানে হয়না। ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে চিতোরগড় কত মুল্যবান! সরকার বিভিন্ন উপায়ে রোজগারও করতে পারেন।

যেমন ঃ—

(১) প্রদর্শনী — প্রত্যেক ট্যুরিস্ট স্পটে গাইড রেখে দিয়ে অতীতের কথাগুলো জানানো যায় এবং কোন্‌খানে কি ঘটেছিল তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করানো যায়।

(২) নাট্যমঞ্চ — চিতোরের প্রত্যেক ঘটনাই এক একটি নাটক, কলাকুশলীদের দিয়ে সে সব ঘটনা মঞ্চস্থ করানো যায়।

(৩) লাইট এ্যান্ড মিউজিক — চিতোরগড় বিদেশী শক্তি দ্বারা বার বার আক্রান্ত এবং লুণ্ঠিত হয়েছিল। সে সব ঘটনাগুলো লাইট এ্যান্ড মিউজিকের সাহায্যে দেখানো যায় রাতের বেলায়।

'এভাবে সরকারের যেমন অর্থ উপার্জন হবে, প্রচুর লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে।'

— বুঝেছি, চিতোরগড় আপনার খুব ভাল লেগেছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

— ধন্যবাদ আপনাকেও, এবার চলুন।

গাড়িতে উঠে আসি। আমরা এখন চলেছি রামপোলের দিকে। আর দক্ষিণে যাব না।

কেননা দক্ষিণ দিকের কালীমাতা মন্দির, পদ্মিনী প্যালেস, সুর্যকুণ্ড এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য আগেই দেখে নিয়েছি।

অটো এসে থামল কুম্ভ প্যালেসের সামনে । প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ। এগিয়ে চলি।

মহারাণা কুম্ভের রাজত্বকাল ১৪৩৩ থেকে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। আর মহারাণা সংগ্রাম সিং-এর রাজত্বকাল ১৫০৯ থেকে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মাঝখানের ১৪৬৯ সাল থেকে ১৫০৮ সাল পর্যন্ত এই চল্লিশ বছর চিতোরের সিংহাসনে কে বসেছিলেন সে ব্যাপারে ইতিহাস নীরব।

গাইডকে জিজ্ঞেস করি — কুম্ভের পর চিতোরের মহারাণা কে হন?

— মহারাণা কুম্ভের ছেলে পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করেন।

— কুম্ভের ছেলে পৃথ্বীরাজ এবং দিল্লীর শেষ রাজা পৃথ্বীরাজ তো আলাদা ব্যক্তি, তাই নয় কি?

— হ্যাঁ দুজনেই আলাদা ব্যক্তি। কুম্ভের ছেলে পৃথ্বীরাজ ১৪৬৮ সালের পর চিতোরে রাজত্ব করেন। আর দিল্লীর শেষ রাজা পৃথ্বীরাজ ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের প্রান্তরে ঘূরীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন।

কথায় কথায় এসে পড়েছি প্রাসাদ এলাকার মধ্যে। গাইড বল্লেন — 'প্রাসাদের দুটি তোরণ, বাদি পোল এবং ত্রিপোলি গেট— রাজপুত স্থাপত্যকলার নিদর্শন। যদিও আজ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমরা ভিতরে গিয়ে হাতি শালা, দেওয়ানী আম, জেনানা মহল, সূর্য মন্দির শিব মন্দির এবং পদ্মিনীর জহরব্রতের পুণ্যস্থান দেখি।'

এগিয়ে চলি।

সিঁড়ির সামনে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাইন বোর্ডে দেখছি কুম্ভের রাজত্ব কালে অর্থাৎ ১৪৩৩ থেকে ১৪৬৮ সালের মধ্যে প্রাসাদটি তৈরি হয়েছে।

গাইডকে জিজ্ঞেস করি—

— প্রাসাদটির বয়স কি ৫৬২ বছর?

— না, আরো বেশি। কেননা প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল পদ্মিনীর জহরব্রতের আগে। আপনি জানেন আলাউদ্দিন প্রথমবার চিতোর আক্রমন করেন ১৩০২ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় বার অর্থাৎ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চিতোর জয় করেন। সে সময় পদ্মিনী জহরব্রত পালন করেন এই কুম্ভ প্যালেসের একটি হলঘরে। তাহলে বুঝতে পারছেন এই প্রাসাদটি কুম্ভের জন্মেরও আগে তৈরি হয়েছে।

আমি সাইনবোর্ডের দিকে নির্দেশ করে বলি—

— তাহলে ঐ সাইনবোর্ডের বক্তব্য?

— কুম্ভের রাজত্ব কালে প্রাসাদটির সংস্কার করা হয় আর তখন থেকে কুম্ভ প্রাসাদ নামে পরিচিত।

— আচ্ছা।

গাইড তার নিজস্ব ঢংয়ে আবার বলতে শুরু করেন, শুনুন ---

'এই প্রাসাদ বহু ঘটনার সাক্ষী - বীরত্ব, আত্মত্যাগ, নিষ্ঠুরতা, আর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী শুনতে পাবেন এই প্রাসাদের আনাচেকানাচে। পদ্মিনী এবং রাজপুত বীরাঙ্গনাদের আত্মাহুতি, কুম্ভ এবং সংগ্রামসিং এর বীরত্ব, বনবীরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ধাত্রীপান্নার মর্মস্পর্শী কাহিনীর নায়ক নায়িকাদের অবাধ বিচরণ ছিল প্রাসাদের সর্বত্র। উদয়পুরের নির্মাতা উদয় সিং-এর জন্ম এই প্রাসাদেই।

'খনন কার্যের ফলে এই প্রাসাদের নিচে একটি লুকানো হলঘর পাওয়া গিয়েছিল, অনুমান করা হয় এই হলঘরে পদ্মিনী চিতোরের কুলনারীদের নিয়ে জহরব্রত পালন করেন।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি সে হলঘরের প্রবেশ পথে। গাইড বলেন এই পথ ধরেই সেদিন প্রাতঃস্মরণীয়া বীরাঙ্গনাগণ গিয়েছিলেন জহরব্রত পালন করতে

প্রাসাদের কারুকার্য দেখতে দেখতে চলেছি। জহরব্রতের কথা শুনে মনে পড়ে সে পুণ্য কাহিনী — পৃথ্বীরাজের দুই ছেলে সংগ্রাম সিং আর বনবীর। বনবীর মহারাণা পৃথ্বীরাজের উপপত্নীর ছেলে। সংগ্রাম সিং হন পরবর্তী মহারাণা।

সংগ্রাম সিং-এর চার ছেলে। বড় ছেলে কুনওয়ার ভোজ (মীরা বাঈয়ের স্বামী) পিতার মৃত্যুর আগেই নিহত হন। সুতরাং মহারাণা সংগ্রাম সিং-এর মৃত্যুর পর মেজছেলে রত্ন সিং চিতোরের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এক নারী ঘটিত দ্বন্দ্বে নিহত হন। স্বাভাবিক কারণে সামন্তগণ সংগ্রামসিং-এর সেজ ছেলে বিক্রমাদিত্য (বিক্রমসিং) কে চিতোরের সিংহাসনে বসালেন। নারীসঙ্গলিপ্সু বিক্রমাদিত্য মদ আর নারী নিয়ে দিন কাটাতেন। রাজ্যের প্রতি কোন লক্ষ্য ছিল না। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গুজরাটের বাহাদুর শাহ প্রথম ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করেন। তাতেও বিক্রমাদিত্যের চেতনা হল না। ঘোর দুর্দিন নেমে এল চিতোরের বুকে। সুযোগ বুঝে বাহাদুর শাহ পুনরায় ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে চিতোর অবরোধ করেন।

উপায়ন্তর না দেখে রাজমহিষী কর্ণাবতী সংগ্রাম সিং-এর ছোট ছেলে উদয়কে নিরাপদে পাঠিয়ে নিজে তের হাজার রাজপুত রমণীদের নিয়ে জহরব্রত পালন করেন।

এদিকে কর্ণাবতীর চিঠি পেয়ে তাঁর রাখী ভাই দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন চিতোরে না এসে সরাসরি গুজরাট আক্রমণ করলেন। ফলকথা চিতোর শত্রুমুক্ত হল। কেননা বাহাদুর শাহ ছুটলেন নিজ রাজ্য রক্ষা করতে। কিন্তু তা সম্ভব হল না। বাহাদুর শাহ যুদ্ধে নিহত হলেন।

হুমায়ুন গুজরাট এবং চিতোরের শাসন ভার বিক্রমাদিত্যের হাতে তুলে দিয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন। বিক্রমাদিত্যের স্বভাব কিন্তু বদলাল না। তিনি সামন্তদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। সামন্তগণ বাধ্য হয়ে বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনচ্যুত করলেন এবং বনবীরকে

উদয়ের হয়ে রাজ্য পরিচালনার ভার দিলেন। বনবীর প্রথম দিকে যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি লোভাতুর হয়ে উঠলেন। আর তার জন্যই ঘটল এক নিষ্ঠুর হত্যার ঘটনা। রাণা রাজবংশের কালিমালিপ্ত ও নিষ্ঠুর ঘটনার নায়ক বনবীর এবং মহীয়সী ধাত্রী পান্নাদাই এর কর্তব্য নিষ্ঠার কাহিনী রাজস্থানী ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বল উদয় কোথা।
মৃত্যু যাত্রীর তীব্র যন্ত্রণার স্বর
হাওয়ায় ভাসে
আসে! ঐ আসে
ও আসবে নিশ্চিন্ত জেনে শরীর থর থর
তবে কেন ভাবনা ... পান্নাদাই
রাজপ্রাসাদ ছাড়ো, পথে নাও ঠাঁই।
তৎক্ষণে লোভীর কালো হাত
তুলে নেয় মারণাস্ত্র
আদর্শ! বীরধর্ম! নীতিবোধ!
সব স্বার্থের পথে কাঁটা!
ও সব মানুক সত্যাশ্রয়ী রাজপুত
স্বার্থ যখন পরমার্থ
সাময়িক বিবেক পীড়ায় কি এসে যায়!
শুরু হল পাপ পথে হাঁটা।

কে কোন্ কালে সোজা পথে পেয়েছে রাজত্ব!
ধর্মাশ্রয়ী কথা বাতুলের তত্ত্ব ...
চাই সিংহাসন, সুখে নীড় বাঁধার স্বপ্ন
আজকের নয় ... মহারাণা
সংগ্রাম সিং-এর কাল থেকে
সুতরাং আর কালক্ষেপ নয়।

হিংস্র শ্বাপদের মত
ছুরি হাতে আসে আগন্তুক
রাণা রাজবংশের খ্যাতি ও নীতি যত
সবই হল বিসর্জন, এসো সর্বভূক
জ্বালিয়ে দাও নীতি কথা ...
পূর্ব পুরুষের বুকে যতই বাজুক ব্যথা।

দয়া নয়, মায়া নয়
এখন অসিহাতে বনবীর—
মানুষ যখন স্বার্থোন্মাদ হয়
তবু যেন ভিতর থেকে কেউ বলে,
ভাব একটু, সবুর কর ……
ভাবনার হাতছানি! বিবেক! বাপ্পাদিত্য!
বিদায় হও, তুমি অতীত
কার মুখ উঁকি দেয়? মহারাণা পৃথ্বীরাজ!
বিদায় হও, এ তোমারই পাপ,
বিমাতার সন্তান তোমারই কারণে।

পায়ের তলায় যেন মাটি খুঁজে পায়
বনবীর অন্ধকারেও যুক্তি হাতড়ায়
এ ক্ষণিকের দুর্বলতা ……
অসি নেমে আসে, হায় বিধাতা!
বনবীর রক্তাক্ত অসি হাতে দাঁড়িয়ে যেথা
সেখানে দুঃস্বপ্ন আর বাধা দেয় না
প্রহরী আসে না কাছে, হুঙ্কার ছাড়ে ……
বল পান্নাদাই—বল উদয় কোথায়?

চিন্তা সূত্র কেটে যায়। গাইড বললেন — চলুন জেনানা মহল, সূর্য মন্দির এবং শিব মন্দির দেখি। হ্যাঁ, এসব দেখে এলাম হাতিশালায়। অতীতকালে রাজাদের কৌলিন্য পরিমাপের সহজ উপায় বোধ হয় — হাতিশালা এবং আস্তাবলের পরিমাপ!

বিশাল হাতিশালা এবং সারি দিয়ে হাতি বাঁধার ব্যবস্থা। একই রকম বিশাল আয়োজন আস্তাবলের ক্ষেত্রেও। কালের গর্ভে এখনও সব হারিয়ে যায়নি। ওখান থেকে ফিরে আসি দেওয়ানী আম-এ। দেখে শুনে মনে হয় একটা স্বপ্নপুরী, সোনার কাঠির ছোঁয়া পেলে সব আগের মত প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। বুকটা টন টন করে ওঠে। এত সুন্দর ব্যবস্থা, এত অবহেলিত!

ফিরে চলি। মনে মনে প্রণাম জানাই তীর্থ ভূমি চিতোরকে।

দুপুর একটার মধ্যে ফিরে আসি হোটেল সানভারিয়ায়। চিতোরগড় এর দ্রষ্টব্যগুলো দেখতে তিন থেকে চারঘণ্টা সময় যথেষ্ট। আমি ঠিক সময়ে চিতোর এসেছিলাম। আগে জানা ছিলনা। না হলে ধর্মশালার জিম্মায় সঙ্গের মালগুলো রেখে চিতোর দর্শন করে একই দিনে বুঁদি কিংবা কোটা চলে যেতে পারতাম।

এখন যেতে পারি কিন্তু যাব না। এখন গেলে একদিনের জন্য দুবার হোটেল ভাড়া দিতে হয়। সুতরাং আজ বাকি দিনটা বিশ্রাম করেই কাটাব।

আট

৬ই অক্টোবর।

খুব ভোরে চেক আপ করে বেরিয়ে পড়ি। ইন্টার স্টেট বাস স্ট্যান্ডে এসে জানতে পারি সকাল সাড়ে সাতটায় কোটার এক্সপ্রেস ছাড়ে। ট্রেনে কোটা যাওয়া যায়। চিতোর থেকে বিকেল তিনটায় ট্রেন ছাড়ে। দিনে একটাই ট্রেন।

এখন ভোর পাঁচটা। আড়াই ঘন্টা খামোকা বসে থাকতে হয়। লোকাল বাসের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম সকাল ছটায় বিজোলিয়ার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ে। বিজোলিয়া থেকে বুঁদি (Bundi) ৫৬ কিলোমিটার। তার পর বুঁদি থেকে কোটা। ভালই হল, যে পথে সচরাচর টুরিস্টরা চলাচল করে না আমি সে পথেই যাব

লোকাল বাসে চেপে বসলাম। সকাল ছটায় বাস ছাড়ল। বাস চিতোরগড়ের পশ্চিম থেকে ঘুরে উত্তর হয়ে উত্তর পূর্ব কোণে এগিয়ে চলেছে। যতই বাস উত্তর পূর্ব কোণে সরে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি চিতোরগড়ের পূর্ব দিক। গড়টি যে মালভূমি তা ভালভাবে বোঝা যাচ্ছে। কেননা গড়ের তিনদিক আমার দেখা হয়ে গেল। সমতল ভূমি থেকে হঠাৎ পাহাড় গজিয়ে উঠেছে। তার উপরিভাগ বিস্তৃত এবং প্রায় সমতল।

চিতোরগড় চোখের আড়াল হতেই চোখ যায় পথের দুদিকে। ছোট ছোট পাথর ছড়িয়ে আছে কাছে এবং দূরে। পথের ডানদিকে দেখছি আরাবল্লী পাহাড় শ্রেণী। সবুজ বনানী। তারই পাদদেশে উঁচু নীচু প্রচুর অনাবাদী জমি। দীর্ঘ প্রান্তর।

এরপর পড়ল একটা গাঁ। গ্রামের বাড়ি ঘর, ফসল এবং ক্ষেত ভরা সবজি। সবই আছে। নেই শুধু পুকুর। সেচের জল পাম্প করে তোলা হচ্ছে পাতাল থেকে। আরো কিছুটা এগোবার পর পড়ল বাসি (Bassi)। ছোট শহর। এই পথের প্রথম জনপদ। নিত্য প্রয়োজনীয় সবই মেলে। এমনকি একটি সিনেমা হলও আছে।

হাঁটা পথ চলে গেছে দূর প্রান্তর ছাড়িয়ে আরো দূরে। দূর সীমানায় গ্রাম এবং জনপদ আছে নিশ্চয়। কেননা সে দিকে চলে গেছে হাঁটা পথ। খোলা মাঠের পর আবার শস্য ক্ষেত বাড়িঘর ক্রমাগত দেখা যাচ্ছে। পথের দুদিকে নুড়ি এবং শ্লেট পাথর ছড়িয়ে আছে। পাথর দিয়ে ক্ষেতের চারদিকে দেওয়াল গড়া হয়েছে। কোন কোন বাড়ির ছাদ শ্লেট পাথরে ছাওয়া।

চিতোরের পর এ পর্যন্ত পথের দুদিকে বাবলা কাঁটা কম বেশি দেখা যাচ্ছে। এই গ্রামে বাবলা কাঁটা ছাড়া পরিচিত এবং অপরিচিত অনেক গাছই দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের আরাবল্লীর পাহাড় শ্রেণী এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

বাসির পর দ্বিতীয় শহর বেগান। বেগানে এসে বাস অনেকক্ষণ থামল। বেগানও বাসির মত আধাশহর। গ্রামের মানুষ কাজে কর্মে শহরে এসেছে। বৃদ্ধদের পরণে দেখছি ধৌচা বা ধুতি। হাঁটুর উপর পরা। গায়ে কুর্তা। মাথায় পাগড়ী। রাজস্থানী ললনাদের পরনে ঘাঘরা এবং ওড়না। ওড়নার এক প্রান্ত কোমরে গুঁজে অন্য প্রান্ত শাড়ির মত পেঁচিয়ে শরীরে ডানদিকে ঝোলানো। মহিলারা ঐ একই শাড়ির ওড়না মাথার উপর টেনে ঘোমটা দেয়।

রাজস্থানী ললনারা অলঙ্কার পরতে খুব ভালবাসে। মাথায় টিকলি হাতে রূপোর মোটা বালা এবং অনেকগুলো চুড়ি। কানে সোনার ঝুমকোর মত অলঙ্কার। পিতলের কলসি কাঁখে মেয়েরা চলেছে জল আনতে দূরের কূয়োতে। এ দৃশ্য প্রায়ই নজরে পড়ছে। যুবকরা সাধারণতঃ প্যান্ট সার্ট পরে নব্যবাবু সাজতে পছন্দ করে।

বেগানের পর আবার দীর্ঘ প্রান্তর। দীর্ঘ উপত্যকা। এই দীর্ঘ অঞ্চলে যথারীতি বাবলা কাঁটা, অজানা গাছ গাছালি এবং জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাথর এবং শিলাস্তর। ডানদিকের আরাবল্লী পাহাড়শ্রেণী যেন আরো কাছে এগিয়ে এসেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত বাস কখনো উত্তর দিক, কখনো উত্তর-পূর্ব কোণে চলেছে। এখন বাস পথ একটু একটু করে পূর্ব দিকে ঘুরছে। গ্রাম লোকালয়ের মধ্যদিয়ে ছুটে চলেছে বাস। ঘন গাছ গাছালি। এবার আমরা উপরের দিকে উঠছি।

দূরের আরাবল্লী পাহাড় শ্রেণী এসব গাছ গাছালির জন্য দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের উপর সমতল পথ। বুঝতে পারছি এতক্ষণ যে আরাবল্লী পাহারশ্রেণী দেখেছি এখন সে পাহাড়ই অতিক্রম করছি। দুদিকে পাহাড়ী গাছ গাছালি।

পাহাড়ী পথের পর বাস আবার একটু একটু করে নিচের দিকে নামতে থাকে। কিছুটা নামার পর চারদিকের ভু-প্রকৃতি দেখা গেল রুক্ষ এবং পাথুরে, উঁচু-নিচু। কোথাও উঁচু ঢিবি। দূরে দূরে উঁচু ঢিবি। মাঝখানে জলাশয়। উঁচু ঢিবির চার দিকে ঢালু হয়ে এক জায়গায় গভীর খাদ বা জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

আরো কিছুটা পথ এগোবার পর দেখছি পাথর কাটার কারখানা। পর পর কয়েকটা কারখানা। রুক্ষ প্রান্তরে ধূলো উড়িয়ে বাস ছুটে চলেছে। ইটভাটার মত ছোট বড় মাঝারি মাপের পাথর পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই সব পাথর চলে যাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

রুক্ষ শুষ্ক প্রান্তরের পর পড়ল তৃতীয় জনপদ — বিজৌলিয়া। সকাল সাড়ে নয়টার সময় বাস এসে দাঁড়াল বিজৌলিয়া বাস স্ট্যান্ডে। বিজৌলিয়া থেকে বুঁদির বাস ধরলাম। দশটার সময় বাস বিজৌলিয়া ছাড়ল।

বিজৌলিয়ার পর পথের দুপাশের দৃশ্য খুব মনোরম। চিতোরের পর থেকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা প্রান্তরগুলো দেখে এসেছি তা সামান্য ঢেউ খেলানো ছিল। কিন্তু এখানে খাঁজ গুলো খুব স্পষ্ট। কোথাও উঁচু পাহাড়ের আকৃতি নিয়েছে। কোথাও নিচু জলাশয়। এরকম একটি জলাশয়ের পাশ দিয়ে বাস এগিয়ে চলেছে।

রাজস্থানে জলাশয়কে তালাত বা সরোবর বলে। এরকম পর পর কয়েকটি সরোবর দেখতে পাচ্ছি। সরোবরগুলো পেরিয়ে আসার পর দেখছি ধূ-ধূ মাঠ। শুধু ফাঁকা প্রান্তর, ছোট ছোট বাবলা কিছু যেন এ ফাঁকা প্রান্তরের বাসিন্দা। যতদূর চোখ যায় উদাস করা মাঠ।

পুবদিকে এই প্রান্তরের শেষ সীমানায় ধূসর রেখা। আরাবল্লীর সবুজ বনানী দেখা যাচ্ছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও জনবসতী নেই। দিনের আলোতেও এই ধূ ধূ ফাঁকা প্রান্তরে যেন অজানা ভয় উঁকি দিচ্ছে— যদি কোন কারণে এখানে অ্যাকসিডেন্ট হয় কি হবে? এক ফোঁটা জল নেই, জনবসতি নেই।

তাছাড়া মনুষ্যহীনতার ভয়। এই এক বাস মানুষের পক্ষে ধূ-ধূ প্রান্তর ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারত। প্রান্তরের নৈশব্দতা, নির্জনতা পথিকের স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করত। কেননা এই উপত্যকা বিখ্যাত চম্বল উপত্যকা।

আকাশ নীলিমায় একটি শকুন কিংবা একটি পাখিও দেখা যাচ্ছে না। শুধু সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরের হাতছানি! --- 'এখানে আকাশ তলে একটু বিশ্রাম নাও, এখানে মাঠের পরে একটু গড়িয়ে নাও।' এই বিশাল প্রন্তরে এক ঝাঁক ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে এটুকুই যা সান্ত্বনা।

একটা উঁচু মাটির ঢিবি একটু একটু করে ঢালু হয়ে অনেক দূর চলে গেছে। যদি একটি বল এই ঢিবি থেকে ছেড়ে দেওযা হয় তাহলে বলটি প্রায় আধকিলোমিটার গড়িয়ে চলে যাবে। বলটি যেখানে গিয়ে থামবে সেখান থেকে মাটি একটু একটু করে উঁচু হতে হতে পাহাড়ীয়াঢালে পরিণত হয়েছে। সামনের ঐ ঢালটি পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই ঢালটি পুব দিকে আরাবল্লীর সঙ্গে মিশেছে।

সামনের ঐ ঢালটির কাছে এসে বাস দাঁড়িয়ে গেল। রেল গাড়ি চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় রেললাইন? ট্রেনটি কাছে আসতে বুঝলাম ঢালের ওপাশ দিয়ে ট্রেনটি চলেছে এজন্য এপাশ থেকে এতক্ষণ দেখা যায়নি।

গেট খোলা হল। বাস এগিয়ে চলেছে। এতক্ষণ রেললাইনের দক্ষিণে ছিলাম। এখন লাইন ক্রশ করে উত্তরে চলে এসেছি। ঢালটির উত্তর দিকের জমি কৃষির উপযোগী। সব রকমের সবজি আনাজ তরকারি এবং ডালের চাষ হয়েছে। এমনকি আখের ক্ষেতও দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ যে অনুর্বর এবং রুক্ষ প্রান্তর দেখে এসেছি এখানকার চিত্র তার বিপরীত। গ্রামের পরে আবার ধূ - ধূ মাঠ। তবে এ মাঠ পথের উত্তর দিকে। আমরা এখন পূর্ব দিকে চলেছি। ধূ - ধূ মাঠের শেষ সীমানায় হঠাৎ একটি পাহাড়ী ঢাল গজিয়ে উঠেছে। যত পূর্ব দিকে যাচ্ছি ঢালটি তত উঁচু হচ্ছে। সামনে ডানদিকেও দেখছি আর একটি ঢাল। দুটি ঢাল যেন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

ঢাল দুটি এখানে পাহাড়ের রূপ নিয়েছে। দুদিকে খাড়াই পাহাড়। মাঝখানের উপত্যকা দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। বামদিকের পাহাড় চূড়ায় দেখতে পাচ্ছি দুর্গ। বুঝতে পাচ্ছি বুঁদি এসে গেছি। বুঁদি বাস স্ট্যান্ডে এসে থামল বাস।

বুঁদি (Bundi)

আরাবল্লী পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায় গড়ে উঠেছে শহর। শহরের চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে সুন্দর তোরণ। প্রাচীরবেষ্টিত শহরের সঙ্গে চারটি তোরণ দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর সরু উপত্যকা। অতীতের খণ্ড মুহূর্ত যেন ছবির মধ্যে ধরা।

১৩৪২ খৃস্টাব্দে রাজপুত প্রধান রাও দেওয়া মীনাদের কাছ থেকে বুঁদি উপত্যকা ছিনিয়ে নেন। চৌহান রাজপুত হারা সিং শহরের গোড়াপত্তন করেন। মীনা সর্দার বুন্দার নাম থেকেই বুন্দি বা বুঁদির উৎপত্তি। শহরের মধ্যমণি একটি লেক।

বুঁদি আজমীরের দক্ষিণ - পূর্ব এবং চিতোরের উত্তর - পূর্ব কোণে অবস্থিত। কোটা থেকে দূরত্ব ৩৬ কিমি। এই শান্ত সুন্দর শহরটি সড়ক পথে আজমীর, চিতোর গড়, জয়পুর, আগ্রা, দিল্লী এবং ভারতের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে যুক্ত। আর ট্রেনে আসতে হলে কোটা। কোটা থেকে বুঁদি।

থাকার ব্যবস্থাও আছে, যেমন—সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো, জৈন লজ। মহাবীর এবং রাণী-কি-ধরমশালা। এছাড়া মনসারাম ধরমশালা।

এবার পথের কথায় আসি। বাস থেকে নেমে দেখি স্কুল ড্রেস পরা বাচ্চারা দলে দলে শহরের দিকে যাচ্ছে। এখন এগারটা বাজে। বাচ্চাদের মিছিল দেখতে নজর যায় পাহাড়ের উপর দুর্গপ্রাসাদের দিকে। সে দিকেই এগিয়ে চলি। সমতল পথ ছেড়ে উপরের দিকে উঠতে থাকি। সরু পাথুরে পথ। দুদিকে সুদৃশ্য দোকান পাট। পথ থেকে অনেকটা উঁচুতে দোকান। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছি উপরের দিকে।

পর পর দুটি তোরণ পেরিয়ে পৌঁছালাম হাতি পোলে। দুদিকে দুটি হাতি। হাতি পোল পেরিয়ে খাড়াই পথে প্রাসাদে উঠতে থাকি। একটুতেই হাঁফিয়ে উঠি। ভাবছি সেকালে রাজা-রানীরা কি করে এই খাড়াই পথে বেয়ে ওঠা নামা করতেন।

বুঁদি রাজপ্রাসাদ

প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দেখি ধাপে ধাপে ঝুলন্ত বারান্দা ঝুলছে। অপরূপ কারুকার্য মহারাজা বলবন্ত সিং প্রাসাদটি তৈরি করেন। রাজপুত স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রাসাদটি কয়েকটি মহলের সমষ্টি। আলাদা আলাদা প্রাসাদ মিলে এই বিরাট সুদৃশ্য প্রাসাদের সৃষ্টি। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অসংগতি নেই। সব ভবনগুলোর মধ্যে একটা ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছে

প্রথমেই পড়ল রতন দরবার। এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে উঠতে থাকি। পথের পাশে একটি সাইন বোর্ড দৃষ্টি আকর্ষণ করল—

This beatiful Edifice also known as UMMED MAHAL, was built by Rao Ummed Singh (A.D 1747 – 73). This walls of chitra sala are illustrated with attractive Paintings Executed during the Reign of UMMED SINGH and BISEN SINGH (A.D 1773 –1821).

সাইন বোর্ডের বক্তব্য অনেক। আমি খানিকটা তুলে ধরলাম।

চিত্রমহল

কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই চিত্রমহলের চাতাল। গেটের সামনেই একটা পাহাড়ী গাছ। মনে হয় অশ্বত্থ গাছ। গাছটির গোড়ায় শান বাঁধানো। চাতালে ফুলের বাগান। বাগিচায় হরেক রকমের ফুল ফুটে আছে।

অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসে ক্লান্তি দূর করি। তারপর ঢুকলাম চিত্রমহলে। চিত্রমহলের কেয়ার-টেকার বললেন—জুতো গ্যালারির বাইরে রেখে ঢুকবেন।

চিত্রমহলটি তৈরি করেছেন রাও রাজা শত্রুশালী। মহলে বুঁদি মুরাল চিত্র শোভিত। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম উপাখ্যানের কাহিনী চিত্রিত। খুব আকর্ষণীয় । গ্যালারির চিত্র কোথাও কোথাও মুছে গেছে। উমেদ সিং এবং বিষেণ সিং এর মানস প্রতিমা আজ ধ্বংসের মুখে।

প্রাসাদের গুপ্ত দরজা, নকল জানালা দেখে অবাক লাগে। একি প্রাসাদ রক্ষার কলাকৌশল না আরো কিছু! দেখে দেখে তাক লেগে যায়। বিভিন্ন মহল ঘুরে দেখলাম। খুব ভাল লাগল অতীতের ঐতিহ্যময় প্রাসাদটি দেখে। এমন সুন্দর গাম্ভীর্য্যময় প্রাসাদ অথচ রক্ষণা বেক্ষণের অভাবে প্রাসাদ আজ ধ্বংসের মুখে। পুরানো কীর্তি রক্ষার প্রতি সরকারের আশ্চর্য উদাসীনতা।

দুর্গ

রাজপুত প্রধান রাও দেওয়া মীনাদের কাছ থেকে বুঁদি উপত্যকা ছিনিয়ে নিয়ে বুঁদি শহর গড়েন, ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে। ঘন জঙ্গলের পরিবেশে গড়ে উঠেছে দুর্গ। বুঁদি দুর্গের পোষাকী নাম তারাগড় দুর্গ।

রাজপ্রাসাদ ছাড়া দুর্গ, চৌরাশি স্তম্ভ, ফুলসাগর এবং জৈৎসাগর হ্রদ বুঁদির বিশেষ আকর্ষণ। চৌরাশি স্তম্ভ ছত্রটি রয়েছে কোটার পথে।

ফুলসাগর মানুষের সৃষ্ট লেক। রাজা ভোজ সিংএর মহীয়ষী এ লেকটি খনন করান। বুঁদির ৮ কিমি উত্তর-পশ্চিমে লেকটি অবস্থিত। মাঝখানে বিংশ শতাব্দীতে তৈরি একটি প্রাসাদ আছে। প্রাসাদে পশুপাখিদের মমি সংরক্ষণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শাসকদের কীর্তি গাথা-শিকারের চিহ্ন স্বরূপ পশুর সিং, চর্ম এবং সম্পূর্ণ শরীর সংরক্ষিত আছে।

২২ কিমি দূরে জৈৎ সাগর হ্রদ। মীনা সর্দার জৈতার হাতে তৈরি হ্রদ। হ্রদের একপাড়ে সুখমহল, অন্য পাড়ে পাহাড়। নির্জন সুশীতল সুন্দর পরিবেশ। সব দ্রষ্টব্যগুলো দেখতে হলে চার থেকে পাঁচঘণ্টা সময় লাগবে। আমার হাতে সে সময় নেই। সুতরাং আমি ফিরে চলেছি। যাব কোটায়। বুঁদি সম্বন্ধে শেষ কথাটি বলে নিই। এখানে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থাতো নেই এমনকি নিজে ঘুরে দেখার পক্ষেও যানবাহন সুবিধাজনক নয়।

সোয়া বারটায় বাস স্ট্যান্ডে ফিরে এলাম। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি যে খাওয়ারও সময় পেলাম না। শুকনো খাবার এবং কলা নিয়ে বাসে উঠলাম। সাড়ে বারটায় বাস

ছাড়ল। এক্সপ্রেস বাস। নজর যায় পথের দুদিকের সবুজ মাঠে। সুজলা সুফলা। চম্বল বিধৌত উর্বর জমি। সব রকমের ফসল ফলেছে। আখের চাষ বেশি।

বিজৌলিয়া আর বুঁদির মাঝামাঝি যে মাল গাড়িটি দেখেছি মনে হয় সেটি কোটা হয়ে বুঁদির উত্তর দিকের আর একটি রেল লাইন দিয়ে পশ্চিম দিকে ফিরে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি পূর্ব দিকে। চম্বল নদী পেরিয়ে কোটা বাস স্ট্যান্ড।

কোটা

ঐতিহাসিক শহর কোটা। চম্বল নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের এই ঐতিহাসিক শহরটি চৌহান রাজপুত হারা সিং-এর বংশধরের হাতে গড়া। কেননা কোটার রাজবংশ চৌহান রাজপুতদের অন্যতম শাখা।

হারা বংশধরদের হাতে শহর গড়ার আগে পর্যন্ত এখানে কোটিয়া ভীল নামে একটি সম্প্রদায় বাস করত। সম্ভবতঃ তাদের থেকে কোটা নামের উৎপত্তি। অবশ্য কোটাও রাজস্থানের অন্যান্য শহরের মত সুরক্ষিত। এজন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর এই জায়গাটির নাম রাখেন কোটা। কেননা কোট শব্দের অর্থ সুরক্ষা। দুটো কারণই জায়গার নামের সঙ্গে যুক্ত।

হারা সিং -এর বংশধর জেঠ সিং, মাধো সিং এবং মুকুন্দ সিং রাজবংশ গড়ে তোলাকালীন সময়ে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। যুদ্ধে তাঁরা তিন ভাই নিহত হন।

পরবর্তীকালে ভীরু সিং কোটার সিংহাসনে বসেন। তারও পরে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে জালিম সিং কোটার সিংহাসনে বসেন। তিনি রাজনীতি বুঝতেন। জালিম সিং ইংরেজদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে কর দিতে স্বীকৃত হন। স্বাভাবিক কারণে তাঁর সময়ে রাজত্ব সুরক্ষিত হয়। তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোটার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

এখানকার লেক, বাগিচা, উম্মেদ ভবন, প্রাসাদ, ছত্রী, চম্বল বাঁধ, কোটা বাঁধ বিদ্যুৎ প্রকল্প, দারা অভয়ারণ্য দেখার বিষয়। এশিয়ার সর্ব বৃহৎ সার কারখানার জন্য কোটা নিঃসন্দেহে গর্বিত।

যান বাহন

ট্রেন পথে কোটা বোম্বে, আমেদাবাদ, লখনৌ এবং আগ্রার সঙ্গে যুক্ত। বড় স্টেশান কোটা। বোম্বে , দিল্লী থেকে ট্রেনে কোটা আসতে পারেন। অনেক ট্রেন আসে দিল্লী থেকে — আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, আমেদাবাদ মেল এবং আরাবল্লী এক্সপ্রেস আসছে।

এমনকি রতলম, আগ্রা এবং লক্ষ্ণৌ থেকে ট্রেন আসছে। কোলকাতার যাত্রীগণ ট্রেন বদল করে লক্ষ্ণৌ এবং জয়পুর থেকে আসতে পারেন।

সড়ক পথে তো কথাই নেই। — বুঁদি, আজমীর, জয়পুর, চিতোর গড়, আবু পর্বত, এমনকি যোধপুর ঝালওয়ার থেকেও বাস আসছে কোটায়।

থাকার জায়গা।

অনেক হোটেল আছে যেমন—স্টেশনের কাছে —কমল। সিভিল লাইন্স

গ্রাণ্ড হোটেল, ব্রীজরাজ ভবন। লাতপুরায়—জগদীশ, গুমান পুরীতে—ডিলিট, আনন্দ, মরুদ্বার এবং ভরত। রামপুরে—আগরওয়াল। নয়াপাড়ায়—মহেশ্বরী। শপিং সেণ্টারে—গায়ত্রী, ময়ূর এবং পাঞ্জাব হোটেল। বাস স্ট্যাণ্ডে—সম্রাট।

এছাড়া ট্যুরিস্ট বাংলো, R.T.D.C- র ডর্মিটরি এবং হিন্দু ও জৈন ধর্মশালা।

এবার পথের কথায় আসি।

কোটা বাস স্ট্যাণ্ডের বাইরে এসে একটা রিকশা ঠিক করি। কোটা দুর্গ প্রাসাদের সামনে আসতেই বুঝলাম বুঁদির রাজপ্রাসাদের থেকে এই প্রাসাদের অবস্থা অনেক ভাল। রিকশা ছেড়ে দিই।

কোটা দুর্গ প্রাসাদ. (Garh Palace of, Kota)

চম্বল নদীর তীরে গড়ে উঠেছে দুর্গ। দুর্গটি তৈরি করেন মাধো সিং। দুর্গ প্রাসাদের মধ্যে মাধো সিং এর নামে একটি মিউজিয়াম আছে।

মাধো সিং মিউজিয়াম

আজ শুক্রবার। মিউজিয়ামটি বন্ধ। মাধো সিং মিউজিয়াম শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন ১১টা থেকে বিকেল ৫টো পর্যন্ত খোলা থাকে। মিউজিয়ামে দুস্প্রাপ্য ফ্রেস্কো ছবি এবং পুরানো দিনের যুদ্ধের অস্ত্র সম্ভার সংরক্ষিত আছে। আর আছে কোটার ভাস্কর্য। পুরনো রাজপ্রাসাদে রয়েছে মিউজিয়ামটি।

গড় প্রাসাদটি ছত্রামহল, বাদল মহল, অর্জুন মহল, নঙ্গর - খানা - কা মহল এবং হাওয়া মহল। এই বিভিন্ন মহলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

মিউজিয়াম দেখা যখন হল না বাইরের দিকটাই ঘুরে ফিরে দেখে নিলাম। প্রাসাদের সামনের লনে কয়েকটি কামান বসানো আছে। ভিতরের রাস্তা ধরে প্রাসাদের বাইরের কারুকার্য এবং ঝুল বারান্দা দেখতে দেখতে প্রাসাদের পিছনে চম্বল নদীর ধার পর্যন্ত ঘুরে আসি। অনেকটা জায়গা নিয়ে প্রাসাদ। রক্ষীরা জায়গায় জায়গায় পাহারা দিচ্ছে। বুঝতে পারছি কোটা রাজপ্রাসাদের কৌলিণ্যতা এখনও অটুট আছে।

ফিরে আসি রাজপথে। এখান থেকে একটা রিকশা ধরে চলে আসি গার্ডেনে।

চম্বল গার্ডেন

চম্বল নদীর তীরে গড়ে তোলা হয়েছে বাগিচা। অমর নিবাসের এই বাগিচাটি পিকনিকএর পক্ষেও উত্তম জায়গা। বাগিচায় সাজানো হরেক রকম গাছ গাছালির সঙ্গে সাজানো বাহারি ফুল। কৃত্রিম জলাধারে কুমির এবং কচ্ছপ।

বাচ্চাদের খেলাঘর — হাতি, ঘোড়া, সিংহের উপর চড়ে বাচ্চারা খুব মজা পায়। এও এক বাড়তি আকর্ষণ। ছায়াশীতল বাগিচায় শহরের মানুষজন আসেন বিশ্রাম নিতে। আর বাচ্চারা মজাদার খেলনায় চড়ে আনন্দ উপভোগ করে। এরই ফাঁকে কিশোর-কিশোরী মনে দোলা দেয় আগামী দিনের রঙ্গিন স্বপ্ন। হয়তো প্রেমিক প্রেমিকার

ছাড়পত্র এখানেই মেলে। তাইতো তারুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রগলভ লক্ষ্য করছি বাগিচার আনাচে কানাচে।

বাগিচার সঙ্গে বোটিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। চম্বল নদীতে বোটিং করতে দুটাকার টিকিট লাগে। চম্বল নদীর পশ্চিম তীরে বসেছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা Thermal Plant.

সুন্দর জায়গা। বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলাম এখানে। চম্বল গার্ডেনের বাইরে এসে একটা অটো ধরি। কোটা বাঁধ দেখতে যাব। আধুনিক কোটা শহরের লক্ষ্মী এই কোটা বাঁধ। কোটা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হয়েছে কোটা বাঁধের জন্য। বাঁধটি রয়েছে শহরের উত্তর দিকে। আর চম্বল গার্ডেন শহরের দক্ষিণ দিকে। আমি দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাব। শহরের উপর দিয়ে যেতে হবে। এখন সাড়ে তিনটা বাজে।

শহরের বাইরে দশেরা উৎসবের মেলা বসেছে। মেলার পাশ দিয়ে যেতে হবে শহরে। ঘোড়ার গাড়ি, অটো রিকশা, রিকশা, অটো ভ্যান, বাস, ট্যাক্সি বিভিন্ন রকম যানবাহন দেখছি পথে। মেলার লোক সমাগমের জন্য অটো রিকশার গতি হয়েছে মন্থর।

কোটা শহর আয়তনে খুব একটা ছোট নয়। আধুনিক চাকচিক্য, অট্টালিকা আর জলাশয়ের মিলিত সৌন্দর্যে কোটা অপরূপা হয়ে উঠেছে। মূল শহর পার হতে অনেক সময় লাগল। চারটার সময় পৌঁছাই বাঁধে।

কোটা বাঁধ (Kota Barrage)

বাঁধটি শহর থেকে এক কিমি দূরে অবস্থিত। ১২৫ ফুট উঁচু বাঁধ। বাঁধ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে জলাধার। বাঁধের উপর আঠার ফুট চওড়া ব্রীজ।

এই জলাধার থেকে খালের সাহায্যে জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চাষ এবং আবাদের জন্য। ১৪ লক্ষ একর জমি এর ফলে উপকৃত হচ্ছে। এই সেচপ্রকল্প শুধু চাষের উপকারে নয়, এর সহায্যে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। গ্রামে গঞ্জে শহরে কারখানায় এই বিদ্যুৎ কাজে লাগছে। উৎপাদন বাড়ছে। আলোর রোশনাইতে শহর গ্রাম ভরে উঠেছে।

কোটা বাঁধের সহযোগী আরো দুটি বাঁধ রাণা প্রতাপ সাগর বাঁধ এবং জহর সাগর বাঁধ শহর থেকে আরো অনেক দূরে অবস্থিত। চম্বল ভ্যালি ডেভেলপমেণ্ট প্রোজেক্টের অধীনস্থ বাঁধ তিনটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে মোট ৩৮ মিলিয়ন টাকা।

যাই হোক কোটা বাঁধ দেখে ফিরে এলাম শহরে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আলোর রোশনাইতে শহর উজ্জ্বল। কিছু কেনাকাটা সেরে ফিরে এলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। সুন্দর জায়গা কোটা। অথচ সময়াভাবে বুড়ি ছোঁয়ার মত ঘুরে এলাম। ফলে অনেক কিছুই অদেখা রয়ে গেল। যেমন—

গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামে রয়েছে পুরানো মুদ্রার গ্যালারি। যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় অতীতকে। ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এই মিউজিয়াম খুব আকর্ষণীয়। এছাড়া পুরানো পাণ্ডুলিপি সম্ভার এবং ভাস্কর্য দেখার মত।

সরস্বতী ভাণ্ডার

এটি একটি লাইব্রেরী। এখানে শতাধিক পুরানো পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ রয়েছে। ঐতিহাসিকদের গবেষণার ক্ষেত্রে এই লাইব্রেরী খুব সহায়ক।

দারা অভয়ারণ্য

বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের মুকুন্দ রেঞ্জ এই অভয়ারণ্যের অন্তর্গত। দারা অভয়ারণ্যে প্যান্থার, সম্বর, নীলগাই, ভালুক এবং বাঘ দেখা যায়। কোটার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ঘন জঙ্গল পরিবেশে এই অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে ১৯৫৫ সালে। কোটা থেকে দূরত্ব ৭৮ কিমি।

বারৌলি

প্রতাপ সাগরের দিকে যেতে পড়ে বিখ্যাত বারৌলি। নবম শতাব্দীতে সাতটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে বারৌলিতে। রাজস্থানের প্রাচীন মন্দির। মন্দিরগুলো পঞ্চায়তাকারে গড়ে উঠেছে। ১৬ফুট উঁচু স্তম্ভের অপরূপ কারুকার্যে গড়ে উঠেছে শিব মন্দির।

যা হোক কোটা এবং বুঁদির সব দ্রষ্টব্যগুলো দেখতে হলে দুটো দিন হাতে সময় নিয়ে আসা উচিত এবং কোটাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আমার আজকের মত ভ্রমণ শেষ। এখন বাসের অপেক্ষায় বসে আছি। কোটা-আবুপর্বত এক্সপ্রেস বাসটি রাত সাড়ে সাতটায় ছাড়ল। ফিরে চলেছি। প্রায় চল্লিশ মিনিট পথ চলার পর পথের অনতিদূরে রাণা প্রতাপ বাঁধ এবং জহর বাঁধের আলোকমালা দেখা গেল। রাত নয়টার সময় চাঁদের আলো ফুটে উঠল। চাঁদের আলোয় চম্বল উপত্যকার প্রান্তর গুলোকে পরীর রাজ্য বলে মনে হল। সেখানে শুধু আনন্দ আর খুশির আমেজ— এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সন্ধান দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বনভূমি সৌন্দর্যময় এবং রোমাঞ্চকর হয়ে দেখা দিল। বুঁদি এবং কোটা দেখার সার্থকতা চম্বল উপত্যকার সৌন্দর্যের মধ্যে নিহিত আছে। জোৎস্না রাতের এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভোলার নয়। রাত বারটায় চিতোরে পৌঁছাই।

নয়

৭ই অক্টোবর। সাড়ে সাতটার মধ্যে চিতোর বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছাই। যথা সময়ে বাস ছাড়ল।

চরাচর ভারি হয়ে আছে কুয়াশায়। সকাল নয়টা পর্যন্ত কুয়াশা। তারপর কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। কুয়াশা কাটার পর দুদিকের ক্ষেত খামার বাড়িঘর স্পষ্ট হয়ে দেখা গেল।

পথের দৃশ্য খুব সুন্দর।

প্রচুর অনাবাদি জমি পড়ে আছে পথের দুদিকে। অনাবাদি জমিতে বাবলা গাছ এবং অন্যান্য ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে।

দূরে আরাবল্লীর পাহাড় শ্রেণী। মাঝখানের উপত্যকা দিয়ে বাস চলেছে। যেখানে মাটি উর্বর সেখানে ফসল ফলেছে ভাল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা চলার পর মাঝে মাঝে দেখছি কলকারখানা। কোন কারখানায় চুনাপাথর থেকে চুন তৈরি হচ্ছে, কোনটায় পাথর কাটা হচ্ছে।

একটা সময় পাহাড়ি পথ ধরে বাস চলতে থাকে। ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোপরি রোমান্টিক টাউন, উদয়পুরের কাছাকাছি এসে গেছি।

উদয়পুর ভারতের গর্ব "স্বপ্নপুরী ও সূর্যোদয়ের শহর" নামে খ্যাত। এই মায়াপুরীকে বলা হয় —"The Venice of the east"

এই আশ্চর্য শহরটির গোড়াপত্তন করেন মহারাণা উদয় সিং ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে। তখনকার সময়ে দিল্লীর মুঘল বাহিনীর উপর্যুপরি চাপ ছিল মেবারের রাজধানী চিতোর গড়ের উপর।

চিতোরের মহারাণা উদয় সিং ভাবলেন -

"এই খোলামেলা পরিবেশে গড়ে উঠা রাজধানীকে অসীম শক্তিধর মুঘলদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেলে কেমন হয়। আরো দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে—যেখানে রাজধানী প্রকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত হবে। শুধু অস্ত্র বল নয়, যোদ্ধাদের বীরত্বও নয়,তার সঙ্গে প্রাকৃতিক সুরক্ষাও দরকার।"

মহারাণার এরকম চিন্তা ভাবনার মধ্যে ১৯শে মার্চ ১৫৫৯ সালে তাঁর পৌত্র অমর সিং -এর জন্ম হয়। রাণা নবজাত পৌত্রের মঙ্গল কামনায় একলিঙ্গজীর মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন — কৈলাস পুরীতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি কিছুকাল সেখানে থেকেও গেলেন।

একদিন রাণা মৃগয়ায় বেরিয়ে একটি সুন্দর জায়গায় এসে পড়লেন। জায়গাটির নাম আহার। আঃ! সুশোভিত মনোরম আহার। এখানে যেমন জলাশয় আছে তেমনি আছে পাহাড়। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তো তুলনা হয় না। পাহাড় ঘেরা এই সুরক্ষিত জায়গায় মেবারের রাজধানী স্থানান্তরিত করলে দারুণ হয়। সেনা ছাউনি হিসাবে জায়গাটির গুরুত্বও অপরিসীম। পাহাড়শীর্ষ থেকে চারদিকে নজর রাখা যাবে।

ডাক পড়ল সেনা প্রধানের। তারও অভিমত —"মহারাজ ভালই হবে। জায়গাটি সত্যিই সুরক্ষিত। এখানকার পাহাড় আর জলাশয়গুলো সুরক্ষার কাজ করবে ভীষণ ভাবে। এখানেই রাজধানী গড়ুন।"

শুরু হল রাজধানী গড়ার কারিগরদের দৌড়ঝাপ। মতি মার্গে তৈরি হল 'মতি মহল'। মতি মহলের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে সেখানে।

আর একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে একটি খরগোসের পিছনে ছুটতে ছুটতে রাণা এসে পড়লেন পিছোলার তীরে। সেখানে এক নির্জন স্থানে এক সাধু ধ্যান করছিলেন। রাণা তার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

সাধু রাণার অভিপ্রায়ের কথা শুনে বললেন —"মহারাজ এখানে তুমি রাজধানী স্থাপন করলে তোমার শত্রুরা কখনোই তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না।"

পিছোলার তীরে বর্তমান রাজপ্রাসাদ সাধুর উপদেশের পর তৈরি হল। চিতোরগড় থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হল উদয়পুরে । ক্রমে শহর বড় হল। উদয় সিং থেকে মেবারের শেষ রাণা ভূপাল সিং পর্যন্ত প্রত্যেকে উদয়পুরের কিছু না কিছু সংযোজন এবং উন্নতি সাধন করেছেন।

উদয়পুর

২৪° ৩৫´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৩° ৪২´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই নগরী আরাবল্লীর গভীর অঞ্চলে নিচু গিরিশিরার ঢালে অবস্থিত। সমুদ্র সমতা থেকে ৫৭৭ মিটার বা ১৮৯৩ ফুট উচ্চতায় সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে।

শহরটি যে গিরিশিরার উপর অবস্থিত সে শিরার শীর্ষদেশে বর্তমান রাজপ্রাসাদ রাজমুকুটের মত উদয়পুর শহরের শোভা বর্ধন করছে। শান্ত সমাহিত পিছোলার পূর্বতীরে রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের উত্তর পশ্চিমে রাজকীয় ভঙ্গিমায় সমাহিত পিছোলা, শহরের মাধুর্যতা বাড়িয়েছে।

কত আদুরে নাম এই শহরের। কেউ বলেন 'লেকের শহর' কেউবা 'রাজস্থানের কাশ্মীর'। আর বিশ্বজোড়া খ্যাতি 'The Venice of the East' বলে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পাহাড়ী সবুজ, বিলাসী বাগিচা, লেক, মুক্তোর মালার মত শহরের সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। পার্ক, জলের ফোয়ারা, নিয়ন লাইটের আলোয় উজ্জ্বল রাজপথ, প্রাসাদ, লন, সবুজ গাছ গাছালি। সব মিলিয়ে এক মায়াপুরী।

উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ রাজস্থানের প্রাসাদগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। মার্বেল পাথরের তৈরি প্রাসাদের স্থাপত্যকলা এবং শিল্পগরিমা যে কোন দর্শককে মোহিত করে। বারবার দেখলেও পুনরায় দেখার আগ্রহ বাড়ে। বারবার দেখলেও দর্শকের কাছে পুরানো হয় না।

এই শহরের প্রতিটি দ্রষ্টব্যই যেন শিল্পীর হাতে গড়া। এর শৈল্পিক আবেদন চিরনতুন। যতবার দেখা যাক না কেন দর্শক ততই মুগ্ধ হবেন। তাইতো অনেক বিদেশী গুণমুগ্ধ পর্যটক বলেছেন — "SEE VENICE AND DIE BUT SEE UDAIPUR AND LIVE TO SEE IT AGAIN AND AGAIN"

আজকাল শহর অনেকটা বেড়েছে। কিন্তু পুরানো উদয়পুর শহরের চারদিকে প্রাচীর ঘেরা ছিল। সে প্রাচীর দৈর্ঘে ৬ মাইল এবং ১১টি তোরণ। সারা শহরে ছিটিয়ে ছিল এই তোরণ গুলো। শহরটি আরাবল্লী পাহাড় ঘেরা সত্ত্বেও নিচু পাহাড়ের ঢালে অবস্থান করার জন্য আবহাওয়া সহনশীল। চমৎকার আবহাওয়ার জন্য প্রায় সারা বছরই লক্ষ লক্ষ ট্যুরিস্ট আসছেন দেশ বিদেশ থেকে।

পথের কথায় আসা যাক।

বাস সহেলীয়োঁ কি বাড়ি ডান দিকে রেখে পঞ্চবটী ছাড়িয়ে পড়ল চেতক

সার্কল-এ। চেতক সার্কল ছাড়িয়ে হাসপাতাল রোড ধরে এগিয়ে চলেছে। তারপর হাতি পোল দিয়ে পুরানো উদয়পুর শহরে ঢুকে পড়লাম।

হাতি পোল শহরের উত্তর দিকের তোরণ। শহরের চারদিকে চারটি প্রবেশ দ্বার। উত্তরে হাতি পোল, পুবে সূরয পোল, পশ্চিমে ব্রহ্ম পোল এবং দক্ষিণে কৃষ্ণ পোল।

বড় বাজারের পর পড়ল বাপু বাজার। তারপর সূরয পোল দিয়ে সোজা পূর্ব দিকে বাস এগোতে থাকে। পৌনে বারটায় এসে পৌঁছালাম বাস স্ট্যাণ্ডে। বাস থেকে নেমে দেখি অটো রিকশা পর পর দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে কিছু না বলে এগিয়ে চলি রাজপথ ধরে। একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম উদয়পোলের পিছনের রাস্তা ধরে এগোলে পর পর দুটি ধর্মশালা মিলবে। বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে, রাজপথের উল্টো দিকে উদয়পোল।

উদয়পোলের সামনে থেকে অটোতে চেপে এলাম লক্ষ্মীবাঈ নেলী ধর্মশালায়। পথে আসতে আসতে দেখলাম প্রচুর হোটেল। উদয়পুরে চেক-আপ টাইম ২৪ ঘন্টা। লক্ষ্মীবাঈ নেলী ধর্মশালা হোটেলের মত সাজানো গোছানো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাত্র ৬০ টাকায় ভাল ঘর পেয়ে গেলাম। জয়পুর হলে এই ডবল বেডরুমের চার্জ পড়ত একশ টাকার উপর।

দুপুর বারটা। এখন আর বের হব না। জামা কাপড় ধুয়ে স্নান করে, খেয়ে বিশ্রাম। এই অবসরে উদয়পুরের কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

যাতায়াতের ব্যবস্থা ঃ

বিমান—দিল্লী, মুম্বাই, যোধপুর, জয়পুর ও ঔরঙ্গাবাদের সঙ্গে উদয়পুরের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।

রেল—দিল্লী, মুম্বাই, আমেদাবাদ, চিতোর এবং জয়পুরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

সড়ক পথ—বাসে জয়পুর, চিতোর, মুম্বাই, দিল্লী, যোধপুর, এবং মাউন্ট আবুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। এছাড়া একলিঙ্গজী, জয়সমন্দ, কাঁকরোলি, নাথদ্বার, রণকপুর, ঋষভদেবজী ইত্যাদির সঙ্গে সড়ক পথে বাস যোগাযোগ আছে।

থাকার জায়গা বিলাস বহুল হোটেল—লেক প্যালেস, শিকড় বাড়ি, লক্ষ্মী বিলাস প্যালেস, রাজস্থান স্টেট, কীর্তি, লেক পিচোলা, রঙ্গনিবাস প্যালেস, ইতাদি হোটেল। এছাড়া হোটেল হিলটপ, ট্যুরিস্ট বাংলো ইত্যাদি।

সাধারণ হোটেল। (বাস স্ট্যান্ড এবং স্টেশনের কাছে)—

সোনিকা, অপ্সরা, মণিকা, সাধনা, নিউ জ্যোতি, ইন্টারন্যাশনাল গার্ডেন, ট্যুরিস্ট পদ্মিনী প্যালেস, সম্রাট, পারেল, জোতি, উদয়পুর, ঋতুরাজ, যাত্রী, স্বপ্না, লেক সিটি, মোহিত ইত্যাদি হোটেল। এছাড়া সরকারি হোটেল—কাজরি (শাস্ত্রী সার্কল-এ)।

সাধারণ হোটেল অন্যত্র।

সুখাড়িয়া সার্কল—শ্রী করনি নিবাস এবং ফাউণ্টেন। টেলিগ্রাফ অফিসের কাছে — দামানিস।

ফতে সাগর রোডে—হোটেল আনন্দ ভবন, টাউন হলের বিপরীত এবং নিউ বাপু বাজারে—পার্ক ভিউ হোটেল, নটরাজ হোটেল, কল্পনা হোটেল এবং গ্রান্ড হোটেল, ট্যুরিস্ট বাংলোর কাছে—অলকা হোটেল, প্রিন্স হোটেল, অশোকা হোটেল।

চেতক সার্কল ও হাতী পোলে—চেতনা হোটেল, সূর্যনিবাস হোটেল, অজন্তা হোটেল এবং লেকভিউ হোটেল। সহেলী-কি-বাড়ির কাছে—চন্দ্রলোক হোটেল, সহেলী-প্যালেস হোটেল, পার্ক হোটেল এবং মীরা হোটেল।

ধর্মশালা

ফতে মেমোরিয়াল, পুরানো রেলওয়ে স্টেশন সরাই, শম্ভুনাথজী সরাই, চম্পালাল ধর্মশালা এবং লক্ষ্মী-বাঈ নেলী ধর্মশালা।

উদয়পুর শহরের বর্তমান আয়তন প্রায় ৩৭ বর্গকিমি। এখানকার আবহাওয়াও খুব চমকপ্রদ। গ্রীষ্মকালে ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে ওঠে না। আর শীতকালে ১১ ডিগ্রির নিচে নামে না। সারা বছরের বৃষ্টিপাত মাত্র ২৪ ইঞ্চি। সুন্দর আবহাওয়ার জন্য সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় হয়। জয়পুর থেকে তুলনায় খাবারও সস্তা।

দুপুরের ঘুমটা ভালই হল।

ঘুম ভাঙ্গে সাড়ে তিনটায়। মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাজপথে। উদয়পুরে রিক্সা নেই। যাতায়াতের জন্য শহরে আছে অটো রিকশা, টাঙ্গা, ট্যাক্সি, জীপ, লোকাল বাস এবং টেম্পো। টেম্পোকে বাসের মত ব্যবহার করছে। উপরে ছাদ এবং ভিতরে বসার ব্যবস্থা আছে। শহরের মেইন রুটগুলো দিয়ে এই টেম্পো বাস আকচার চলাচল করছে।

আমি যাব ট্যুরিস্ট বাংলোয়। একটি টেম্পোর ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে ভদ্রলোক বললেন।—উঠে আসুন এই বাস মেডিকেল হাসপাতাল হয়ে যাবে। ট্যুরিস্ট বাংলো তার কাছে।

ট্যুরিস্ট বাংলো পর্যন্ত অটো রিকশা চাইল দশ টাকা। অথচ মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত বাসে এক টাকা। একটু হেঁটেই ট্যুরিস্ট বাংলো। ট্যুরিস্ট বাংলোর ঠিকানা—

ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান ব্যুরো

(গভর্নমেন্ট অফ রাজস্থান)

কাজরি ট্যুরিস্ট বাংলো

টেলি —২৯৫৩৫

শাস্ত্রি সার্কল। উদয়পুর —৩১৩০০১।

এরা চারটি কনডাকটেড ট্যুর করে।

(ক) সিটি ট্যুর।

(খ) উদয়পুর পার্শ্ববর্তী দ্রষ্টব্য -- হলদি ঘাটি, নাথদ্বার, এবং একলিঙ্গজী।

(গ) রণকপুর ও কুম্বল গড়।

(ঘ) চিতোর গড়।

চিতোর গড় আমার দেখা। রণকপুর ও কুম্বলগড় আপাততঃ বন্ধ আছে। পর্যটক জুটছে না। সুতরাং (ক) ও (খ) দ্রষ্টব্যের টিকিট কেটে ফিরে আসি। আগামী দিন দুটো টুরই সকাল এবং বিকালে দেখব। যে বাসে ফিরে আসছি সেটি যাবে স্টেশন পর্যন্ত। গেলাম শেষ পর্যন্ত।

স্টেশন থেকে ফেরার পথে পুরানো উদয়পুর শহরের প্রাচীর লক্ষ্য করতে করতে আসি উদয়পোলে। উদয়পোল থেকে সোজা পশ্চিম দিকে চলতে থাকি। পায়ে হেঁটে চলেছি। লক্ষ্মী-বাঈ নেলী ধর্মশালার গলি ছাড়িয়ে আরো এগোতে থাকি; সম্রাট হোটেল এবং পদ্মিনী প্যালেস হোটেল আরো অনেক হোটেল দেখছি। প্যালেস রোড ধরে এগোতে পথের পাশে পড়ল গুলাব বাগ।

সজ্জন নিবাস গার্ডেন

গুলাব বাগের পোষাকি নাম সজ্জন নিবাস গার্ডেন। মহারাজা সজ্জন সিং-এর রাজত্বকালে (১৮৭৪ - ১৮৮৪) বাগিচাটি তৈরী হয়। তারই নামে উদ্যানটি খ্যাত। মহারাজা সজ্জন সিং মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসতেন।

২০০ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে এই উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে একটি মিউজিয়াম একটি মিনি চিড়িয়াখানা গড়ে উঠেছে। এছাড়া একটি লাইব্রেরী এবং একটি ট্রয়ট্রেন।

বড় বড় বৃক্ষ ছায়ায় ঘেরা উদ্যান। ফুলের বাগিচাতে বাহারি ফুল। ফুলের প্রদর্শনী হয় প্রতি বছর। শ্রাবণ মাসে মেলা বসে।

উদ্যানের রাস্তাগুলো পরিকল্পিত ভাবে উত্তর - দক্ষিণ এবং পূর্ব - পশ্চিম আড়াআড়ি ভবে লম্বা। বিকেল বেলার রোদে ভীষণ ভাল লাগছে উদ্যানটিকে। বড় বড় গাছ গাছালি। আম, জাম, লিচু এমনকি পেয়ারা বাগানও রয়েছে উদ্যানে। ঘুরে ঘুরে দেখছি।

উদ্যানের মাঝামাঝি লনে জটলা করছে কিছু মানুষ। এগিয়ে চলি সেদিকে। আশ্চর্য! তিনজন নাঙ্গা সাধু। কয়েক জন মহিলা এবং পুরুষ ঘিরে আছে তাদের। সবাই মহারাজদের তোয়াজ করছে। মহারাজগণ খোস মেজাজে ভক্তদের সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছেন।

আমার হাতে ক্যামেরা। সাধুদের কাছাকাছি যেতেই একজন সাধুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়। আমায় দেখে সাধুটি একটি পা মুড়ে ঘুরে বসলেন,তাতে এতক্ষণ যে লজ্জা খোলা মেলা ছিল তা ঢাকা পড়ে। মনে মনে ভাবি তাহলে সাধু সন্ন্যাসীদেরও লজ্জা আছে। অথচ আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হবার আগে পর্যন্ত শিষ্যাদের সামনে পূর্ববৎ অবস্থাতেই ছিল। ভণ্ডামীরও একটা সীমা থাকা চাই। এরকম জনবহুল উদ্যানে কি করে প্রকাশ্যে এসব ভণ্ডামী চলে বুঝতে পারি না। আর যারা তাদের ঘিরে আছে বলিহারি তাদের রুচি !

উদ্যানের দক্ষিণ - পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে কিছু প্রশাসনিক অফিস এবং আবাসন আছে। উদ্যানের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে চিড়িয়াখানা। বাচ্চাদের আনন্দবর্ধক টয় ট্রেন প্রায় এক কিমি দীর্ঘ। চিড়িয়াখানার হরিণ, পাখি, পাতিহাঁস এবং সিংহের গ্যালারীর পাশ দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। বাগিচার মধ্যে রয়েছে একটি পুকুর। পুকুরে পদ্ম ফুটে আছে।

দুঃখের কথা টয়ট্রেনটি এখন চালু আছে বলে মনে হলনা। কেননা দেখলাম না রেলের বগি বা ইঞ্জিন। শুধু লাইন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

গুলাব বাগ দেখা শেষ। মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে আসি। মেইন গেটের সামনে হোটেল গুলাব বাগ। উদ্যানের উত্তর দিকে এই প্রধান ফটক।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাহলেও প্রাকৃতিক আলোতে শহর দৃশ্যমান। তবু নিয়ন লাইটের আলো জ্বলে উঠেছে। দোকান পাট এবং রাস্তা ঝলমল করছে। প্যালেস রোড ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলি। চড়াই পথ। পথের বাম দিকে জাঁকজমকপূর্ণ হোটেল। যেন রাজপ্রাসাদ।

আরো এগিয়ে চলি।

পথের দুদিকে সুদৃশ্য দোকানপাট। মাঝে মাঝে ছোট মন্দির। কত রকমের সওদা। খেলনা এবং খাবারের দোকান। অনেকটা উপরে উঠে এসেছি। পথের দুদিকে ট্যুর কনডাকটের অফিস। উদয়পুরে প্রচুর ট্যুর কনডাকটের অফিস আছে।

পর পর কয়েকটি দোকানে দেখছি পিতলের ঠাকুর এবং বিভিন্ন আসবাব। পাথরের এবং পিতলের তৈরি উপকরণ। দুদিকে অট্টালিকা দোকানপাট। রূপোর গয়না এবং লাক্ষার চুড়ির দোকান।

কিছুক্ষণ থেকে শুনতে পাচ্ছি মাইকে গানের সুর। গানের মাধুর্যে মন ভরে উঠছে, যদিও গানের কথা বা সংলাপ কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু গানের মিষ্টি সুর আমার মনে দোলা দিচ্ছে। গলির শেষে দেখছি বিরাট মন্দির। অনেকটা উঁচুতে মন্দির। এতক্ষণ এই মন্দিরের ভজনে আমার মন ভরে উঠেছিল। এটি জগদীশ মন্দির।

জগদীশ মন্দির

শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মন্দির, উপাস্য দেবতা শ্রী বিষ্ণু। মহারাণা জগৎ সিং এই মন্দিরটি তৈরি করেন ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে। তখনকার দিনে পনের লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এই মন্দির তৈরি করতে। মেবারের রাণা জগৎ সিং ছিলেন দুজন। ইনি প্রথম জগৎ সিং। রাজত্ব কাল ১৬২৮ থেকে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ।

তোরণের দুদিকে দুটি বিরাট শ্বেত পাথরের হস্তি। ৭.৬ মি বা ২৫ ফুট আয়তকার একটি প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে ২৪ মিটার বা ৮০ ফুট উঁচু মন্দিরটি। ৩২ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হল মন্দিরে। সামনে গরুড় মূর্তি। পেতলের তৈরি মূর্তি।

ইন্দো - আর্য স্থাপত্য কলায় তৈরি সুন্দর মন্দির। অন্যান্য মন্দিরের আঙ্গিকে প্রথমে নাট মন্দির বা মণ্ডপ। তারপর গর্ভ মন্দির। সারি সারি সুদৃশ্য স্তম্ভ রয়েছে মণ্ডপে।

বাইরের গঠনও চমৎকার। শিখরটি বক্র হয়ে একটু একটু করে সরু হয়ে চূড়ায় মিশেছে। একেবারে চূড়ায় শিখর কলস। গর্ভমন্দিরের মেঝে এবং দেওয়াল কারুকার্য খচিত। সবই খোদাই করা। মন্দিরের ভিতর এবং বাইরে নিয়ন লাইটের আলো।

মণ্ডপ বা নাট মন্দিরের স্তম্ভগুলো নিচের চার কোণাকার এবং উপরের দিক গোলাকার। স্তম্ভগুলোর গায়ে এবং মন্দির গাত্রে মহারাজাদের বঁধানো ছবি ঝুলছে। গর্ভমন্দিরে কষ্ঠি পাথরের বিষ্ণু বিগ্রহ। বিষ্ণুর ডানে মীরার প্রভু অথাৎ কৃষ্ণভগবানের মূর্তি। ভগবান ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে বাঁশি বাজনায় নিবিষ্ট। বামে নারায়ণী অর্থাৎ মা লক্ষ্মী। সামনের ভক্তদের প্রতি তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি।

মন্দিরের সামনে গরুড় মূর্তি প্রভুর (বিষ্ণুর) স্তব করার ভঙ্গিতে বসে আছে। মন্দিরের চারদিকে প্রাচীর ঘেরা। আয়তাকার ঘেরাওয়ের চারকোণে চারটি ছোট মন্দির। গরুড়ের ডানে—গৌরিশঙ্কর অর্থাৎ মহাদেব। বামে -বিনায়ক মন্দির। বিষ্ণু মন্দিরের পিছনে ডানে—দুর্গা মন্দির এবং বামে সূর্য মন্দির।

এখন সন্ধ্যা। এতক্ষণ ভজন হচ্ছিল। এখন দেব বন্দনা শুরু হয়েছে। খুব ভাল লাগছে। এরপর শুরু হল দেবারতি। দেবারতির পর সমবেত কণ্ঠে ভগবানের জয়ধ্বনি দিলেন। ভক্তগণ দেবারতির অগ্নিশিখায় হাতবুলিয়ে উত্তাপ কপোলে ও মাথায় মুছলেন। আমিও তাই করলাম। ভগবানের অমৃতবারি সেবন করে অন্য ভক্তদের মত মণ্ডপের মেঝেতে বসে পড়লাম।

তারপর ভক্তবৃন্দ নিজেরাই গান জুড়ে দিলেন। আমি আসার পরে গুটি কয়েক ভক্তদের দেখেছি কিন্তু এখন পুরো মণ্ডপ ভর্তি হয়ে গেছে। নারী - পুরুষ সমবেত কণ্ঠে ভগবানের ভক্তিগীতি গাইছে। যদিও গানের মর্মার্থ আমি বুঝতে পারছি না তবু ভগবানের আরাধনা খুব ভাল লাগছে। উপলব্ধি করছি এক আনন্দময় পরিবেশ। বেশির ভাগ ভক্তই গান গাইছেন। এরা সবাই স্থানীয়।

সকল ভক্তবৃন্দ সাবলীল ভঙ্গিতে গান গাইছেন। সবাই যে অভ্যস্ত। কেউ ঢোল, কেউ করতাল, কেউ মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। বাকিরা শুধু হাতে তালি দিয়ে তালে তাল মেলাচ্ছে। সবাই ভগবানের বন্দনায় রত। আমিও হাতে তালি দিচ্ছি। কিন্তু আমার দৃষ্টি মন্দির দেবতা, মন্দির গাত্র, প্রতি ভক্তজনের দিকে।

গান এখনও চলছে। আরো চলবে। আমার সময় নেই। আমি যে ভারত পথিক। পথ চলা আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই আমার কাজ। বিশ্বম্ভর চতুর্ভূজ পদ্মনাভকে প্রণাম জানিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়ি। ফিরে এলাম ধর্মশালায়।

৮ই অক্টোবর।

আজ উদয়পুর দর্শনে বের হব। দুটো ট্যুর একই দিনে । প্রথম ট্যুর সকাল ৮টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত। দ্বিতীয় ট্যুর দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

সকাল সাড়ে সাতটায় এসে পৌঁছাই শাস্ত্রী সার্কল-এ। বাস ছাড়ল সকাল ৮টায়। আমরা যাব মতি মাগড়ি পাহাড়ে। মতি মাগড়ি পাহাড়টি সুনীল জলধি ফতে সাগরের তীরে অবস্থিত। বাস শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে এসে দাঁড়াল মতি মাগড়ি পাহাড়ের পাদদেশে।

ফতেসাগর হ্রদ

ফতেসাগর একটি কৃত্রিম হ্রদ। পিচোলা হ্রদ থেকে খাল কেটে সংযোজন করা হয়েছে ফতে সাগরের সঙ্গে। মহারাণা জয়সিং ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে দুটি পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ দিয়ে এই হ্রদটি তৈরি করেন। পরবর্তী কালে প্রবল বৃষ্টির জলের চাপে বাঁধটি ধ্বংস হয়ে যায়। তার পর মহারাণা ফতে সিং ছয় লাখ টাকা খরচ করে বাঁধটির পুনর্নির্মাণ করেন।

তখন থেকে হ্রদটির নাম হয় ফতে সাগর হ্রদ। আর কৃত্রিম বাঁধটির নাম — কনট বাঁধ। মহারাণা ফতে সিং এর অনুরোধে 'ডিউক অফ কনট' ১৮৮৯ সালে হ্রদটির সংস্কার কার্যে শুভ উদ্বোধন করেন।

হ্রদের তিন দিকে পাহাড়। ধূসর পাহাড়। আর একদিকে তীর ঘেঁসে আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে গাঁয়ের দিকে। মাঝখানের সুনীল স্বচ্ছ জলে বোটিং করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এজন্য ফতে সাগর উদয়পুরের 'মেরিণ ড্রাইভ' নামে খ্যাত।

ফতে সাগর বাঁধটি ২৮০০ ফুট লম্বা আর হ্রদের তলদেশের সবচেয়ে বেশি গভীরতা ৩৫ ফুট। তার কমও আছে। বর্ষাকালে এ হ্রদ যখন অথৈ জলে টৈ টুম্বুর হয়ে যায় তখন আর আনন্দের সীমা থাকেনা। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণার জল এসে পড়ে ফতে সাগরে। আর সেই চমৎকার দৃশ্য দেখার জন্য বর্ষাকালে পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে যায়। মেলার রূপ নেয় ফতে সাগরের বুকে।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম।

বাস ফতে সাগর রোড ধরে এসে ফতে সাগর বাঁধের নিচে একটা সুন্দর বাগিচার পাশ দিয়ে এগোতে থাকে। বাগিচার নাম সাহেলিয়োঁ কা বাড়ি নয়, 'আরো ভ্যালি'। বাগিচার অবস্থান লক্ষ্মী বিলাস এবং আনন্দ ভবনের কাছে। বাস থেকেই দেখে নিলাম এই মনোরম বাগিচা।

তারপর বাস মতি মাগড়ি রোড ধরে এসে থামল মতি মাগড়ি পাহাড়ের পাদদেশে। সে কথা আগেই বলেছি। ঝুলন্ত উদ্যানের মত দেখাচ্ছে মতি মাগড়ির চূড়ার বাগিচাকে।

মতি মাগড়ি পাহাড়

এই সেই মতি মাগড়ি পাহাড়। মহারাণা উদয় সিং, পৌত্র অমর সিং-এর জন্ম তিথি উপলক্ষে সপরিবারে একলিঙ্গজীর মন্দিরে পূজা দিতে এসে এই পাহাড়িয়া পরিবেশের প্রেমে পড়েন।

তিনি এই আরণ্যক পরিবেশ এবং প্রচুর জলাশয় দেখে বুঝলেন এখানে মেবারের রাজধানী স্থাপন করলে ভাল হয়। কেননা আরাবল্লীর গভীরের এই জায়গাটির চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা। সুতরাং প্রতিরক্ষার দিক থেকে উত্তম জায়গা। আর মোগল ছাউনি আজমীর এখান থেকে অনেক দূর। এজন্যই তিনি নগর নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এখানে। এই মোতি মাগড়িতেই তৈরী হয় মোতি মহল। সে প্রাসাদ আজ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে।

মোতি মহল ধ্বংস হলেও তার স্মৃতি কিন্তু মুছে যায়নি। এ যে পূণ্য স্মৃতি। এখান থেকেই যে উদয়পুরবাসীর জয়যাত্রা শুরু। এই মোতি মহলেই জন্মেছেন রাণা বংশের পরবর্তী প্রজন্ম। আর এখানেই বহুদিন কাটিয়েছেন সেই মহাবীর যিনি উদয়পুরবাসীকে শিখিয়েছেন 'স্বাধীন হয়ে বাঁচা গৌরবের'।

তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে জাতির শিরোপা অর্জন করেছেন। তাইতো সেই মহান সংগ্রামী প্রতাপ সিং এর স্মারক গড়ে উঠেছে এই মোতি মাগড়ি পাহাড়ের চূড়ায়।

সিঁড়ি বেয়ে পাহাড় চূড়ায় উঠতেই দেখা গেল সে অমর বীরের মূর্তিটি। সুন্দর ফুলে ভরা একটা বাগিচা। বাগিচার পিছনে আরো উঁচুতে দীপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটি।

আমরা ঘুরে ঘুরে বাগানের দৃশ্য দেখি। ছোট বড় বিভিন্ন গাছে ঘেরা বাগিচায় সবুজের মাঝে রঙ্গীন ফুলের গলাগলি। এক রাশ ফুল ফুটে আছে বাগিচায়। পাথর বাঁধানো পথের ধারে ফোয়ারা। আমাদের গাইড বললেন আপনারা যে যার ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হোন।

ফোয়ারার কল খুলে দিতেই কৃত্রিম ঝরণায় বাগিচাটি অপরূপ হয়ে উঠল। তার সঙ্গে নানা রঙ্গের আলোয় ঝলমল করছে কানন। সন্দর পরিবেশ। আমরা আকৃষ্ট এবং মোহিত হয়ে উঠলাম। এখান থেকে পিছনে ফেলে আসা উদয়পুর শহরকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

বাগিচার পুব পাশে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তার উপরে বসানো হয়েছে একটি টেলিস্কোপ। যন্ত্রটির সাহায্যে আমরা দেখলাম ফতেসাগরের দক্ষিণ - পশ্চিম কোণে ছবির মত একটি দ্বীপ। ঐ দ্বীপে গড়ে উঠেছে উদ্যান। উদ্যানের নাম নেহেরু পার্ক।

নেহেরু পার্ক

১৯৬৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই দ্বীপে উদ্যানটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন রাজস্থানের রাজ্যপাল সর্দার হুকুম সিং। নির্মাণ কাজ শেষ করতে তিনবছর সময় লাগে। খরচ হয় ছয়লাখ টাকা। সাড়ে চার একর জমির উপর গড়ে উঠেছে উদ্যানটি।

উদ্যানটি মহিশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনের আদলে তৈরি। পিরামিড এবং চ্যানেল আকারের অনেকগুলো ফোয়ারা আছে। সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন। পিকনিক করার পক্ষে উত্তম পরিবেশ। গার্ডেনের উত্তর-পশ্চিম কোণে নৌকার আকারে একটি রেস্তোঁরা আছে। পুলের উপর দিয়ে সে রেস্তোঁরায় যেতে হয়। ফতে সাগরের বুকে বোটে ঘোরা আর খিদে পেলে রেস্তোঁরায় খাওয়া দারুন উপভোগ্য।

সবচেয়ে মজার বিষয় রয়েছে একটি 'জেট ফাউন্টেন'। দেড়শ ফুট উঁচুতে জল ছিটায়। এমন আর ভারতের কোথাও নেই। রাতের রঙ্গীন আলোয় এ দৃশ্য খুব আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

মোটর বোটে যাওয়া যায় নেহেরু পার্কে। আমাদের সময় কম। আমরা যাব না নেহেরু পার্কে। এগিয়ে যাই বীর রাজপুত যোদ্ধা প্রতাপ সিংএর স্মারকের দিকে।

প্রতাপ স্মারক

তীর্থ ভূমি মোতি মাগড়ির শীর্ষদেশে গড়ে উঠেছে এই স্মারক। মেবারবাসীগণ তাদের প্রিয় রাণা প্রতাপ সিং-এর স্মরণে স্মৃতি মন্দির গড়ে জ্ঞাপন করেছেন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্ঘ্য। কেননা প্রতাপ যে তাদের গৌরব, জাতির পথ প্রদর্শক।

শ্বেত পাথরের আঙ্গিনা। তার উপর শ্বেতপাথরের বেদি। বেদির উপর অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ভারতের জাগ্রত যৌবনের পথিকৃত প্রতাপের বিশাল ব্রোঞ্জমূর্তি। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন রণে।

যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত রাণা। তাঁর কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম, গায়ে বর্ম আর মাথায় শিরস্ত্রাণ। তাঁর সুশিক্ষিত বাহন চৈতকের চলমান গতি ফুটে উঠেছে। কেননা অশ্বটির একটি পা শূন্যে যেন ঘোড়ার ছুটন্ত মুহূর্তের ছবি। অশ্বটিকেও বিভিন্ন সাজে সাজানো হয়েছে।

নারীলোলুপ শয়তান, আর পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে যে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলতে হয় তা রাজপুতনার মানুষের চেতনায় জাগ্রত করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন যে মহান বীর সৈনিক তাঁর উদ্দেশ্যে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই :

তোমার শূন্য আসন পূর্ণ কর হে বীর
দীক্ষা দাও শৌর্য বীর্য
এবং ত্যাগের মহিমায়
জাত্যাভিমানি ভ্রাতৃঘাতি ভারতবাসীর,
লোভ লালসা দুর্নীতিতে
আচ্ছন্ন জাতি ডুবছে হায়!
তাদের জাগ্রত কর, উদ্বুদ্ধ কর
জাতীয় চেতনায়।

মোতি মাগড়ি পাহাড়ের শোভা রাশি এবং প্রতাপ স্মারক দেখা শেষ। ফিরে এলাম বাসে।

বাস এগিয়ে চলেছে ফতে সাগরের তীর ধরে। ফতে সাগরের উত্তর পাড় থেকে পূর্ব।

তারপর থেকে দক্ষিণ পাড় ধরে এক পাক ঘুরে এগিয়ে চলেছে। আঁকাবাঁকা মসৃণ পথ। পাকা রাস্তার এক পাশে দেওয়াল। তার পরে সবুজ শ্যামল, গাছ - গাছালি, বাড়ি - ঘর - গ্রামের দৃশ্য। কোথাও বা ঘন সবুজ। আর এক পাশে সাদা রেলিং। তার পর ফতে সাগরের নীল জল।

ফতে সাগরের তিন দিকে ধূসর পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় মন সতেজ হয়ে উঠল। লক্ষ্য করি হ্রদের বুকে হাওয়ার বেগ বাড়ছে। ঢেউ ভাঙ্গছে। ভাল লাগছে স্নিগ্ধ সুশীতল হাওয়া।

হাওয়ার মাতন।

আহা! হাওয়ার মাতন
প্রিয় সখী হয়ে
এসেছ মনের দুয়ারে,
বৃক্ষ শাখায় দোলা
দিয়েছ উড়ে বিজয় কেতন।

ছায়া স্নিগ্ধ পথ ধরে বাস এগোচ্ছে। ফতে সাগরের তিন দিক ঘুরে পশ্চিম পাড়ে এসে বাস থামল। উঠে আসি শিল্প গ্রামে।

শিল্প গ্রাম

এটি একটি আদর্শ গ্রাম। এই শিল্প গ্রামের মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় সংস্কৃতি এবং লোককলার সম্প্রসারণ। পশ্চিমাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (West zone cultural centre). এই শিল্প গ্রামের উদ্যোক্তা। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গোয়া এবং রাজস্থান পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলো নিয়ে গড়ে তোলা হয় পশ্চিমাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (WZ CC) । এই কেন্দ্রের বাস্তব কর্ম কেন্দ্র শিল্প গ্রাম।

বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন হাট। প্রতি হাটে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক চর্চা হচ্ছে। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যেকটি হাটে রাজ্য সরকার শিল্পীদের নিয়োগ করেছেন। পর্যটকগণ দর্শন করতে এলে শিল্পীগণ নিজস্ব ঢংয়ে শিল্পকলা দেখান।

একটি হাটে রাজপুত্তুর ঘোড়ায় ছুটে চলেছেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে। অবশেষে যুদ্ধে জয়লাভ। সবই নাচের মধ্যে। কোথাও জুতো তৈরি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে চামড়ার ব্যাগ এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী।

একটি হাটে দেখান হচ্ছে সাপের খেলা। অন্যটিতে রাজস্থানী লোকনৃত্য। রাজস্থানী বাদ্য সঙ্গীত এর প্রয়োগ। এমন অনেক কিছুই আছে।.

মোটের উপর পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে হাটগুলোতে।

এমনকি গ্রামীণ লোকাচার, ঘর - বাড়ি, গ্রামীন শিল্প, গান বাজনা এবং বিভিন্ন উৎসব সম্বন্ধে জানা যায় এই আদর্শ শিল্প গ্রামে।

ঘুরে ঘুরে কলা কুশলীদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলাম। এমনি যদি কোলকাতায় আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় শিল্পগ্রাম গড়ে উঠে খুব ভাল হয়। এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক শিল্পগ্রাম প্রচুর পর্যটক টানতে পারবে। সরকারের আয়ও হবে প্রচুর। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতির প্রচারও হবে। শিল্প গ্রাম থেকে বাস এসে দাঁড়াল সহেলীয়াঁ - কি - বাড়িতে। এই সুন্দর কাননটি শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত।

সহেলীয়া-কি-বাড়ি

সহেলী মানে সখী, সখীদের বাড়ি বা বাগিচা। সুন্দর রমনীয় বাগিচা। এখানে ছোট আকারের একটি প্রাসাদ আছে। প্রাসাদ তৈরি করেন মহারাজা ফতে সিং। তিনি কারুকার্য শোভিত একটি জলাশয়, চিত্র শোভিত চারটি ছত্রী এবং জলের ফোয়ারা তৈরি করে উদ্যানের আরো বেশি রূপদান করেন।

জলের মাঝ খানে বেদীতে বসে মহারাজা সখীদের সাঁতার কাটা দেখতেন কিংবা প্রমোদে মেতে উঠতেন। জলাশয়ের মাঝখানে পাকা লন। চার কোণে চারটি ছত্রী। এই প্রাচীর ঘেরা জলাশয়ে ঢোকার একটি দরজা। তোরণটিও কারুকার্যময়।

কাননে রয়েছে আর একটি জলাশয়। জলাশয়টির নাম পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের চার ধারে চারটি হস্তি। এক একটি অখণ্ড পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে হস্তিগুলো। জলে ভাসছে পদ্ম। ফোয়ারার জল ছিটালে এক অপরূপ দৃশ্য চোখের সামনে ভাসে। মহারাজ ফতে সিং এর প্রমোদ কানন আজ পর্যটকদের আনন্দ বর্ধক কানন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফতে সাগরের পূর্ব পাড়ে লক্ষ্মী বিলাস আর আনন্দ ভবন। তার ডান দিকে অর্থাৎ ফতে সাগরের উত্তর -পূর্ব কোণে এই রমনীয় উদ্যান।

উদ্যানটির প্রাথমিক রূপ পেয়েছিল মহারাজা দ্বিতীয় সংগ্রাম সিং-এর সময়ে। তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট মহারাণাকে কয়েক জন কুমারী পরিচারিকা উপহার দিয়ে ছিলেন। তাদের সম্মানে মহারাণা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্যানটি তৈরি করেন।

আমরা প্রথমে ঢুকি কারুকার্য শোভিত জলাশয়টিতে। বুঝতে পারছি মহারাজের সময়ে আনন্দ ফুর্তির আয়োজনটা ভালই ছিল। জলাশয়ের মাঝখানের বেদী বা বিশ্রামাগারটি যেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। জলাশয়ের চার দিকে ১০ ফুট চওড়া সানে সখীগণ নাচত আর জলে রাজহংসের মত ভাসত। মহারাজ বিশ্রামাগারে বসে বসে এই আনন্দের অংশীদার হতেন। কখনো সখীদের সঙ্গে নিজেও গা ভাসিয়ে দিতেন। ওখান থেকে বাইরের ফোয়ারার দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে যাই পদ্মপুকুর বা লোটাস এর ধারে। যেতে যেতে বাগিচার বিভিন্ন বৃক্ষ এবং সাজানো বাহারি ফুল দেখে মুগ্ধ হই। লোটাসের চারদিকের হাতি সমেত পরিবেশ খুব সুন্দর । জলের ফোয়ারায় এই দৃশ্য আরো বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

ওখান থেকে আসি প্রাসাদে। প্রাসাদের চারদিকে সুন্দর গাছ গাছালি এবং ফুলের বাগিচা। এই বাগিচার নাম রাসলীলা বাগিচা। এই বাগিচা সহেলীয়াঁ - কি - বাড়ির একটি অংশ। সব মিলিয়ে এক নয়নাভিরাম উদ্যান। সহেলীয়াঁ - কি - বাড়ি থেকে এলাম সুখাদিয়া সার্কল-এ।

সুখাদিয়া সার্কল

রেলওয়ে ট্রেনিং স্কুলের সামনে এই সার্কল। এখানে একটি জলাশয় আছে, যার পরিধি ২০০ ফুট। আর জলাশয়ে রয়েছে একটি ফোয়ারা। ফোয়ারটি ৪২ ফুট উঁচু। চারদিকে সবুজ। পার্কের মধ্যে জলাশয়, সবুজ গাছ গাছালি এবং ফুলের বাগিচা। জলাশয়টি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। পার্কের মধ্য দিয়ে চলে গেছে বাস পথ।

বাস এখানে থামেনি। চলতে চলতে দেখে নিলাম সুখাদিয়া সার্কল। বাস এসে থামল ভারতীয় লোককলা মণ্ডলের সামনে। এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটি চেতক সার্কল এবং মেহ্‌তা পার্কের কাছে অবস্থিত।

ভারতীয় লোককলা মণ্ডল

ভারতীয় লোককলার সম্প্রসারণের নিমিত্ত গড়ে তোলা হয়েছে লোককলা মণ্ডল। এই মণ্ডলে পুতুল নাচের ব্যবস্থা আছে। পুতুল নাচের মধ্য দিয়ে নাটক থিয়েটারের অভিনয় হয়। মানুষের কণ্ঠে সংলাপ এবং গান। তারই তালে তালে পুতুলের অভিনয় হয়। মহারাজাদের সময়ে এই হলে সিনেমা হত। চারশ বসার সীট আছে।

বর্তমানে এই হলের উপরের তলাগুলোতে বসেছে মিউজিয়াম। বাদ্যযন্ত্র, পুরানো দিনের পোষাক পরিচ্ছদ, সামরিক অস্ত্র, মুখোশ, পুতুল এবং বিভিন্ন অলঙ্কার প্রদর্শিত হচ্ছে মিউজিয়ামে।

আমরা মিউজিয়াম দেখে নিচেরতলার হল ঘরে এলাম, হল ঘরের নাট্য মঞ্চে দেখান হল কয়েকটি নাটক। গান বাজনা সহযোগে পুতুল নাচের এমন অপূর্ব ব্যবস্থা খুব কম দেখেছি। দৃশ্যটি আমার খুব ভাল লেগেছে।

রাজবাড়ির দৃশ্য।

প্রমোদ কক্ষে জলসার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাত্যগণ নিজ নিজ পদবী অনুসারে রাজার আসে পাশে বসে আছেন। সামনে তবলচি এবং সারেঙ্গী বাজিয়ে। এরা দুজন মানুষ, হঠাৎ আসরে নর্তকীর প্রবেশ এবং রাজাকে সেলাম জানিয়ে নাচের শুরু। নর্তকী --পুতুল।

পুতুলের অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে অদৃশ্য তারের সাহায্যে মানুষ আসর পরিচালনা করছে। গান গাইয়ে, বাজনা বাজাচ্ছে। শুধু পুতুলগুলো আসরে নাটকের বক্তব্য অনুসারে অভিনয় করছে। প্রতিটি অনুভুতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ফুটিয়ে তুলছে।

বাঈজীর নাচ দেখে রাজাতো খুব খুশী। তিনি গলার মতিহার ছুঁড়ে দিলেন নর্তকীকে।

আশ্চর্য! নর্তকী সেই মালা ঠিক ধরে নিল। অভিবাদন জানাল রাজাকে। রাজা যেই উচ্ছ্বসিত হন, আমাত্যগণও রাজার সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন।

মানুষ তবলচির সঙ্গে পুতুল তবলচি তালের লয় অনুসারে বিভোর হয়ে পড়েছে। কখনো বা লাফ মেরে উঠে সঙ্গত করছে। সে এক মজাদার ব্যাপার। মানুষের অভিনয়কে হার মানায়। কুর্নিশ করার ভঙ্গি এবং রাজাকে খুশি করার অন্যান্য আদবকায়দা সত্যি দেখার বিষয়।

দ্বিতীয় অংকে নর্তকী ফুলের মালা হাতে আসরে প্রবেশ করে। রাজাকে ফুলের মালা পরিয়ে নাচের শুরু। কি উদ্দাম নৃত্য!

খুব আনন্দ পাওয়া গেল। ভাবাই যায় না যে এটা পুতুলের অভিনয়। নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি। তারপর কয়েকটি অংশের পর শেষ হল পুতুল নাচের অভিনয়। প্রতিটি দর্শক মুগ্ধ এবং মোহাচ্ছন্ন। এমন নির্মল আনন্দ সচরাচর পাওয়া কঠিন।

ফিরে এলাম বাসে।

বাস এসে দাঁড়াল গুলাব বাগে অর্থাৎ সজ্জন নিবাস গার্ডেনের সামনে। সজ্জন নিবাস গার্ডেন গতকাল আমার দেখা হয়ে গেছে। আজ বাগিচায় সামান্য একটু ঘুরিয়ে ফুলের বাগিচা এবং কিছু গাছ গাছালি দেখিয়ে গাইড সজ্জন নিবাস গার্ডেন দর্শন শেষ করলেন। গাছ গাছালির মধ্যে চন্দন কাঠের গাছ দেখলাম।

বাস এসে দাঁড়াল জগদীশ মন্দিরের সামনে। জগদীশ মন্দিরও গতকাল আমি দেখেছি। সুতরাং আমি এগিয়ে চলি সিটি প্যালেসের দিকে। সিটি প্যালেসের সামনে বিশাল তোরণ! থমকে দাঁড়াই।

আশ্চর্য! আটটি তোরণ একসঙ্গে। ধনুকাকৃতি তোরণ। এর নাম ত্রিপোলিয়া তোরণ। তোরণও যে কত কারুকার্যময় হয় তা দেখার বিষয়। তোরণও যে কত কথা বলে দেয় তার অপূর্ব সৃষ্টির মাধ্যমে! সে যুগে রাজাদের গরীমা এক লহমায় অনুভব করা যায় এই ত্রিপোলি তোরণ দেখে।

১৭২৫ খৃষ্টব্দে এই আশ্চর্য তোরণ তৈরি হয়। শুধু তোরণের গাম্ভীর্য এবং বিশালতা নয় আশ্চর্য হতে হয় মহারাজাদের দানকর্মের মহিমা ভেবে। কেননা সে যুগে রাজ্যে অমঙ্গল দেখা দিলে, খরা এবং দুর্ভিক্ষের সময় এই প্রশস্ত তোরণের সামনে মহারাজাগণ নিজেদের সমপরিমান ওজনের সোনা-রূপা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন।

সিটি প্যালেস

গ্রানাইট এবং মার্বেল পাথরের তৈরি এই প্রাসাদটি রাজস্থানের সবচেয়ে বড় প্রাসাদ। পিচোলার তীরে পাহাড় শীর্ষে এর অবস্থান হওয়ায় এখান থেকে পিচোলা লেক এবং উদয়পুর শহরকে ছবির মত দেখায়।

পিচোলার সমান্তরালে তৈরি এই প্রাসাদটির গোড়াপত্তন করেন উদয়পুরের রূপকার মহারাণা উদয়সিং। মহারাণা উদয় সিং (১৫৩৭-১৫৫২) প্রথম তৈরি করেন 'রাজ অঙ্গণ'। তার পরবর্তী মহারাজাগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহল তৈরি করেন।

বিভিন্ন মহল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈরী হলেও সব মহলের মধ্যে এক আশ্চর্য সুন্দর মিল রয়েছে। মনে হয়, পুরো প্রাসাদটি একই হাতে গড়া। এমনকি সমগ্র প্রাসাদের অলঙ্করণেও মিল আছে। মোজাইকের কাজ, ময়ূর, আর্শীর কাজ এবং অতিসুন্দর চিত্র, প্রাসাদের সর্বত্র।

প্রাসাদটি উত্তর - দক্ষিণে লম্বা ১৫০০ ফুট এবং ৬০০ ফুট চওড়া, কোথাও ৮০০ ফুট চওড়া। রাজস্থানের সর্ববৃহৎ প্রাসাদটি লণ্ডনের উইণ্ডসর প্যালেসের সঙ্গে তুলনীয়। সিটি প্যালেসের দর্শনীয় মহলগুলো— বড়ী মহল (গার্ডেন প্যালেস), দিল খুশ মহল (জোড়ীয়ান প্যালেস), মোতি মহল (মুক্তা মহল), মৌর চক (ময়ূর চক্র) এবং জেনানা মহল।

ত্রিপোলি তোরণ দিয়ে প্রবেশ করি প্রাসাদ এলাকায়। গাইড বললেন আপনারা রিসেপশান কাউন্টারে গিয়ে ক্যামেরা জমা দিন। আর সঙ্গে রাখতে চাইলে ক্যামেরার জন্য আলাদা টিকিট কাটুন।

টিকিট কেটে এসে দাড়াই গাইডের পাশে। সবাই গাইডের সামনে জমায়েত হই। গাইড বলতে শুরু করেন –

"ঐ দেখুন 'রাজ অঙ্গন'। সব চেয়ে পুরানো, প্রাসাদের প্রাচীনতম অংশ। এটি তৈরী করেন মহারাণা উদয় সিং। আমাদের হাতে সময় কম। আমরা এখন দেখব — বড়ী মহল, দিলখুশমহল, মোতিমহল এবং মৌর চক।"

জেনানা মহলটি তৈরি করেন করণ সিং ১৬২০ সালে। পরবর্তী মহারাণাগণ মহলটির সঙ্গে কিছু কিছু সংযোজন করেন। এই মহলটি খুব সুরক্ষিত। অনেকটা দুর্গের মত। এই মহলটি আমাদের দেখা হবে না।

আমরা প্রথমে ঢুকি মিউজিয়ামে।

মিউজিয়াম

কর্তৃপক্ষ ১৯৭৪ সালে মিউজিয়ামের ব্যবস্থা করে জনসাধারণের জন্য খুলে দেন। মিউজিয়ামে প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা, ভাস্কর্য শিল্পের প্রস্তর মূর্তি ও ধাতব মূর্তি রয়েছে। এছাড়া লিপিমালার অসংখ্য নিদর্শন — খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে সপ্তম দশকের দুষ্প্রাপ্য লিপিমালা রয়েছে।

উদয়পুরের বয়ন শিল্পের সুন্দর নিদর্শন রাজপুত লোক শিল্পের পরিচয় বহন করে। এছাড়া দেখার আছে রাজপুত এবং মুঘল চিত্রকলার ঐতিহাসিক নিদর্শন। হস্তীদন্ত, দারু এবং ধাতু শিল্পের মনোগ্রাহী শিল্প সম্ভার। আর আছে মহারাণাদের ছবি। মহারাণাদের

রাজত্বের দিনপঞ্জী অনুযায়ী বিভিন্ন ঘটনার চিত্র, সমরাস্ত্র এবং পোষাক পরিচ্ছদ। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সংরক্ষিত সংগৃহীত আছে জীবজন্তু এবং পাখির দেহাবশেষ।

মিউজিয়াম দেখার পর গাইড বলতে শুরু করেন - 'বড়ী মহলটি তৈরি হয়েছে ১৬৯৮ - ১৭১০ সালের মধ্যে। এই গার্ডেন প্যালেস-এ দুটি জলের ট্যাঙ্ক এবং সাজানো গোছানো বাগিচা দেখার বিষয়। দিলখুশমহল তৈরী হয় ১৬২০ থেকে ১৬২৮ সালের মধ্যে। এখানে দেখতে পাবেন কিছু অমূল্য ফ্রেসকোচিত্র।'

আর মোতি মহল দেখে আপনারা অবাক হবেন। এখানে দেখতে পাবেন রঙ্গীন কাচের শিল্প চাতুর্য। এর পিছনে দেখবেন ছোট চিত্রশালা, বড়ী চিত্রশালা, ভিম বিলাস, মানক মহল এবং শিব বিলাস।

মৌর চকে দেখতে পাবেন পাঁচটি কাচের তৈরি ময়ূর। ময়ূরগুলো যেন জীবন্ত। উদয়পুরের বিস্ময়।'

আমরা প্রথমে ঢুকি দিলখুশ মহলে। ফ্রেসকো চিত্রগুলো সত্যিই দেখার বিষয়। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি! আর মোতি মহলের রঙ্গীন কাচের খেলা দেখতে দেখতে একটা খালি ফোকর ও একটা সাদা কাচের ফোকর দেখিয়ে গাইড জিজ্ঞেস করেন এর কোন্‌টা কেমন দেখলেন? ধন্দে পড়ে যাওয়ার ব্যাপার।

করিডোরগুলোর মধ্য দিয়ে চলার সময় লক্ষ্য করেছি ইতিহাস যেন কথা বলে। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো রংয়ে, রূপে ধরা পড়ে, সাজ-সরঞ্জাম, ছবি ও চিত্রাবলীর মধ্যে।

কাচের গ্যালারীর পিছনে চিত্রশালা, মানিক মহল, ভীম - কৃষ্ণ এবং শিব বিলাসও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এর থেকেও বেশি আকর্ষণীয় মৌর চকের ময়ূরগুলো।

এসব দেখার পর গাইড নিয়ে এলেন প্রাসাদের পশ্চিম দিকে। ফাঁকা চাতাল থেকে দেখা যাচ্ছে পিচোলা হ্রদ। অপূর্ব! নীল জলের ছোট ছোট ঢেউ কি সুন্দর মায়াময় রূপ সৃষ্টি করেছে। দেখা যাচ্ছে জগনিবাস প্রাসাদ।

জগনিবাস প্রাসাদ

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীপ প্রাসাদ। পিচোলার মাঝখানে এই বনময় দ্বীপে গড়ে উঠেছে প্রাসাদ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণা দ্বিতীয় জগৎ সিং এই প্রাসাদটি তৈরি করেন। গ্রানাইট এবং মার্বেল পাথরের তৈরি প্রাসাদ। ১.৬ হেক্টর জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদে অনেকগুলো কক্ষ এবং দরবার গৃহ আছে।

প্রাসাদের লনে ফুলের এবং বাহারি গাছের বাগিচা। বাগিচায় ফোয়ারা। সব মিলিয়ে নয়নাভিরাম দৃশ্য। খুব সুন্দর জায়গা। প্রাসাদে বড়ী মহল, খাস মহল, দিলারাম, সজ্জন *নিবাস এবং চন্দ্র প্রকাশ*—অনেকগুলো মহল আছে।

বর্তমানে প্রাসাদটি লেক - প্যালেস হোটেলে পরিণত হয়েছে। ঘর অনুযায়ী ২৫০০

থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া। এমনকি এক কাপ চা খেতে গেলেও পড়ে ১৫০ টাকা।

প্রাসাদটির দেওয়াল মোজাইক করা। দেওয়াল গাত্রে পুরানো কালের চিত্র অঙ্কিত।

জগমন্দির

এই প্রাসাদটিও পিচোলা লেকে অবস্থিত। পিচোলা লেকের দক্ষিণে অন্য দ্বীপভূমিতে গড়ে উঠেছে। সম্রাট শাহজাহান এই লেকে বাস করেছেন। সম্রাট যৌবনে পিতা জাহাঙ্গীর এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই প্রাসাদে আশ্রয় নেন। তখন মহারাণা হলুদ বেলে পাথর এবং শ্বেত পাথরের বাসগৃহ বানিয়ে দেন। লাল বেলে পাথরের গম্বুজ। মূল প্রাসাদটি তিন তলা।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে মহারাণা প্রথম অমর সিং এই সুন্দর প্রাসাদটি তৈরির কাজ শুরু করেন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে মহারাণা করণ সিং নির্মাণ কাজ শেষ করেন। প্রাসাদটি হ্রদের তীরভূমি থেকে ৮০০ ফুট উপরে অবস্থিত। ওখানে আছে নয়নাভিরাম ফুলের বাগিচা এবং একটি গোটাপাথর থেকে তৈরি সিংহাসন।

এবার আমাদের ফেরার পালা। লেক-এর কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। মায়াময় পিচোলা লেককে ঘিরে একটি করুণ কাহিনী প্রচলিত আছে।

একবার এক সুন্দরী নর্তকী এসে আব্দার করল — 'মহারাজ আমি দড়ির উপর নাচতে নাচতে পিচোলার এপার থেকে ওপারে যেতে পারব।'

— বেশ ভাল কথা। আমায় কি করতে হবে সুন্দরী?

— মহারাজ আমার একটা শর্ত আছে।

— বেশ, খুলে বল কি শর্ত?

— বেশি কিছু নয় মহারাজ, শুধু আপনার রাজত্বের অর্ধেক।

(মহারাজ মনে মনে ভাবলেন, নর্তকীতো আর নাচতে নাচতে পিচোলার এপার ওপার করতে পারবে না! তবে আর রাজী হতে বাধা কোথায়? মাঝখান থেকে একটা মজা উপভোগ করা যাবে)

— বেশ, তাই হবে নর্তকী।

নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যবাসী পিচোলার তীরে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নর্তকীর নাচ শুরু হল। নাচতে নাচতে প্রায় শেষ সীমানায় চলে গেছে। মহারাণারতো মাথায় হাত। মন্ত্রী প্রমাদ গুণলেন। নর্তকীকে রুখতে হবে। হ্যাঁ, রোখা হল। মন্ত্রীর আদেশে অনুচরগণ দড়ি কেটে দিল। সুন্দরী নর্তকী পিচোলার জলে ডুবে মরল। তার সলিল সমাধির স্মরণে গড়ে উঠল সমাধি স্তম্ভ। পিচোলার তীরে গড়ে ওঠা সেই স্মৃতিস্তম্ভ কি আজো বেদনার কাহিনী শোনায়?

এমন উপকথা আরো আছে। পিচোলার জল খেলে নাকি তাকে আবার উদয়পুরে

আসতে হয়। তাকে বলতে হয়—

পিচোলার জল।

পিচোলার জল
ছলাৎ ছল
এমন সুন্দরী পিচোলার তীরে
আসবো ফিরে
নয়নের তেষ্টা মেটাতে
এবং অমৃতের স্বাদ পেতে
শুধু এক ঢোক জল
ক্লান্ত পথিককে জোগায় বল।

কিন্তু আমার মনে উদয় হয় সেই নর্তকীর নাচের কথা। এখনও যেন হাওয়ায় ভাসে সে কথা।

সুন্দরী নাচে।

কিঙ্কিনী পায়ে সুন্দরী নাচে
বাতাসে আসে তার সুর
তীর ভাঙ্গা ঢেউ যেন
মাথা ঠোকে সারা দুপুর!
পিচোলার জল ছলাৎ ছল
দুষ্টু মিষ্টি বালিকা করে টল মল।

সিটি প্যালেস দেখা শেষ। ফিরে আসি জগদীশ মন্দিরের সামনে। আমাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এবেলার মত ভ্রমণও শেষ। আমার সহযাত্রীগণ অনেকেই কেনা কাটায় ব্যস্ত। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। পরবর্তী ট্যুরের অসুবিধা হবে। বাস চলতে শুরু করতেই বাকি সহযাত্রীগণও সুড় সুড় করে বাসে উঠে পড়লেন।

আমরা ফিরে এলাম কাজরি ট্যুরিস্ট বাংলোয়। ট্যুরিস্ট বাংলোর পর্যটকই বেশি। তারা দুপুরের খাওয়া সারবেন ট্যুরিস্ট বাংলোর হোটেলে। আর আমি সারবো বাইরের হোটেলে।

বাইরে খাওয়া সেরে এসে দেখি ট্যুরিস্ট বাংলোর পর্যটকগণ এখনও বাসে ওঠেননি। সুতরাং হাতে যথেষ্ট সময় আছে। কাজরি ট্যুরিস্ট বাংলোর কাউন্টারে জানতে চাই রণকপুর ট্যুরের লোক হয়েছে কিনা? না, রণকপুর ট্যুরের লোক হয়নি। উঠে আসি।

দুপুর দুটো। দ্বিতীয়ার্ধের ট্যুরের বাস একই। আমরা প্রথমে যাব হলদিঘাট। যেখানে বীর যোদ্ধা মহারাণা প্রতাপ সিং-এর সঙ্গে আকবরের সৈন্যের সামনাসামনি লড়ালড়ি হয়। উদয়পুর থেকে হলদিঘাট-এর দূরত্ব ৬৬ কিমি। সুতরাং হাতে যথেষ্ট সময় আছে। এই অবসরে পূর্বাপর আলোচনা করা যাক।

১৫৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আকবর চিতোর আক্রমণ করেন। তখন সম্রাট অজুহাত দেখালেন — মুঘলদের শত্রু বজবাহাদুরকে চিতোরে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এ আক্রমণ।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। পররাজ্য গ্রাস করা যাদের নীতি তাদের এসব অজুহাতের প্রয়োজন হয় না। তবু শঠতার আশ্রয় নিতে হয়। না হলে মেবারের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্ক তো খারাপ ছিল না। সংগ্রাম সিং-এর মহীয়ষী কর্ণাবতীর রাখিভাই ছিলেন হুমায়ূন। সেই সূত্র ধরে মেবারের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা যেত। সুতরাং আকবর চিতোর আক্রমণ করে পিতার মহান আদর্শকে অবজ্ঞা ও অপমান করলেন।

সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই আকবর এত নৃশংস হয়েছিলেন। চিতোর ছোট জায়গা। এত রাজপুত সেখানে ছিল না। কিন্তু মেবারবাসীর প্রাণের চিতোরকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত মেবার থেকেই রাজপুতগণ এসেছিলেন রাজধানীতে। সুতরাং এই নিষ্ঠুরতার মূলে ছিল ভয় দেখিয়ে রাজপুতানায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এতে কিছুটা কাজও হয়েছিল। ভয় পেয়ে রণথম্ভোর কালিঞ্জর, বিকানীর ও জয়সলমীরের রাজগণ তাদের সুন্দরী মেয়েদের উপঢৌকন দিয়ে সম্রাটের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন।

উদয়সিং চরিত্রহীন ছিলেন। তাই বলে তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন না।

আকবরও তার সর্বশক্তি দিয়ে দ্বিতীয়বার মেবার আক্রমণ করলেন না। সুচতুর আকবর বুঝলেন মেবার আক্রমণ করলে তার অধীনস্থ রাজপুত সমরবিদ মানসিং, ভগবানদাস প্রমুখেরা অসন্তুষ্ট হবেন। তাদের কাছে সম্রাট যে কত উদার সে প্রমাণ রাখতে চাইলেন।

অথবা তিনি মহারাণা উদয়সিং-এর মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন। কেননা মহারাণার মৃত্যুর পর কিকা (প্রতাপ সিং) কিংবা জগমলই মহারাণা হবেন। তাদের চরিত্রিক দৃঢ়তা কার কেমন তা সম্রাটের জানার সুযোগ হয়নি। হয়তো ভেবেছিলেন মহারাণা উদয়সিং-এর মৃত্যুর পর দুর্বলতার সুযোগে আক্রমণ করলেই চলবে। যাই হোক মহারাণা উদয়সিং-এর জীবিতাবস্থায় মুঘলদের পক্ষ থেকে আর কোন আক্রমণ হয়নি।

কিকা বা জগমালের কথা জানতে হলে উদয় সিং-এর পারিবারিক কথা জানতে হয়। মহারাণার বিশজন রাণী ছিলেন। তাঁদের গর্ভজাত পঁচিশ জন পুত্র ও বিশ জন কন্যা ছিল।

রাণার সন্তানদের মধ্যে কুমার প্রতাপ সিং ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। পলাতক উদয় সিং কুম্ভলমীর বা কমলমীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কালীন অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে মাড়বাররাজ্যের অন্তর্গত পালির সামন্ত চৌহান অখৈরাজ সোনগারার কন্যার সঙ্গে প্রথম বিয়ে হয়। বিয়ের তিন বছর পর চৌহান কুমারীর গর্ভে — সম্ভবতঃ কুম্ভলমীর দুর্গে প্রতাপ সিং-এর জন্ম হয়। জন্মকাল ৯ই মে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ।

মহারাণা উদয়সিং-এর রাজত্বকাল ঘটনাবহুল হলেও কুমার প্রতাপ সিং-এর ৩২ বছর বয়সে বীরত্ব কিংবা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবার তেমন কোন সুযোগ আসেনি। এই ৩২ বছরের মধ্যে ইডরের রাও নারায়ন দাস রাঠোরের কন্যার সহিত শুভ পরিণয় ঘটে এবং স্ত্রীর গর্ভে প্রথম পুত্র অমর সিং-এর জন্ম হয় ১৬ই মার্চ, ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে। এছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই।

তা সম্ভবও ছিল না। কেননা মহারাণা উদয়সিং তার কনিষ্ঠা ভট্টরাণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তিনি এই রাণীর গর্ভজাত পুত্র জগমলকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন। শিবাজী, শের শার মত প্রতাপ সিংও বোধহয় পূর্বজীবনে পিতার অবিচার তাচ্ছিল্য এবং বিধাতার অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করেছিলেন।

মহারাণার অন্যান্য পুত্রগণও এব্যাপারে পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন। ১৫৬০ সালে পিতার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে অমর্ষপরায়ন শক্তসিং মেবার ত্যাগ করে আকবরের কাছে আশ্রয় নেন। এ প্রসঙ্গে কর্ণেল টডের রাজস্থান থেকে জানা যায় —

রাণা উদয়সিং-এর চব্বিশটি পুত্রের মধ্যে শক্তসিং ছিল দ্বিতীয়। শক্ত সিং-এর কোষ্ঠি তৈরি করেন যে দৈবজ্ঞ পণ্ডিত তিনি বলেছিলেন, মহারাজ আপনার এ ছেলে ভবিষ্যতে মেবারের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে। তখন থেকেই রাণা উদয় সিং এই ছেলেকে সুনজরে দেখতেন না।

বালক বয়সেও শক্ত সিং এ বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারল। স্বভাবতঃ শক্ত সিং-এর মধ্যে হতাশা ও গ্লানির কারণে আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে। একদিন এক কর্মকার একখানা নতুন ছুরি এনে উপস্থিত হল। ছুরির ধার পরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছিল। হঠাৎ শক্ত সিং কর্মকারের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে পিতাকে সম্বোধন করে বললে —'বাবা এ ছুরি দিয়ে কি হাড় মাংস কাটা যায় না?

এই বলে শক্ত সিং নিজের হাতে ছুরির ডগাটি আমূল বসিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। পরে রাণা সভাসদকে আদেশ করলেন 'এই মূহুর্তেই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও শক্তকে। আমি তাকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করলাম।'

বালক শক্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। তখন শালুমব্রা সর্দার উদয়সিংহের সামনে এসে করজোড়ে বললে, 'মহারাজ, এই অধীনের এক নিবেদন আছে। অনেক সময়

অনেক কারণে আমার উপর খুশি হয়ে আমাকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন আপনি। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে নেব বলে আমি তখন কিছু চাইনি। আজ আমি আপনার কাছে একটি বস্তু প্রার্থী। আপনি অনুগ্রহ করলে আমার অভিষ্ট পূর্ণ হয়।' রাণা তখনই সম্মত হলেন, 'বলুন আপনি কি চান, আমি দেব।'

তখন শালুমব্রা রাজপুত্র শক্তকে ধর্মপুত্র হিসাবে রাণার কাছ থেকে চেয়ে নিল। রাণা শক্তের প্রাণদণ্ড মুকুব করলেন এবং শালুমব্রার হাতে অর্পণ করলেন। সন্তানহীন শালুব্রার আদরযত্নে শক্ত বড় হতে থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে শালুমব্রাপতির পুত্র কন্যা জন্মাল। বিপদ দেখা দিল তখন। নিজের পুত্রকে বঞ্চিত করে দত্তক পুত্রকে উত্তরাধিকারী করার রীতি নেই। সঙ্কটে পড়ল শালুমব্রাপতি। এমন সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপ সিংহ ডেকে পাঠাল শক্তকে।

চন্দাবৎ সর্দারের অনুমতি নিয়ে দুভাই এক জায়গাতে বসবাস করতে লাগল। দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠল। কিন্তু বেশিদিন টিকল না।

একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে একটি লক্ষ্য নিয়ে দুভাইয়ের মধ্যে তর্ক বাধে। কথা কাটাকাটি থেকে সত্যি সত্যি কাটাকাটি আরম্ভ হল। দুভাই তরবারি খুলে দাঁড়াল। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল কেউই তাদের এই অনর্থ থেকে নিরস্ত করতে পারল না। সে সময়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন গিহ্লোটবংশের পুরোহিত। দুভাইকে তরবারি খুলতে দেখে তিনি ছুটে এলেন। '—মহারাজ, ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন,।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ক্রোধে টগবগ করে উঠেছে দেহের রক্ত। দুজনে দুজনের জিদ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। ব্রাহ্মণের সকাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করল না তারা। শেষে নিরুপায় হয়ে কুলপুরোহিত চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনারা যদি নিরস্ত না হন তবে এখানেই আমি আত্মঘাতী হব।'

সে কথাতেও কেউ ভ্রুক্ষেপ করল না। দুজনে তখন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তরবারি হাতে তাক খুঁজছে। এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ ছুরিকা বের করে নিজের বুকেই আমূল বসিয়ে দিল। রক্তে ভেসে গেল পথ। পথের উপর লুটিয়ে পড়ল ব্রাহ্মণের দেহ।

ক্ষত্রিয়র সামনে ব্রহ্মহত্যায় বিচলিত হল প্রতাপ। অনুশোচনায় ভরে গেল অন্তর। তরবারি কোষে পুরে শিশুর মত কেঁদে উঠল সে। '— একি হল, একি করলাম আমি? এ পাপ কোথায় রাখব?'

তখনই শক্ত সিংকে বিদায় করে দিল প্রতাপ । অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য করে শক্ত সিং মেবার ত্যাগ করল এবং মনে পুষে রাখল জিঘাংসা — কি করে প্রতাপের জীবন সংহার করা যায়। শক্ত সিং সোজা চলে গেল আকবরের দরবারে। সেই থেকে প্রতাপের পরম শত্রু শক্ত সিং । কিন্তু হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রতাপ যখন পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তার পিছু নিয়েছিল খোরাসানি মুলতানি দুই মোঘল সৈন্য, তখন শক্ত সিং বিচলিত

হয়ে উঠল। অনুসরণকারী মুঘল সৈন্যদের হত্যা করে দাদাকে সমূহ বিপদ থেকে বাঁচাল সে। সেই থেকে দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা জন্মাল।

চিতোর আক্রমণের এও একটি কারণ। বস্তুতঃ প্রতাপ সিং এর মহারাণা হবার পর থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রগাঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং প্রতাপ সিং এর মহাজীবন আলোচনার বিষয় হোক।

১৫৭২ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী মহারাণা উদয় সিং দেহত্যাগ করেন। যেহেতু মহারাণা জগমালকে মেবারের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে গেছেন। জগমাল কয়েক ঘণ্টার জন্য মেবারের মহারাণা হন। কিন্তু ঐ দিনই মেবারের সর্দারগণ মহারাণা প্রতাপ সিংকে গদিতে বসালেন। সে এক চমকপ্রদ ঘটনা।

মহারাণা উদয় সিং-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জগমালকে উপস্থিত না দেখে মেবারের মহারাণা হওয়ার ব্যাপারে প্রতাপের মাতামহ এবং অন্যান্য সর্দারদের আলোচনা নিম্নরূপ হল। শ্রদ্ধেয় কালিকারঞ্জন কানুনগোর ভাষাতেই বলি —

"ইহাতে প্রতাপের মাতামহ অখৈরাজ সোনগরা সলুঁবর (সালুম্বা) - পতিরাবত কিষণদাস ও রাবত সাঁগাকে বলিলেন "আপনারা চুণ্ডার বংশধর, অতএব এ কাজ আপনাদের সম্মতিক্রমে হওয়া উচিত ছিল। শিয়রে আকবরের মত প্রবল শত্রু, চিতোর হস্তচ্যুত ; মেবারের রাজ্য ছারখার; এ অবস্থায় যদি ঘরোয়া বিবাদ বাড়িয়া যায় তবে রাজ্য- নাশ সুনিশ্চিত"

রাবত কিষণদাস এবং সাঁগা বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রতাপ সিংহ, যিনি সর্বপ্রকারে যোগ্য, তিনিই মহারাণা হইবেন।" উদয় সিংহের দাহক্রিয়া হইতে ফিরিয়া গিয়া জগমালকে বলিলেন, "কুমার! আপনার আসন গদীর সম্মুখে; ঐখানেই বসা আপনার উচিত।" একথা শুনিয়া জগমাল সপরিবারে মেবার ত্যাগ করিলেন। সর্দারেরা ঐ দিনই প্রতাপকে গদীতে বসাইয়া নজরানা দিলেন। (২৮-এ ফেব্রুয়ারী, ১৫৭২ খৃঃ)।

যাহা হউক, এ ঘটনা নাটকীয় ব্যাপারের মত হলেও মনে হয় প্রতাপের মাতামহ মেবারের গদিতে নিজের দৌহিত্রের জন্মগত অধিকার রক্ষা করার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন এবং মেবার সামন্তগণের মধ্যে একটা দলও সৃষ্টি করেছিলেন।

এ ঘটনার জন্য স্বাভাবিক স্বার্থই প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতাপ জন্মগত অধিকার পাওয়াতে এ ঘটনার সঙ্গে পরিচিত জনেরা যেমন সন্তুষ্ট তেমন জগমাল মেবারের গদি হারানোয় কারো মনে কষ্ট হল না। তখনকার ন্যায়নিষ্ঠ আন্দোলনে যা ঘটার ঘটল। প্রতাপের রাজ্যলাভের পর জগমাল স্বেচ্ছায় মেবার ত্যাগ করেন এবং আকবরের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট দেশদ্রোহী জগমালকে মুঘল বিজিত মেবারের জাহাজপুর পরগণা প্রদান করে কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার করার ব্যবস্থা করলেন। রাজ্যলাভের পর মহারাণার সমরপ্রস্তুতি ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কিছু সময়ের দরকার হয়ে পড়ল। আকবর এসময়

সৌরাষ্ট্র এবং গুজরাট জয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এ জন্য তিনি কুমার মান সিং এবং ভগবানকে উদয়পুরে পাঠালেন বন্ধুভাবে রাণাকে বশীভূত করার জন্য।

মহারাণা প্রতাপের বীরত্ব, নীতিবর্জিত ছিল না। তিনি মান সিং এবং ভগবান দাসকে নানা ভাবে আপ্যায়িত করে স্তোকবাক্য এবং ছলানার মধ্যে তিন বছর কাটিয়ে দিলেন। মুঘল দরবারে যাই যাই করেও গেলেন না—এটা শঠতা নয় রাজনীতি।

অবশেষে প্রতাপের সিংহাসনে বসার চার বছর পর অর্থাৎ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মান সিং পাঁচ হাজার সৈন্য এবং কয়েকটি হাতি নিয়ে মেবার আক্রমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হলেন মীর বকশী আসফ খাঁ।

মান সিং খমনোর ও হলদিঘাটের মাঝামাঝি বনাস নদীর তীরে শিবির গাড়লেন। মহারাণা মাইল দুয়েক দূরে আরাবল্লী পাহাড়ের আড়ালে শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় রইলেন। প্রতাপের মাত্র তিন হাজার সৈন্য।

১৫৭৬ সালের ১৮ই জুন হলদিঘাট গিরিপথের উপর দু'দলের প্রবল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রতাপ দৃশ্যত পরাজিত হলেও আসলে তিনি বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাৎপসরণ করলেন।

মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ূনী নামে জনৈক মুঘল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তার সমর্থন মেলে। তিনি বলেছেন, 'মহারাণার পিছু লইবার মত সাহস ও শক্তি মোঘল সৈন্যের ছিল না। দুপুর বেলায় ভীষণ "লু" চলিতেছিল এবং গরমে মাথার খুলির মগজ পর্যন্ত সিদ্ধ হইতে লাগিল।

'মোঘল সৈন্যেরা বিশেষ সন্দেহ করিল রাণা পাহাড়ের পিছনে ছল করিয়া ওৎ পাতিয়া আছেন' — (রাজস্থান কাহিনী, কালিকা রঞ্জন কানুনগো পৃষ্ঠা ১৯)।

হলদিঘাটের যুদ্ধের পরদিন মান সিং গোগুন্ডা শহর দখল করলেন। এর পরেই প্রতাপের ঝটিকা আক্রমণে মুঘল বাহিনী সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। আম আর মাংস খেয়ে তাদের বাঁচতে হল।

হলদিঘাটের যুদ্ধে জেতার পরও মেবার পদানত হয়নি জেনে আকবর যৎপরনাস্তি বিরক্ত হলেন এবং তিনি নিজেই আসরে নামলেন। ওদিকে প্রতাপ ঠিক করলেন মুঘল সৈন্যের সঙ্গে আর কখনো সামনাসামনি যুদ্ধ করবেন না। তিনি পার্বত্য প্রদেশে ঘাঁটি গাড়লেন। আরাবল্লীর প্রতিটি গিরি শিখরকে দুর্গে পরিণত করার মতলব আঁটলেন।

১৫৭৬ সালের অক্টোবর মাসে আকবর আজমীর থেকে গোগুন্ডা এলেন। কুতুবুদ্দিন খাঁ, ভগবান দাস এবং কুমার মানসিংকে পাঠালেন প্রতাপকে বন্দী করার জন্য। শুরু হল মুঘল এবং শিশোদিয়ার মধ্যে সংগ্রাম। প্রতাপের গেরিলা আক্রমণে মুঘল সেনাপতিরা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরা উদয়পুর এবং গোগুন্ডা ছাড়তে বাধ্য হলেন।

তিনবার অভিযানের পরেও প্রতাপকে বন্দী করা গেল না জেনে আকবর তাঁর সেনাপতিদের উপর রুষ্ট হলেন — সেনাপতিদের তিরস্কার এবং অপমান করলেন এমনকি কিছু দিনের জন্য তাঁদের দরবারে প্রবেশও নিষিদ্ধ হল। সম্রাট, মহারাণা প্রতাপকে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্তরায় বলে মনে করলেন। তাহলেও তিনি নিরাশ হলেন না।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে শাহবাজ খাঁ এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে কুম্ভলমীর দুর্গ অবরোধ করলেন। খাদ্যসঙ্কট হওয়ায় রাণা কুম্ভলমীর ত্যাগ করে বাণপুরে আশ্রয় নিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে একটা বড় তোপ ফেটে যাওয়ায় দুর্গের সমস্ত গোলা বারুদ নষ্ট হয়। দুর্গরক্ষক প্রতাপের মাতুল রাওভান সোনগরা ভীষণ যুদ্ধ করে অনুচরদের সঙ্গে নিহত হন।

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল কুম্ভলমীর দুর্গ মুঘলদের হস্তগত হল। শাহবাজ খাঁ উদয়পুর এবং গোগুন্দা শহর ছারখার করলেন। তবু প্রতাপ বশ্যতা স্বীকার করলেন না। বরং শাহবাজ খাঁর মেবার ত্যাগের পরেই মহারাণা পাহাড়ী ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে পুনরায় অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিলেন।

শাহবাজ খাঁও ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার মেবার আক্রমণ করলেন। চারমাস চেষ্টা করেও তিনি প্রতাপকে বন্দী করতে পারলেন না। এরপর আকবর পাঁচ বছর আর কোন অভিযান চালাননি।

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জগন্নাথ কচ্ছবাহকে বিরাট সৈন্য নিয়ে মেবার জয় করতে পাঠালেন। কচ্ছবাহ দুবছর প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন এবং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ফিরে গেলেন।

জগন্নাথ কচ্ছবাহের ফিরে যাওয়ার পর মহারাণা এক বছরের মধ্যে চিতোর এবং মান্ডলগড় ছাড়া সমগ্র মেবার পুনরুদ্ধার করলেন। তত দিনে বিচক্ষণ সম্রাট বুঝলেন মেবার অজেয়, মহারাণা প্রতাপ অপরাজেয়। তাই প্রতাপের জীবদ্দশায় তিনি মেবারে আর কোন অভিযান করেননি। মহারাণা শেষ এগার বছর শান্তিতে রাজত্ব করতে পারলেন।

প্রতাপ প্রায় সারাজীবন অক্ষত দেহে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বাঘশিকারের জন্য গুণ পরাতে গিয়ে অসাবধানবশতঃ তলপেটে এবং অন্ত্রে আঘাত পান। আর সে আঘাতে বেশ কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগ করে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের এক অপুরনীয় ক্ষতি হল। এই মহাজীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হল চাবণ্ডা থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটা ছোট নদীর ধারে।

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে।

বাসের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে — সামনে হলদিঘাট। বাইরে তাকিয়ে দেখি পথের দুদিকে আরাবল্লীর দুর্ভেদ্য গিরি প্রাচীর। ভাবতে অবাক লাগছে প্রতাপ এই পাহাড় শ্রেণীর আড়ালে থেকে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে মেবারের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছেন।

গাইড বল্লেন — 'আমরা এসে গেছি হল্‌দিঘাটে। ঐ দেখুন পথের বামদিকে চেতকের সমাধি। পরে সমাধিতে আসবো। এখন মহারাণার শিবিরক্ষেত্রে চলুন।'

বাস আরো কিছু দূর এগিয়ে একটা পাহাড়ী টিলার গোড়ায় থামল।

হলদি ঘাট

গোগুন্দা ও খমনোর মধ্যবর্তী পর্বত শ্রেণীর সংকীর্ণ গিরিপথ। এই গিরিপথেই ১৫৭৬ সালের ১৮ই জুন মহারাণা প্রতাপ এর শিশোদিয়া সৈন্য এবং আকবরের মুঘল সৈন্যের মধ্যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রবল যুদ্ধ হয়। মহারাণা প্রতাপ এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শ্রান্ত ও আহত চেতক প্রভুকে নিয়ে একটি নালা পার হবার সময় অন্তিম আঘাত পায়।

যেখানে চেতক অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছিল সেখানে চেতকের স্মরণে সমাধি মন্দির তৈরি হয়েছে। তারই খানিক দূরে গিরিপথের পাশে একটি রেস্ট হাউসের দেওয়াল গাত্রে গাইড ম্যাপ আছে। গাইড ম্যাপের সাহায্যে গিরিপথের যুদ্ধের অবস্থান এবং মহারাণা ও মুঘল শিবিরের অবস্থান দেখান হয়েছে।

পথের কথায় আসি।

চেতকের সমাধির কিছু দূরে প্রায় সমতল উঁচু জায়গায় বাস এসে থামল। এখানে একটি রেস্ট হাউস আছে। ঘরের দেওয়ালে হলদিঘাটের মানচিত্র। মানচিত্রের সাহায্যে চেতকের সমাধি মন্দির থেকে গিরিপথের যুদ্ধক্ষেত্র এবং রাণা ও মুঘলদের অবস্থান বুঝে নিয়ে আমরা বাইরে আসি।

পিছনে ফেলে আসা চেতকের সমাধি মন্দিরের দিকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী সম্রাটের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করেছেন যে বীর প্রতাপ, তারই বিচরণ ক্ষেত্রে হাঁটতে পারছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পাকা রাস্তার কিয়ৎদূরে দেওয়াল ঘেরা একটা সুন্দর বাগিচা। একটা নালা পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। শ্রান্ত চেতক তার প্রভুকে নিয়ে এই নালা পার হতে গিয়ে অন্তিম আঘাত পায়।

নালার উপর পুল। পুল পেরিয়ে এলাম বাগিচায়। বড় বড় গাছে ছাওয়া ছায়াশীতল বাগান। তারও পরে একটি বৃহৎ জলাশয়। বাগানের মধ্যস্থলে শ্বেত পাথরের নির্মিত একটি সমাধি মন্দির। চেতকের সমাধি মন্দির।

দুধাপ বেদির উপর খোলা পরিবেশে চারস্তম্ভযুক্ত দেওয়ালহীন মন্দির। ছোট হলেও ভারী সুন্দর। মন্দিরের শিখরটি গম্বুজাকৃতি। বেদিরগায়ে লেখা—

CHETAK – CHABUTRA

DIED ON JUNE 21, 1576.

ধন্দে পড়ি। হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল ১৮ই জুন ১৫৭৬ সাল। না, ধন্দের কারণ নেই। প্রিয় চেতকের অন্তিম লগ্ন আসন্ন বুঝে প্রতাপ পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিলেন। সে অবস্থাতেই চেতক আরো তিনদিন জীবিত ছিল এবং ২১শে জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

এ মুহূর্তে ভীষণ কষ্ট হল চেতকের কথা ভেবে। এ যেন প্রতাপের এক বিশ্বস্ত সারথি এবং সহযোদ্ধার মহৎ প্রয়াণ। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ অন্তিম বিশ্রাম নিচ্ছে। সে দিন নিজের প্রাণের বিনিময়ে প্রভুকে বাঁচিয়ে পরোক্ষে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করে গেল।

তাইতো কৃতজ্ঞ মেবারবাসী তাঁদের বিশ্বস্ত সৈনিক চেতকের সমাধি মন্দির তৈরি করেছেন। আর হাজার হাজার ভারতবাসী দূর দুরান্ত থেকে এসে চেতকের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন।

চেতকের অমর আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করে নেমে আসি নিচে। চেতকের সমাধি মন্দিরের নিচে রয়েছে মহাদেব মন্দির। ঘুরে দেখছি ছায়া শীতল সুন্দর কানন। সবাই এগিয়ে গেছে। ফিরে আসি বাসে।

বাস এগিয়ে চলেছে চড়াই গিরিপথ ধরে। এই সে হলদিঘাটের গিরিপথ। ডান দিকে মহারাণার শিবিরক্ষেত্র ছাড়িয়ে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। দুদিকে কাঁটা গাছ আর ঝোপঝাড়। আধমাইল খানেক প্রায় সমতল পথ। দুদিকে পাহাড়ী ঢাল। পাহাড়ী ঢালের চূড়াও খুব উঁচু নয়। দেখার সুবিধার জন্য আস্তে চলছে বাস।

বাসের চলার জন্য ধুলো উড়ছে। হলদে মাটি — হলুদ রংয়ের ধুলো। এ পূণ্য ভূমিতেই সেদিন স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং এ মাটি এ ধুলো স্বাধীনতার পূজারী রাজপুত রক্তে পবিত্র হয়ে উঠেছে। ধুলো উড়ছে বাতাসে। উড়ন্ত ধুলো আমাদের মাথা ও মুখে লাগছে। যেন পবিত্র ধূলিকণা আশীর্বাদের ছোঁয়া দিয়ে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে শুদ্ধ করলো আমাদের চিত্ত।

গিরিপথের পরে প্রশস্ত জায়গা। ডানদিকে বড় বড় গাছগাছালি। বাম দিকে ঝোপঝাড়। বাস আরো নিচের দিকে নামছে। পথও বামদিকে বেঁকে গেছে। বাঁকের মুখে বাম দিবে ঝোপঝাড়ে ভর্তি পাথুরে প্রান্তর। গাইড বল্লেন, ওখানেই মুঘল বাহিনী শিবির গেড়েছিল। আর ঐ যে নদী দেখছেন! — ঐটি বনাস নদী।

দুদিকে পাহাড়। বাস বনাস নদীর তীর ধরে এগিয়ে চলেছে। পিছনে ফেলে আসা গিরিবর্ত্ম অদৃশ্য হতেই কালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয়ের কথাগুলো মনে পড়ে। তিনি বলেছেন—

'মহারাণার দুর্জয় সঙ্কল্পের সম্মুখে আকবরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, মেবার স্বাধীনতার অনির্বাণ প্রদীপ আরাবল্লী শিখরে জ্বলন্ত রাখিয়া প্রতাপ বীরব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন। মহারানা প্রতাপের ত্যাগ ও বীরত্বে মেবারের নৈতিক প্রভাব সমস্ত রাজপুতনায় প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। বাবরের হাতে পরাজিত হইয়া মহারাণা সংগ্রাম সিং রাজপুতানার যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হারাইয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর ভারত সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষণ করাতে মেবারের সেই প্রনষ্ট অধিরাজত্ব রাজপুত জাতির মনের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বিরাট হিন্দু জাগরণ মোঘল সাম্রাজ্যকে ধুলিসাৎ করিয়াছিল উহার মূলে প্রতাপের মহান আদর্শের প্রেরণা কম ছিল না। প্রতাপ না জন্মিলে মেবারের মহারাণা রাজসিংহ জন্মিতেন কিনা সন্দেহ, রাজসিংহ না থাকিলে মেবার ও মাড়বারে আওরঙ্গজেবের প্রচণ্ডনীতি প্রতিহত হইত না।'— (রাজস্থান কাহিনী, পৃষ্টা ২৫)।

জগৎ সিং এর মৃত্যুর পর মাত্র তেইশ বছর বয়সে রাজসিং সিংহাসন আরোহণ করেন। মহারাণা রাজসিংহের রাজত্বকাল ১৬৫২ সাল থেকে ১৬৮০ সাল পর্যন্ত। তিনি চতুর রাজনীতিবিদ কিংবা দুরদর্শী নেতা ছিলেন না। তাঁর স্বধর্মপ্রীতি এবং স্বদেশানুরাগ মেবারকে ঘিরে ছিল।

তার মধ্যেও বৃহত্তম হিন্দু সমাজের প্রতি যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করেছেন এবং চরম দুর্দিনে রাজপুত জাতিকে রক্ষা করেছেন।

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত সিং-এর মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব মাড়বার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করেন। মুঘল সৈন্যরা মাড়বারের দুর্গ দখল করল। সমস্ত মন্দির এবং মূর্তি ধ্বংস করল। মহারাণা তখনও নিশ্চেষ্ট। শুধু তাই নয় ঔরঙ্গজেবের কোপদৃষ্টি যাতে মেবারের উপর না পড়ে তার জন্য তিনি কুমার জয়সিংহকে সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন।

ওই বছর জুলাই মাসে দুর্গাদাস অসীম বীরত্বে যশোবন্তের পরিবার ও শিশুপুত্র অজিতকে মুঘলদের হাত থেকে উদ্ধার করে যোধপুর পৌঁছালেন। তারপর মহারাণার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। তখন রাণা তাদেরকে বারখানি গ্রাম প্রদান করেন। রাঠোর সর্দারগণ স্ত্রীপুত্র সহ মেবার রাজ্যে এসে বাস করতে থাকে।

ঔরঙ্গজেব দেখলেন মেবার রাজ্য জয় না করতে পারলে রাঠোরেরা দমিত হবে না। এজন্য তিনি ১৬৭৯ সালে সসৈন্যে মেবার অভিমুখে অগ্রসর হলেন। খবর পেয়ে রাণা শিশোদিয়া এবং রাঠোর সর্দারগণদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন।

সর্দারগণ দুর্জয় সাহস এবং অদম্য উৎসাহে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। কিন্তু বৃদ্ধ পুরোহিত গরীবদাস স্মরণ করিয়ে দিলেন আরাবল্লীর পর্বত শিখরে আরোহণ করে রাণা প্রতাপ যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। তখন ঠিক হল গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করাই শ্রেয়। চিতোর কিংবা উদয়পুর রক্ষার জন্য বৃথা সৈন্যক্ষয় না করে মহারাণা পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় নিলেন। আর এ সুযোগে ঔরঙ্গজেব ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত উদয়পুরে ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেলেন।

মহারাণা রাজসিংহ উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিবিদ না হলেও সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন।

কেননা মুঘলরা যাতে মেবারের উপর সর্বশক্তি নিয়োগ করতে না পারে তার জন্য তিনি রাজপুতদের মালব এবং গুজরাট প্রান্ত লুঠ করার জন্য পাঠান। এতে যুদ্ধের খরচ যুদ্ধের আমদানি থেকে নির্বাহ না হলেও রাজপুতদের অল্প আয়াস সাধ্য জয়লাভে আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল। এভাবে তিনি রাজপুত জাতিকে চরম সঙ্কট কালে রক্ষা করলেন।

শ্রদ্ধেয় কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন — তাঁহার যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়া রাজপুত দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল; যে হারিয়াও হার মানে না, পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে পরাজিত করিতে পারে না; প্রবলতর শত্রু দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া মরিলেও সে জয়োচ্ছাস অনুভব করে। রাজসিংহ রাজপুতদের মনোবৃত্তিতে এই ভাব দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। মহারাণা রাজসিংহের প্রারব্ধ কার্য মহাবীর দুর্গাদাসের নেতৃত্বেই বহু বৎসর পরে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জীর্ণ অক্ষয় বটের মত সপ্তদশ শতাব্দীতে মৃত প্রায় হিন্দু জাতির যে কয়েকটি নূতন শাখার উদ্ভব হয়, মহারাণা রাজসিংহ তারই অন্যতম।" (রাজস্থান কাহিনী, পৃষ্ঠা - ৭১)।

১৬৬৯ সালের আগের কথা। ঔরঙ্গজেব আবুচ্ছন্নবিকে ব্রজমণ্ডল ধ্বংস করতে পাঠালেন। তখন বল্লভাচার্যের বংশধরগণ বিভিন্ন বিগ্রহ নিয়ে রাজস্থানের পথে প্রান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিধর্মীর হাতে বিগ্রহ যাতে কলুষিত না হয় তার জন্য এত লুকোচুরি। ১৬৭১ সাল পর্যন্ত তাঁরা এভাবে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন।

মহারাণা রাজসিংহ এ দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পেরে তাঁদের মেবারে আমন্ত্রণ জানালেন। বল্লভাচার্যের তিনজন বংশধর দ্বারকানাথ ও শ্রীনাথজীর বিগ্রহ নিয়ে মহারাণার সঙ্গে দেখা করেন। তখন মহারাণা কাঁকরোলির কাছে অসোতিয়া গ্রামে দ্বারকানাথের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন এবং শ্রীনাথজীর জন্য পাহাড়ে ঘেরা সুরক্ষিত সিয়াগ্রাম বেছে নেন। সিয়াগ্রামে মন্দির নির্মাণ করলেন। পরবর্তীকালে সে মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নাথদ্বার শহর।

নাথদ্বার

২৪° ৫৬' অক্ষাংশ এবং ৭৩° ৪৯' দ্রাঘিমায় অবস্থিত উদয়পুর জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর — নাথদ্বার, বনাস নদীর দক্ষিণ তীরে গড়ে উঠেছে।

চারদিকে পাহাড় ঘেরা, মাঝখানের শ্যামল উপত্যকায় গড়ে ওঠার জন্য শহরটি খুব সুরক্ষিত। মহারাণার আদেশে শ্রীনাথজীকে যখন রথে করে আনা হচ্ছিল, অন্তর্যামী শ্রীনাথজী এই সুরক্ষিত স্থানকেই নিজের লীলাভূমি বলে গ্রহণ করেছেন। তার জন্যই রথের চাকা মাটিতে বসে যায়।

খবর পেয়ে মহারাণা রাজসিংহ ছুটে এসে রথের চাকা মাটিতে বসে যাওয়া দেখে বুঝতে পারেন সর্বইন্দ্রিয়নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ এখানেই অবস্থান করতে চান। রাজসিংহ মন্দির নির্মাণ করে মহাসমারোহে শ্রীনাথজীকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভক্তের আগমনে সিয়ার গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। গড়ে উঠল শহর। শ্রীনাথজীর নামে পরিচিত হল শহর। নাম হল নাথদ্বার।

আজমীর উদয়পুর হাইওয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত শহর। রেলে আসতে হলে ১১ কিমি দুরের নাথদ্বার রেলস্টেশনে নামতে হবে। তারপর বাসে নাথদ্বার।

নাথদ্বার শহর থেকে সড়ক পথে হলদিঘাট ২২ কিমি, কাঁকরোলি ১৬ কিমি এবং একলিঙ্গজী ২৪ কিমি। একটা দিন নাথজীর পূণ্যক্ষেত্রে থেকে যাওয়া মন্দ না। ধর্ম্মশালা মায় হোটেলের অভাব নেই।

পথের কথায় আসি।

সবুজ উপত্যকার পথ ধরে বাস শহরে ঢুকে পড়ল। পথের পাশে শ্রীনাথজীর গোশালা পেরিয়ে বাস জনারণ্য পথ গোবিন্দ চকে পথের পাশে এসে দাঁড়াল। পঞ্চ পথের সঙ্গম। এখান থেকে যেতে হবে হেঁটে।

পথের দুপাশে মনোহারি, পোষাক পরিচ্ছদ, মিষ্টি, চা ইত্যাদি। মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকানপাট দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। দোকানের উপরে বাস গৃহ। পিছনে ঘর বাড়ি। জনবহুল পথ। তবে এ পথে গাড়ি ঘোড়া আসতে দেওয়া হয় না বলে স্বচ্ছন্দে চলতে পারছি।

চড়াই পথ।

মন্দির দেখা যাচ্ছে। পথ এসে মিশেছে মন্দিরের সিংহদুয়ারের সঙ্গে। তার আগেই পথের বাম দিকে জুতো রাখার ব্যবস্থা। ব্যাগ এবং জুতো রেখে এগোই।

সামনের তোরণের দুপাশে দুটো পাথরে খোদাই হস্তী। মহিলা দর্শনার্থীগণ অনেকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তোরণের বাইরে। দরজা বন্ধ। মন্দির খুলবে চারটার সময়।

মন্দির তোরণের দিকে মুখ করলে ডান দিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উপরে বিরাট চাতাল। বাম দিকে লোহার মজবুত দরজা। দরজা পার হতেই বাড়ির উঠোন। এই বাড়ি মন্দিরের নিজস্ব বাড়ি। শ্রীনাথজীর পূজা আর্চার জন্য যে বিরাট আয়োজন চলছে তার জন্যই প্রয়োজন এসব বাড়ির।

উঠোনের ডানদিকে আর একটা মজবুত দরজা। দুটো দরজাতেই শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দরজাটি খোলা। আমার সতীর্থগণ যে যার মত উৎসুক নয়নে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ডানদিকের দরজা বন্ধ। ওদিকে প্রবেশ নিষেধ। দেখছি কাঠের চেলি নিয়ে পাণ্ডাগণ ঐ দরজা দিয়ে ঢুকলেন। বামদিকে বাড়ির নিচতলায় একটা গলি। গলি দেখে ঢুকি ভিতরে। গলির দুদিকে গদ্দিঘর। এই সব গদিতে ভক্তদের দেওয়া পূজার ডালি এবং প্রসাদের জন্য টাকা জমা নেওয়া হয়।

দেখে অবাক হই, কত ঐশ্বর্যশালী এ মন্দির! দুদিকের সারি সারি গদিতে অসংখ্য ভক্তের ডালি এবং প্রণামীর টাকা জমা হচ্ছে। অনুমান করা যায় শ্রীনাথজীর অর্থ বৈভবের কমতি নেই।

পূজোর প্রসাদে খাজাগজা প্যাড়া লাড্ডু রাবড়ি মালাই বিভিন্ন রকম মিষ্টি দেওয়া হয়। শ্রীনাথজীর ভোগও ভারত বিখ্যাত। ভাত, ডাল, আট দশ রকমের তরকারি। একে বলে রাজভোগ।

তারপর শ্রী বল্লভাচার্যের গদি দর্শন করে বাইরে আসি। মন্দিরের সামনে স্তুপ করা কাঠের জ্বালানী হাতে হাতে চলে যাচ্ছে পাকশালায়। আমার সহযাত্রীরা কোথায় আছে দেখতে যাই। মন্দির তোরণের ডানদিকে কয়েক ধাপ উপরে চাতাল। সেখানে নাট মন্দিরের সামনে ভক্তদের লাইন পড়েছে।। মন্দির খুলতে এখনও দেরী আছে। আরও একটু ঘুরে দেখি।

বাইরে আসতে একজন পাণ্ডা জিজ্ঞেস করলেন—

— মন্দিরের সব ঘুরে দেখবেন?

— দেখবো, দক্ষিণা কত?

— তিরিশ টাকা দেবেন।

চলুন।

পাণ্ডাজী বল্লভাচার্যের পাশের একটা বাড়িতে নিয়ে এলেন। বাড়ির নিচের তলায় শ্রীনাথজীর ভোগের জন্য গম ভাঙ্গা হচ্ছে। গরুর চোখ দুটো বাঁধা। পাশের কলটিতে তেল পেষাই হয়।

আমরা উঠে এলাম দোতলায়। একটা হল ঘরের সামনে এসে পাণ্ডাজী বললেন — এখানে শ্রীনাথজীর জন্য ফুলের মালা গাঁথা হয়। সকালে এই মালা গাঁথার কাজ হয়। ফুলের গন্ধ নাকে আসছে।

ওখান থেকে আসি সবজি এবং ফলের ঘরে। সবজি এবং আনাজ তরকারি এখনও স্তুপ করা আছে। বেশির ভাগ কাটা হয়ে ভোগের কাজে লেগে গেছে।

পানের ঘরে স্তুপ করা পান সুপারি। কাঁড়ি করা বানানো পান। তীর্থযাত্রীরা অনেকে নিজের থেকে তরকারি কেটে দেয় এবং পানের খিলি তৈরি করে । শ্রীনাথজীর সেবার কাজে সবাই উৎসুক।

দুধের ঘরে দুধের বড় বড় ভাণ্ডার। প্রতিদিন কুড়ি পঁচিশ মন দুধ দিয়ে শ্রীনাথজীর পরমান্ন তৈরি হয়। তীর্থ যাত্রীগণ দলে দলে আসেন দুধ নিয়ে। এছাড়া শ্রীনাথজীর নিজস্ব গোশালার দুধ প্রভুর ভোগে লাগে। উঠে আসি তেতলায়। এখান থেকে মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে সুন্দর ভাবে। পদ্মাকৃতি শিখর কলস। উপরে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র এবং পাশে পত পত করে উড়ছে শ্রীনাথজীর পতাকা।

পাণ্ডাজী বললেন, ঐ যে খোলার ছাদ দেখছেন ভাববেন না শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্যের অভাব আছে। শ্রীনাথজীর স্বপ্নাদেশেই আমরা তাঁকে কাঁচা ঘরে রেখেছি। তিনি যে সাধারণ মানুষের ভগবান — দরিদ্রের নারায়ণ। এমনকি তাঁর ঘরটিও মাটির।

তাড়াতাড়ি নেমে আসি আমি। মন্দির খোলার সময় হয়ে গেছে। পাণ্ডাজী বললেন, আপনাকে সোনারুপার যাঁতা দেখাতে পারলাম না। ঐ যাঁতায় শ্রীনাথজীর জন্য মশলা পেষাই হয়। আর দেখাতে পারলাম না ঘি - ঘর। চলতে চলতে পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞেস করি—

— আচ্ছা, শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্যের পরিমান কেমন?

— তা-কয়েক কোটি টাকা হবে।

চাতালে এসে দেখি অগণিত দর্শক। পাণ্ডাজী ভিড় ঠেলে আমার সহযাত্রীদের কাছে নিয়ে এলেন। আর ঠিক সে সময় শ্রীনাথজীর জয়ধ্বনি ওঠে—শ্রীনাথজী কি জয় ! দ্বারকাধীশ কি জয়!

জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হল। তার পর দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ছুটে আসি নাট মন্দিরে। এর মধ্যেই লোকে লোকারণ্য। মূল দরজা দিয়ে মহিলা দর্শনার্থীদের আগেই ঢোকানো হয়েছে। তারা রয়েছেন গর্ভমন্দিরের সামনে। আমরা নারী এবং পুরুষ দর্শনার্থী নাটমন্দিরের পিছনের দিকে। দর্শনার্থীর তুলনায় নাটমন্দিরের জায়গা কম। স্থান সঙ্কুলান হয় না।

ছুটে এসেই দেখি গর্ভমন্দির খোলা। আমার দৃষ্টি সামনের দিকে।

আহা! একি রূপ!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্বেত পাথরের কারুকার্যখচিত সিংহাসনে ভগবান বিরাজমান।

দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণ।

কষ্টি পাথরের দণ্ডায়মান মূর্তি। কী অপূর্ব! কি রূপ দেখছি!

জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তের ভগবান আপন মহিমায় উজ্জ্বল।

কালোর মধ্যে যে এমন অপূর্ব রূপ ফুটে উঠে তা আগে দেখিনি। আমার প্রত্যাশা ছাপিয়ে উঠেছে কৃষ্ণ ঠাকুরের রূপলাবণ্য।

পূজারীর কণ্ঠধ্বনি এবং কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনি ডুবে যায় ভক্ত জনের জয়ধ্বনিতে ।

শ্রীনাথজী কি জয়!

দ্বারকাধীশ কি জয়!

কৃষ্ণ ভগবান্ কি জয়!

শুরু হল আরতি। শ্রীনাথজীর আরতি। প্রেমময় ভগবানের রূপজ্যোতি দেখছি অপলক নয়নে। আর ভাবছি ভগবান, একসময় এ ভুবন তোমার স্পর্শে কত সুন্দর হয়ে উঠেছিল। পাপীর বিনাশ সাধনে সঙ্ঘটিত হয়েছিল ধর্ম যুদ্ধ। আজ এ বিশ্ব সংসার পাপীদের দৌরাত্মে

বিষময় হয়ে উঠেছে। পূণ্যাত্মা ভক্তদের মনে সন্দেহ জাগছে — ধর্মের জয়, আজ যেন কথার কথা। প্রার্থনা জানাই হে ভগবান তুমি আবার স্বমহিমায় অবতীর্ণ হও ধরাধামে। তোমার স্পর্শে এই বিশ্ব সংসার সুন্দর হয়ে উঠুক।

পিছনের ভক্তজনের চাপে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। কোনক্রমে ভিড় ঠেলে বাইরে আসি। ফেরার সময় লাইব্রেরীতে আসি। এক দিকে বই বিক্রির ব্যবস্থা আর এক দিকে বসে পড়ার ব্যবস্থা—ফ্রি রিডিং রুম। মন্দির কর্তৃপক্ষের নিজস্ব পুস্তকালয়। কিন্তু নাথদ্বার সম্পর্কীয় কোন বই পেলাম না।

ফিরে আসি বাসে।

নাথদ্বার থেকে কৈলাসপুরীর দূরত্ব ২৪ কিমি। আমরা এখন ফিরে চলেছি উদয়পুরের দিকে। পথে পড়বে কৈলাসপুরী।

আর এখান থেকে কাঁকরোলি ১৬ কিমি। মনে পড়ে সে পূণ্যকাহিনী। বল্লভাচার্যের বংশধরগণ যখন মহারাণা রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করেন তখন তিনি কাঁকরোলির কাছে অসোতিয়া গ্রামে দ্বারকানাথের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। এই সেই কাঁকরোলি।

কাঁকরোলি

কাঁকরোলি রাজ সামান্দ হ্রদের তীরে অবস্থিত। মহারাণা রাজসিংহ দুটি পাহাড়ের মাঝখানে একটি শ্বেত পাথরের বাঁধ তৈরি করান, ফলে ৭.৭ বর্গ কিলো মিটার জায়গা জুড়ে একটি রমনীয় হ্রদের সৃষ্টি হয়। এই হ্রদের নাম রাজ সামান্দ হ্রদ। বাঁধটি ১৮৩ মিটার লম্বা এবং ৬৪ মিটার চওড়া। সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরের দ্বারা তৈরি হয়, ১৬৬২ থেকে ১৬৭৬ সালের মধ্যে।

এই বাঁধের নাম নৌচৌকি। বাঁধ আর শহরের নাম একই — রাজনগর। হ্রদের জলে নামার জন্য তিনটি সুদৃশ্য তোরণযুক্ত ঘাট তৈরি করা হয়েছে। নৌচৌকির পঁচিশ খানি পাথরে সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি খোদাই করা হয়েছে। এই শিলালিপি — 'রাজ প্রশস্তি' নামে খ্যাত। কবিতার মধ্যে মেবারের ইতিহাস উৎকীর্ণ হয়েছে। এটি ভারতের সব থেকে বড় সংস্কৃত শিলালিপি। মহারাণা রাজ সিংহ ১৬৭৫ সালে এই খোদাই কাজ করান।

কনডাকটেড ট্যুরের প্রোগ্রামে না থাকায় এত কাছে এসেও এই সুন্দর জায়গাটি দেখা হল না। দেখা হল না দ্বারকাধীশকে। বাস এসে থামল একলিঙ্গজী মন্দিরের সামনে।

পাহাড়ে ঘেরা রমণীয় উপত্যকা কৈলাস পুরী। কৈলাস পুরীতে মঙ্গলময় মহাদেব একলিঙ্গজী রূপে অধিষ্ঠান করছেন। বাপ্পা রাওএর আমল থেকে একলিঙ্গজী মেবারের মহারাণাদের গৃহদেবতা। মহারাণাগণ যে কোন যুদ্ধ যাত্রার আগে গৃহদেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ করতেন।

কথিত আছে বাপ্পা শিশু বয়সে হরিৎ ঋষির সাহচর্যে আসেন। ঋষি একলিঙ্গজীর পূজা করতেন। ঋষির সঙ্গে বাপ্পাও একলিঙ্গজীর পূজা করতেন। পরবর্তী কালে বাপ্পা অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সর্বপ্রথম এখানে একলিঙ্গজীর মন্দির তৈরি করেন।

কালক্রমে সে মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। সেই একই জায়গায় বর্তমান কাঠামোতে মহারাণা রায়মল মন্দির তৈরি করেন। মহারাণা রায়মলের রাজত্বকাল ১৪৭৩ থেকে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ। পরবর্তী মহারাণাদের হাতে মন্দিরের সংস্কার সাধন হয়েছে। শিবরাত্রির সময় এখানে বিরাট মেলা বসে।

একলিঙ্গজী

একলিঙ্গজী মন্দিরের চারদিকে উঁচু পাথরের প্রাচীর এবং সামনে লোহার দরজা। তোরণটি খুব একটা বড় না হলেও বেশ সুন্দর কারুকার্যখচিত। সামনে দরজার দুদিকে হিন্দী এবং ইংরেজিতে দুখানি শিলা লিপি রয়েছে। ইংরেজি শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ -

SHRI EKLINGJI PRABHU

Personal Deity Temple

of

Aryakul Kamal Diwakar

Hindu Surya Medpateswar

Maharana of Mewar

Vikram Sambat 791 (734 A D)

মন্দিরের বাইরের চালচিত্র দেখতে দেখতে প্রবেশ করি ভিতরে। সুন্দর মসৃণ পাথর বাঁধানো উঠান। পরে আর একটি তোরণ। এটি মজবুত কাঠের তৈরি, শ্রীমণ্ডিত।

বহিরাঙ্গণে পথের দুপাশে পদ্মফুল নিয়ে বসে আছে শিশু বৃদ্ধ এবং মহিলাগণ। একলিঙ্গজী পদ্মফুল ভালবাসেন। আমরা ফুল নিলাম না। আমরা শুধু একলিঙ্গজীকে দর্শন করব। পূজা দেব না।

দ্বিতীয় দরজা পেরিয়ে পায়ে পায়ে চলতে থাকি। এখানেও শ্বেত এবং কাল মর্মর পাথরের উঠোন।

উঠোনের চারপাশে ছোট ছোট মন্দির। ১০৮টি এমন মন্দির আছে। প্রতিটি মন্দির পাথর কেটে তৈরি। মন্দির গাত্রের চিত্রকলাও পাথরে খোদাই।

উঠোনের মাঝখানে রাণা রাজবংশের আদি পিতা বাপ্পা রাওয়াল হাত জোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। মন্দির চূড়ায় তাঁর দৃষ্টি। বাপ্পার পিছনে শিববাহন নন্দী মূর্তি। কষ্টি পাথরের উজ্জ্বল শ্রীমূর্তি। এমন শ্রী মূর্তি আগে কোথাও দেখিনি।

বাপ্পার দৃষ্টি অনুসরণ করে মন্দির চূড়ার দিকে তাকাই। শ্বেত পাথরের তৈরি মন্দির। দ্বিতল মন্দির। উপরের দিকটা পিরামিডাকৃতি। শিখরটি বেশ উঁচু। মণ্ডপের উপরে হাতি, বানর, হনুমান ইত্যাদি শ্বেত পাথরের খোদাই করা প্রাণী।

উঠে আসি মন্ডপ অথাৎ নাট মন্দিরে। প্রাচুর্যপূর্ণ মন্দির। চৌকোণাকার মণ্ডপ। সারি সারি চৌকো স্তম্ভ। এই কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজাকৃতি সিলিং। সিলিংও কারুকার্যখচিত। মহারাণাগণ তাঁদের গৃহদেবতার মন্দির আকর্ষণীয় এবং শ্রীমণ্ডিত করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি।

গর্ভ মন্দিরের সামনে রুপোর পাতে মোড়া রেলিং। সুন্দর কারুকার্য রেলিং এর গায়ে। কপাট জোড়াও রুপোর পাতে মোড়া। ঘন্টাটিও রুপোর। গর্ভমন্দিরের মাঝখানে শিবলিঙ্গ। তার চার দিকে খোদাই শিবের মুখ। উপরে স্বর্ণকলস থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ছে শিবলিঙ্গে।

এখন পূজোর সময়। কাঁসর ঘন্টা এবং সাঁজের প্রদীপ হাতে পূজারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হল আরতি — পশুপতিনাথের আরতি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ। নির্বাক চালচিত্রের আবেশে বিভোর। ভক্তি বিনম্র চিত্তে মহেশ্বরের কাছে সন্তান সন্ততি ও পরিজনের জন্য আশীর্বাদ কামনা করি। মনে মনে নিজের অপরাধ কবুল করি—হে বিরূপাক্ষ মহাদেব তুমিতো সর্বজ্ঞ, লেখার তাগিদে কখনো কখনো স্বার্থপরের মত একাকী বেরিয়ে পড়তে হয় তা যেন আপনজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণ না হয়।

আরতি শেষে পূজারী শান্তিজল ছিটিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করলেন। ব্যোমকেশের চরণামৃত এবং প্রসাদ পেয়ে আমরা ধন্য হলাম।

ফিরে এলাম বাসে।

বাস একনাগাড়ে ছুটে চলেছে উদয়পুরের দিকে। আমি ভাবছি নাগদার কথা। নাগদায় থাকা কালীন বাপ্পা হরিৎ ঋষির সাহচর্যে আসেন। তারই ফলে তিনি জগৎ সংহর্তা বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেন।

নাগদা

কৈলাসপুরী থেকে দূরত্ব মাত্র চার কিমি। এত কাছে আসা সত্ত্বেও মেবারের প্রাচীন রাজধানী নাগদায় যেতে পারলাম না। নাগাদিত্যের নামানুসারে এই প্রাচীন জনপদের নাম নাগদা। সেখানে নবম ও দশম শতাব্দীতে তৈরি মন্দির এবং জৈন মন্দির দেখার বিষয়।

আগামী দিন উদয়পুর ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু উদয়পুরের অনেক কিছু অদেখা রয়ে গেল। যেমন — জয়সামান্দ লেক, ঋষভ দেবজী, রণকপুর, কুম্ভলগড় দুর্গ, পরশুরামজী এবং এসব দেখতে হলে আর একটা দিন উদয়পুরে কাটাতে হয়।

৯ই অক্টোবর।

ঘুম ভেঙ্গেছে সকাল ৭টায়। স্নান করে তৈরি হয়ে নয়টার সময় চেক আপ করে পথে নামি। বাস স্ট্যান্ডে এসে বেশিক্ষণ বসতে হল না। চিতোর-আবুপর্বত এক্সপ্রেস পেয়ে গেলাম। আমি যাব মাউন্ট আবু । সুরযপোল এবং সুখাদিয়া সার্কল ছাড়ার পর বাস দ্রুত গতিতে চলতে থাকে।

দেড় ঘণ্টা পর অর্থাৎ দুপুর বারটায় গোগুনড়া শহরে এসে থামল। গোগুনড়া শহরের চার দিকে পাহাড়। মাঝখানের রমণীয় উপত্যকায় শহর। মহারাণা প্রতাপ সিং-এর তাড়া খেয়ে মুঘল বাহিনী এই উপত্যকাতেই অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। ভাবতে ভালই লাগছে যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক জায়গা গোগুণ্ডাতে আমি আসতে পেরেছি।

বাসের ড্রাইভার এবং কনডাকটার মধ্যাহ্ন ভোজন এখানেই সারবেন। সুতরাং আধঘন্টার যাত্রা বিরতি। এখানে আখের রস সস্তা। গ্লাস প্রতি দেড় টাকা। আখের রস খেয়ে একটু পায়চারী করে নিলাম।

আধঘন্টা বিরতির পর বাস চলতে শুরু করেছে। গোগুণ্ডা শহর ছেড়ে কিছুটা চলার পর দেখছি পথ দুদিকে চলে গেছে। এখান থেকে একটি পথ গেছে রণকপুরের দিকে। আর একটি আবু পর্বতের দিকে।

আমরা আবু পর্বতের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। পথের দুদিকের দৃশ্য খুব সুন্দর। দূরে দূরে পাহাড়। মাঝের উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। দুদিকে শস্য খেত। আবার কোথাও অনাবাদি।

বিকেল পৌনে চারটায় বাস নিচের দিকে নামতে থাকল। বনাস নদীর উপর দিয়ে বাস চলেছে। এখানে নদী শুকনো। আসার পথে একটা বাঁধ দেখছিলাম। বনাস নদীর জল সেখানে আটকে যাওয়ায় এদিকে শুকনো। নদী পেরিয়ে বাস আবার উপরের দিকে উঠতে থাকে। বাস পুনরায় ঘুরে বনাস নদী পার হল। তারপর আবু রোড ধরে রেল স্টেশনের পাশে আবুরোড বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল।

আধ ঘন্টার বিরতি।

সুতরাং এই অবসরে আবু রোড শহরের আলোচনা করা যাক।

আবু রোড

২৪° ২৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭২° ৪৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত শহর। সিরোহির দক্ষিণ এবং বনাস নদীর বামতীরে গড়ে ওঠা ছোট শহরটি আবু পর্বতের সিংহদুয়ার বললে অত্যুক্তি হয় না। এখান থেকে সিরোহি ৬৭ কিমি, মাউন্ট আবু ২৮ কিমি, দিল্লী ৭৪০ কিমি এবং আমেদাবাদ হয়ে মুম্বাই ৭৪০ কিমি।

আবু রোড স্টেশন রেলপথের শেষ সীমানা। আবু রোড তহসিল সদর এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র। নগর উন্নয়নের জন্য গড়ে উঠেছে মিউনিসিপ্যালিটি। বাজার, হোটেল, রেঁস্তোরা, বিশ্রাম ভবন, ধর্মশালা, সিনেমা, থানা ইত্যাদি নিয়ে শহরের আভিজাত্য লাভ করেছে। সরাসরি আবু পর্বতে যাওয়া সম্ভব না হলে এখানেও রাত কাটানো যায়।

পথের কথা।

আধঘণ্টার বিরতি শেষ। সোয়া চারটায় বাস চলতে শুরু করেছে। বনাস নদীর উপর পুল পেরিয়ে বাস একটু একটু করে আবু পর্বতে উঠতে থাকে। পুরোটা চড়াই পথ।

২৮ কিমি পার হতে আধঘণ্টা লাগার কথা। কিন্তু পর্বত এবং চড়াই আঁকাবাঁকা পথ পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। আবু পর্বতের উপর দিয়ে পথ। চলতে চলতে দেখছি পর্বতের উপরিভাগের নালা,পাহাড় গাত্র এবং পাহাড়ের চূড়ার পাথরের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মেছে।

এখন ফল ধরার সময় নয়। কিন্তু এই পাহাড়ের মধ্যে কি করে যে এত গাছ জন্মেছে তা বিস্ময়ের ব্যাপার।

এ পর্যন্ত বাস একটানা চলেছে। শুধু আবু পর্বতের উপরিভাগে এসে চুঙ্গিকর বা অকট্রয় ট্যাক্স দেবার জন্য দাঁড়াতে হল। বাসের জন্য চুঙ্গিকর দিয়েও রেহাই পাওয়া গেলনা। যাত্রীদের থেকে 'যাত্রীকর' বা প্যাসেঞ্জার ট্যাক্স নিল। সব চেয়ে মজার বিষয় হল, কোন রাজস্থানীকে এই ট্যাক্স দিতে হল না।

আমার প্যাসেঞ্জার টিকিট নং ৮.৩৯.১৯৭, এই পরিসংখ্যা নিঃসন্দেহে অবহেলার নয়। আট লক্ষাধিক ভ্রমণার্থী মাউণ্টআবু দর্শনে এসেছেন এই অক্টোবর মাসের মধ্যে। বছর শেষে দশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। পরিসংখ্যান দেখে বুঝতে পারছি মাউণ্টআবুর আকর্ষণ দিনের পর দিন বেড়েছে। কেননা ১৯৭২ সালে পর্যটকের সংখ্যা ছিল তিন লাখ। ১৯৮২ সালে সাত লাখ পঁয়ষট্টি হাজার।

আবু পর্বত বাস স্ট্যাণ্ডে বাস থামতেই সওয়ার ধরার জন্য অনেকে ছেঁকে ধরল। এরা হোটেলের লোক। এখানে প্রচুর হোটেল। গেস্ট হাউসও আছে। লক্ষ্মণ গেস্ট হাউসে চল্লিশ টাকায় ঘর পেলাম। ১১৪ নং ঘরে মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যা হয়েছে। আলোর রোশনাইতে শহর ঝলমল করছে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে লক্ষণ গেস্ট হাউস। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে এসে নজরে পড়ল পোলো গ্রাউণ্ড। আমি আরো নিচে যাব। কেননা ওখানে বাস স্ট্যাণ্ডের মুখে রয়েছে রাজস্থান গভর্নমেণ্ট ট্যুরিস্ট রিসেপশান সেণ্টার।

রিসেপশান সেণ্টারে আগামী দিনের কনডাকটেড ট্যুরের টিকিট কেটে আবার উপরের

দিকে উঠতে থাকি। পোলো গ্রাউণ্ডের তিন দিকে দোকানপাট. রেস্টুরেন্ট এবং হোটেল। পথে পড়ল চাচা ইন - মিউজিয়াম। মিউজিয়ামে রাজস্থানী বাসন. পাথরের মূর্তি. স্টিল, এ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচের রকমারি বাসন সেট, এমনকি পোষাক পরিচ্ছদও রয়েছে। মেয়েদের সাজ পোষাকের দ্রব্য বেশি। হরেক রকম জিনিসের দোকান।

চাচা - ইন থেকে আরো উপরে চলেছি। দুদিকে রেস্টুরেন্ট, খাবারের দোকান, শাড়ি এম্পোরিয়াম. হ্যাণ্ডলুম এম্পোরিয়াম। রাজস্থানী, গুজরাটি ঘরানার সব রকমের পোষাক পরিচ্ছদ। বাজার এবং হাসপাতাল ছাড়িয়ে এসে পড়লাম নক্কি লেকে। যে দিকে যাচ্ছি বাংলা বুলি কানে আসছে। এত বাঙ্গালী ট্যুরিস্ট এসেছে যে মনে হয় বাংলারই কোন এক জায়গা।

লেকের প্রবেশ মুখে একটা বাগিচা — গান্ধী পার্ক। বাগিচার পরে লেকের জলবিহার অফিস। অনেকে জলবিহার করছে। ক্যামেরার ফ্লাস এবং মানুষের মিছিল। ভূট্টার খৈ ছড়িয়ে অনেকে আনন্দ করছে। বিভিন্ন রকম মাছ ভূট্টার খৈ টপাটপ গিলছে। জলবিহার অফিসের বামদিকের পাহাড়ে রয়েছে রঘুনাথ মন্দির এবং দুলেশ্বর মন্দির (হনুমানজী মন্দির)।

কিছুক্ষণ আনন্দ কোলাহলের চালচিত্র দেখে ফিরে এলাম বাজারে। হ্যাণ্ডলুমের একটা বেডসীট কিনে ঢুকলাম হোটেলে। খাবারের ডিস ত্রিশ টাকা। খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরে এলাম গেস্ট হাউসে। এখন রাত আটটা। ভাবছি মাউন্ট আবুর কথা।

মাউন্ট আবু

রাজস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত থর মরুভূমি থেকে হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একটি পাহাড়। এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিশাল পাহাড়কে পর্বত বলে — আবু পর্বত বা মাউন্ট আবু। আবু পর্বতের শীর্ষ দেশে গুরুশিখর রাজমুকুটের মত শোভা পাচ্ছে। পর্বতের সৌন্দর্য শোভা এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য এই মনোরম স্থানটি রাজস্থানের স্বর্গভূমি। গুরু শিখরের উচ্চতা ১৭২২ মিটার।

এক সময় সবুজে আচ্ছাদিত এই স্থানটি মুনি ঋষিদের তপস্যা ভূমি ছিল। আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ। সারা বছর আবহাওয়া প্রায় একই রকম থাকায় আবু পর্বত মুনি ঋষিদের যেমন প্রিয় ছিল আজ পর্যটকদের কাছেও এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শৈল শহর মাউন্ট আবু বহুদিক থেকেই আকর্ষণীয়। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া. মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মুনি ঋষিদের আশীর্বাদ ধন্য তপোভূমি। বিশ্ব বিখ্যাত দিলওয়ারা মন্দিরের অপরূপ সৃষ্টি সম্ভার চিরকালীন আকর্ষণীয়। প্রাকৃতিক

পরিবেশ খুব আকর্ষণীয়। গাছপালা, লতা-পাতা, ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ। সবচেয়ে মোহময়ী হয়ে উঠে শরৎকালে।

দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের সিরোহি জেলায় অবস্থিত এই পার্বত্য অঞ্চলটি ২৪° ২৯ˊ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭২° ৪৭ˊ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং সমুদ্র সমতা থেকে ১২৯০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই জন্য গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২° ৮ সেন্টিগ্রেড, সর্ব নিম্ন ২৬° ৮ সেন্টিগ্রেড, এবং শীতকালে সর্বনিম্ন ৭° ৩ সেন্টিগ্রেড, সর্বোচ্চ ২৫° ৯ সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। আর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫৩ থেকে ১৭৭ - সেন্টিমিটারের মধ্যে।

ফলে সারা বছর আবহাওয়া থাকে খুব চমৎকার এবং সবুজে ছাওয়া থাকে পর্বত গাত্র। এছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে শাক সবজি জন্মায় এখানে।

আবু পর্বতের সৃষ্টির মূহুর্ত বলা শক্ত। কেননা কেউ বলেন আবু পর্বত হিমালয়ের মত প্রাচীন। আবার কেউ বলেন তার চেয়েও বেশি প্রাচীন।

মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে। মহাভারতের বনপর্বে এই পাহাড়কে বলা হয়েছে 'অর্বুদ-তীর্থ'।

মহাভারতের কথা এইরকম — 'হিমবৎসুত অর্বুদ - তীর্থে গমন করিবে; পূর্বে যে স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল ও যে স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠের ত্রিলোক বিশ্রুত আশ্রম, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয়ও ব্রহ্মচারী হইয়া পিঙ্গ তীর্থে স্নান করিলে শত কপিলা দানের ফল লাভ হয়।

প্লিনী (Plinz) তাঁর প্রাকৃতিক ইতিহাসে আবু পাহাড়কে 'Mons Capitalia বলে উল্লেখ করেছেন।

Mons Capitalia চরম শাস্তি দানের পাহাড়। সেকালে যথা সম্ভব কেউ গর্হিত অপরাধ করলে, অপরাধীকে স্বাপদসঙ্কুল পাহাড়ে নির্বাসন দেওয়া হত।

টলেমী (Ptolemy) এ পাহাড়কে 'Appocopi montes' বলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ অসুন্দরের পাহাড়। এই ধারণার পিছনে নিশ্চয় কোন যৌক্তিকতা রয়েছে।

বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক যুয়েন সাং (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ) এই পাহাড়ের কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি পাহাড়ে ভ্রমণ করেননি। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আবু পারমার রাজবংশের স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৩০২ থেকে ১৩১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তারের জন্য চৌহান-গণ পারমার রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পারমারগণ পাহাড়ের উপরে থাকায় এবং পাহাড়কে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করায় চৌহানগণ যুদ্ধে সুবিধা করতে পারত না।

শেষ পর্যন্ত চৌহান রাজা রাও লুম্ভা কূটনীতির আশ্রয় নিলেন। তিনি পারমারদের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন — আর বিবাদ বিসম্বাদ নয়, আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে

আমরা আগ্রহী। যদি বারজন কুমারী কন্যাকে নিয়ে পাহাড়ের নিচে আসেন তাহলে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়।

পারমার রাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে শোভাযাত্রা সহকারে কুমারীদের নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এলেন। আর তখনই চৌহানরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র পারমারদের আক্রমণ করল এবং আবুপাহাড় অধিকার করে নিল। রাও লুম্ভার বংশধরগণ এখানে একশ বছর ধরে রাজত্ব করেন।

১৪০৫ খৃষ্টাব্দে আবু পাহাড়ের তৎকালীন চৌহান রাজা সিরোহিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

কালক্রমে আবু পাহাড় জনহীন হয়ে পড়ে। কর্ণেল টড ১৮২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আবু পাহাড় দর্শন করেন। সেই প্রথম ইউরোপিয়ানগণ আবু পাহাড় সম্বন্ধে জানতে পারেন।

১৮২২ সালের জুন থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত আবু পাহাড় সিরোহি রাজ্যের বৃটিশ পলিটিক্যাল সুপারিনিটেনডেন্ট এবং যোধপুর রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৪০ সালে শুধু যুদ্ধে পঙ্গু বৃটিশ সৈন্যদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৮৪৫ সালে সিরোহির মহারাজা শিব সিং-এর কাছ থেকে আবু পাহাড়ের কিছু জমি বৃটিশ সরকার লিজ নেয়। উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা। শেষ পর্যন্ত ১৯১৭ সালে বৃটিশ সরকার সিরোহির মহারাজা কেশরী সিং-এর কাছ থেকে প্রত্যেক বছরের জন্য সাতাশ হাজার টাকায় লিজ নেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এই লিজকরণ বাতিল হয়।

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ তাঁর 'পুণ্য তীর্থ ভারত' বইতে আবু পাহাড় সম্বন্ধে বলেছেন, 'আবু পাহাড়ের শুদ্ধ নাম অর্বুদ পর্বত। এই পর্বতের একটি গুহার মধ্যে অর্বুদাদেবী বিরাজমানা (তধ্বর দেবীও বলা হয়)। দেবীর নাম হইতেই পাহাড়ের নাম হইয়াছে অর্বুদা পর্বত। যেমন শরীরের যে কোন স্থানে বর্ধিত মাংস পিণ্ডকে আব (টিউমার) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ রাজস্থানের মরুভূমিতে এই পাহাড়টি অস্বাভাভাবিক ভাবে সৃষ্ট হইয়া আবের মতো দেখায় বলিয়াই ইহার নাম অর্বুদ পর্বত একথা প্রচলিত আছে।'

এ সম্বন্ধে তিনি যে পৌরাণিক কাহিনী বলেছেন তা নিম্নরূপ ঃ—

পুরাকালে আজকের মত এখানে কোন পাহাড় ছিল না — ছিল সমতল ভূমি, মুনি ঋষিদের তপোভূমি। পাহাড়ের তিন মাইল দূরে ছিল বশিষ্ঠ দেবের আশ্রম। বশিষ্ঠ দেবের একটি প্রিয় কামধেনু ছিল। একবার কামধেনু নন্দিনী আশ্রমের কিছু দূরে একটি গর্তে পড়ে যায়। নন্দিনী তখন বললেন, "প্রভো, আপনি সরস্বতীর বন্দনা করুন। তিনি আসিলেই আমি উদ্ধার পাইব।

বশিষ্ঠ দেবী সরস্বতীর স্তব স্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। প্রিয় কামধেনুর বিপদ বলে কথা। স্তব স্তুতিতে দেবীও সন্তুষ্ট হলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে এসে প্রবেশ করলেন সেই গর্তে। তাতে নন্দিনী উদ্ধার পেল ঠিক কিন্তু সরস্বতী যে আর উঠতে পারেন না! তিনি ঐ গর্তেই আবদ্ধ রইলেন।

সরস্বতী তখন ঋষিবরকে বললে, " আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। ....হিমালয়ের এক ছেলে এখানে আসিলেই আমি উঠতে পারব।"

এবার মুনিবর হিমালয়ের কাছে সব কথা খুলে বললেন এবং তাঁর এক ছেলের জন্য প্রার্থনা করলেন। একমাত্র ছেলে নন্দিবর্ধন তখন বললো, "প্রভু, আমি আপনার কাজের জন্য প্রস্তুত আছি, তবে আমি পঙ্গু। ....আশ্রমের নিকটে নাগরাজ নামে আমার বিশেষ বন্ধু একজন সদাশয় রাজা আছেন। তাহাকে বলিলেই তিনি আমাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবেন।"

বশিষ্ঠদেব নাগরাজকে সব কথা জানালেন। তখন নাগরাজ বললেন, "ঋষিবর! আপনার কাজের জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত। আমি হিমালয়ের ছেলেকে কাঁধে করিয়া......গর্তে প্রবেশ করিলে সরস্বতী উদ্ধার হইবেন নিশ্চিন্ত কিন্তু তাহাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং আমার অবর্তমানে আমার ছেলেদের একটা ব্যবস্থা করিলেই আপনার আদেশ পালন করিতে পারি।"

তখন বশিষ্ঠদেব বললেন, হ্যাঁ, তাহার ব্যবস্থা হইবে।"

নাগরাজ হিমালয়ের ছেলেকে নিয়ে সে গর্তে প্রবেশ করলেন। সরস্বতী মুক্ত হলেন। তিনি কচ্ছ ভুজের দিকে সমুদ্রাভিমুখে চললেন। পথে মরুভূমির বালুকারাশিতে মিশে গেলেন। সে নিদর্শন আজও বিরাজমান। এদিকে গর্ত ভরে গিয়ে শুধু নন্দিবর্ধনের নাকটি দেখা যেতে লাগল। সে নাকই বর্তমান আবু পাহাড়।

দিব্যাত্মানন্দ আরো বলেছেন "নাগরাজের মৃত্যু হওয়ায় পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে নাগরাজের চারি পুত্রকে একটি যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ত্বে দীক্ষিত করিয়া ঐ নূতন রাজ্য তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। পরিহর, শোলাঙ্কি, পরমার, চৌহান—এই চারিজন নাগরাজের পুত্র। ইহারাই রাজপুতগণের পূর্বপুরুষ। ইঁহারা ঋষিদের যজ্ঞানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই অগ্নিকুল নামে পরিচিত।'

কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। স্বামী দিব্যাত্মানন্দের পুরাণ কাহিনীতে অচলেশ্বর শিবের কথা বলা হয়েছে! সুতরাং আরো কিছু কথা স্মরণ করা যাক্ —

ঋষিগণতো জপতপ নিয়ে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন কাটার পর তাঁরা একদিন বশিষ্ঠদেবকে বললেন — এখানে ফুলফলের বড়ই অভাব, আমরা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করব ঠিক করেছি।

বশিষ্ঠদেব আবু পাহাড়কে ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ করে তুললেন। ঋষিদের তাতেও মন ভরল না। তাঁরা বললেন — এখানে শিব নেই। হিমালয় শিবালয়, আমরা সেখানেই যাব।

অগত্যা বশিষ্ঠ মহাদেবের কাছে গেলেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব বললেন — আমি যখন তাণ্ডব নৃত্য করব, তখন আবু পাহাড়ের চূড়ায় আমার পায়ের গোড়ালি পড়বে।

'এই ঘটনা হইতেই অচলেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা হয়। নাম হইতেই ঐ স্থানের নাম হয় অচলগড়। ইহা আবু বাজার হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।'

অর্বুদ পর্বতের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

তের

১০ই অক্টোবর।

ঘুম ভেঙেছে সকাল ছটায়। কিন্তু চরাচর এখনও অন্ধকারে ডুবে আছে। চারদিকে পাহাড় থাকায় এখানে সূর্যের আলো আসতে দেরী হয়।

কিন্তু সকাল বেলার আবু পাহাড়কে দেখে আমার মন নেচে ওঠে। আমি মনে মনে তর্জমা করে চলেছি।

আবু পাহাড়।

আবু পাহাড়! আবু পাহাড়!
তুমি কত কাল থেকে এখানে আছো?
তোমার পাতা ঝরা সকালে
এবং নির্মল আকাশ তলে
দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখি —
কুহু ডাকা পাখি
এবং তুমি অনন্তকাল ধরে থাকবে
আর হাতছানি দিয়ে পথিককে ডাকবে।
তোমার ছায়া শীতল,
শৈল শহরে আমি এসেছি,
শিশির সিক্ত আকাশ তলে
বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি
শুধু এক বুক বিশুদ্ধ বায়ু নিয়ে
অমল হব ব'লে।

মাউন্ট আবুতে চেক আপ টাইম সকাল নয়টা। অর্থাৎ দিনের যে কোন সময় থেকে পরদিন নয়টা পর্যন্ত একদিনের কড়ি গুণতে হয়। সুতরাং ঘর আটকিয়ে রাখার দরকার নেই, কেননা আমি মাউন্ট আবু দর্শন করে আরাবল্লীর উত্তর - পশ্চিমাংশ দর্শন করবো।

সকাল আটটায় চেক আপ করে পথে বেরিয়ে পড়ি। লাগেজ থাকবে লক্ষ্মণ গেস্ট হাউসের অফিস ঘরে।

সকালের জলযোগ সেরে আসি ট্যুরিস্ট সেণ্টারে। আমি প্রথম শিফটে টিকিট কেটেছি। কিন্তু ট্যুরিস্ট সেন্টারে এসে মত বদলে ফেলি। কেননা সান - সেট্ পয়েন্টের মনোরম দৃশ্যটি উপভোগ করতে না পারলে যে মন ভরে না! সুতরাং দ্বিতীয় শিফটে সীট বদলে নিই। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াই নক্কি লেকের পাড়ে।

নক্কি লেক

নক্কি মানে নখ। নখে কাটা হ্রদ। কথিত আছে হাজার বছর আগে এখানে বকশাকালী নামে কোন এক দৈত্যের ভয় থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মানুষ দেবতাদের ভজন পূজন করতে থাকে। তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ শুরু করলেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ মাউন্ট আবুতে ধ্যানমগ্ন হলেন। মাউন্ট আবুকে বাসোপযোগী করার জন্য দেবগণ তাঁদের হাতের নখ দিয়ে একটি জলাশয় খনন করলেন। সে জলাশয় আস্তে আস্তে জলে পরিপূর্ণ হয়। পরবর্তীকালে এ জলাশয়ই নখি লেক বা নক্কি লেক নামে পরিচিত হয়।

হিন্দুদের কাছে এই হ্রদ পবিত্র। এইলেকে স্নানের ব্যবস্থা আছে। স্নান ঘাট, গান্ধীপার্ক হ্রদের সৌন্দর্যের মাত্রা বাড়িয়েছে। ঘন সবুজের মাঝখানে নক্কি লেককে অপূর্ব দেখায়। চারদিকের সবুজ গাছ গাছালি এবং তিনদিকে পাহাড়। এ সৌন্দর্যকে বহুগুণে বর্ধিত করেছে। শুধু পূর্ব দিক সমতল। দু'শ বছর আগেও সরোবরটি প্রায় ৩৬৫ মিটারের মত লম্বা ছিল। আর আজ সরোবরটি প্রায় আটশ মিটার হয়েছে। এই আশ্চর্য সুন্দর স্থানটি দেখে ফার্গুসান বলেছেন.— 'ভারতে এমন স্থান অদ্বিতীয়।'

কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকলেও এখানকার বৈচিত্র্যময় পরিবেশ নিঃসন্দেহে মনোমুগ্ধকর। কেননা এখানে প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে উঠেচে দুটি রক — টড রক এবং নান রক। হনুমান পয়েন্টেও এমন আর একটি চিত্তাকর্ষক রক আছে।

পথের কথায় আসি। কেননা আমার মাউন্ট আবু দর্শন সুরু হয়ে গেছে একটু আগেই।

লেকের পূর্ব পাড়ে দেখছি একটি পার্ক। পার্কটি রকমারি গাছগাছালি এবং ফুলের বাগানে সজ্জিত। ঢুকলাম পার্কে। পার্কের মধ্যমণি একটি সিমেন্টের স্তম্ভের উপরে আসনে বসা সিমেণ্টের তৈরি পরী। পরীর চারদিকে চারটি ইঁদুরের মত কিম্ভূতাকার প্রাণী। তারা লেজ গুটিয়ে হাঁ করে আছে। যেন পরীর সৌন্দর্যে মোহাচ্ছন্ন। অথবা পরীকে পাহারা দিচ্ছে। পরী কি বন্দিনী? এ জন্যই কি তিনি বিরস বদনে বসে আছেন! শিল্পীর অপূর্ব কীর্তি। লেকের মধ্যে

সম্প্রসারিত আর একটি পার্ক। প্রথম পার্কের সহযোগী। পুল পেরিয়ে আসতে হয় এ পার্কে। এই দ্বীপ পার্কে রয়েছে বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তি। স্বামীজী পদ্মাসনে বসে আছেন। তিনি ধ্যান করছেন। স্বামীজীর মাথার উপর মন্দির। অনেকটা ছত্রীর মত । মন্দিরের বেদীর ডানদিকে স্বামীজীর আসনের নিচে মার্বেল পাথরে খোদাই করা একটা বাণী —

HE ALONE LIVES WHO
LIVES FOR OTHERS THE
REST ARE MORE DEAD
THAN ALIVE.

পার্ক থেকে ফিরে আসি গান্ধী পার্কেএ।

গান্ধী পার্ক

আবু বাজারের সঙ্গে এবং নক্কী লেকের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে গড়ে তোলা হয়েছে একটি পার্ক। ১৯৫৩ সালে আবু মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশান এই সুন্দর পার্কটি তৈরি করেন। পার্কটি লেকের পাড়ের সঙ্গে যুক্ত দ্বীপভূমিতে গড়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র দেহভস্ম এই হ্রদের জলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য পার্কটির নাম হয়েছে গান্ধী পার্ক। পার্ক থেকে চারদিকের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখায়।

পার্কে সুন্দর গাছগাছালি এবং ফুলের বাগান। তার ফাঁকে ফাঁকে বসার ব্যবস্থা। পুরো পার্ক জুড়ে যেন মেলা বসেছে। পার্কের মধ্যে জলের ফোয়ারার ব্যবস্থা আছে। ছায়া শীতল জায়গায় বসে আছেন পর্যটকরা। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফটোগ্রাফাররা। পর্যটকদের ছবি তুলে সে দিনের মধ্যেই পর্যটকের ঘরে পৌঁছে দেবেন

সবচেয়ে উঁচু ফোয়ারাটি জলের মধ্যে। ৭০ থেকে ৮০ ফুট উঁচুতে জল ছিটাবার ক্ষমত আছে ফোয়ারাটির। ফোয়ারাটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে পনের হাজার টাকা। পার্কের লাগোয়া ঘাট থেকে নৌকা এবং শিকারা বিহারের ব্যবস্থা আছে.

প্রচুর ট্যুরিস্টদের সমাবেশ হয়েছে। হ্রদের মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট দ্বীপ। অনেক পর্যটব শিকারা নিয়ে জলবিহার করছেন। হ্রদের মধ্যে উঁচুতে জল ছিটিয়ে যাচ্ছে ফোয়ারা। যার জল বিহার করছেন তারা ফোয়ারার চারদিকে জড় হয়েছেন আর পার্ক থেকে তাদের আত্মীয় স্বজন ক্যামেরা বন্দী করছেন এই সুন্দর দৃশ্য।

অনেকে খাবার ছড়িয়ে দিয়েছেন হ্রদের জলে। মাছগুলো খাবারের লোভে জড় হয়েছে। আমি চারদিকের চালচিত্র দেখে এবং ছবি তুলে কিছু সময় কাটিয়ে দিলাম আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে।

উঠে আসি উপরের দিকে। গান্ধী পার্কের উপরের দিকে রয়েছে মহাবীর পিলার, চার ফুট উঁচু এবং চার ফুট চওড়া এই পিলারের এক দিকে জৈন প্রতীক আর তিন দিকে ভগবান মহাবীরের শিক্ষার বিষয় উৎকীর্ণ।

এখান থেকে লেকের দক্ষিণ পাড় ধরে চলেছি পশ্চিম দিকে। পাকা রাস্তা। রাস্তার ডানদিকে লেক, বামদিকে পাহাড়। ছায়া-শীতল পথে এগিয়ে চলেছি। হ্রদটি অনেকটা ইংরেজি ইউ আকারে খনন করা হয়েছে। পথের পাশে অনেকটা উপরে একটি বহু পুরানো মন্দির। এটি শ্রী রঘুনাথজীর মন্দির। লেকের দক্ষিণ -পশ্চিম কোণে এই বিখ্যাত মন্দিরটি অবস্থিত।

রঘুনাথজীর মন্দির

চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈরি মন্দির। বৈষ্ণবাচার্য স্বামী রামানন্দ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের আঙ্গিনায় রামানন্দজীর চরণচিহ্ন খোদিত।

প্রণাম করে ঢুকি মন্দিরে। সুন্দর মন্দির। শ্বেত পাথরের তৈরি এবং কারুকার্যখচিত। নাটমন্দিরের ছাদটি ১০টি পাথরের স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারুকার্য খচিত স্তম্ভ। স্তম্ভের গাত্রে ফুলের টব এবং পদ্মফুল খোদাই করা। প্রতি দুই স্তম্ভের উপরের দিক আর্চ করা যেন দরজার উপরিভাগ। আর্চের দুদিকে হাতির শুঁড় দিয়ে ধরা।

গর্ভমন্দিরের দরজাটিও কারুকার্য করা। রূপোর পাতে মোড়া। দরজার সামনে রূপোর রেলিং। গর্ভমন্দিরের ভিতরে ঘণ্টা ঝুলছে। সামনে দানপাত্র। শ্রী শ্রী রঘুনাথের অপূর্ব মূর্তি। কষ্টি পাথরের তৈরি। রূপোর সিংহাসনে আসীন শ্রীরঘুনাথজীর মাথার উপর রূপোর মুকুট শোভা পাচ্ছে। তিনি সোনা এবং রূপোর অলঙ্কারে ভূষিত। ফুলের গন্ধে মন আবিষ্ট হয়। রঘুনাথজীকে প্রণাম করে, প্রসাদ, নিয়ে বাইরে আসি।

রঘুনাথজীর উত্তর দিকে আর একটি মন্দির। হনুমানজী মন্দির।

হনুমানজী মন্দির

খুব পুরানো মন্দির। মন্দিরের কারুকার্য তেমন আড়ম্বরপূর্ণ নয়। কিন্তু ভক্তি উপাচারে এবং পূজার্চনায় যথেষ্ট গরীমাময়। হনুমানজীর পূজা না করে যে রঘুপতি - রাঘব - রাজা - রামের কৃপা পাওয়ার উপায় নেই। মন্দির গাত্রে খোদাই করা হনুমানজী ভক্তের পূজা পাচ্ছেন।

প্রণাম করে দাঁড়াতেই পূজারী এগিয়ে এসে অমৃত বারি এবং দানাদার প্রসাদ বিতরণ করলেন।

পথের কথা।

নেমে আসি পথে। শুনেছি কাছেই রয়েছে রামকুণ্ড এবং কিছু গুহা। ১৮৫২-৫৪ সালে, আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ রামগুহাতে ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

হ্রদের দক্ষিণ থেকে ঘুরে পশ্চিম দিকে আসি। দক্ষিণ - পশ্চিম কোণে রয়েছে রাবণ ঘাট। রাবণ ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। হ্রদের চারদিক সিমেন্টে বাঁধানো এবং পাশে পাকা রাস্তা। উত্তর দিকে গণেশ রোড চলে গেছে গণেশ পয়েণ্ট পর্যন্ত। সেখানে রয়েছে গণেশজীর মন্দির। ঐ দিকে না গিয়ে এগিয়ে চলি হ্রদের উত্তর তীর ধরে।

নক্কি লেকের প্রায় চার দিক আমার ঘোরা হয়ে গেল। বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ্য করেছি টড রকটিকে । সবচেয়ে ভাল দেখায় উত্তর দিকের একটা টিবি থেকে। টিবিতে উঠার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে।

টড রক

প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট একটি পাথর। রঘুনাথজী এবং হনুমানজী মন্দিরের অনেক উপরে পাহাড় চূড়ায় রয়েছে এই পাথরটি।

পাথরটির বৈশিষ্ট্য হল দেখতে অনেকটা কোলা ব্যাঙের মত। যেন লাফ দেবার জন্য তৈরি হয়েছে। হাঁ করা মুখ। এক্ষুনি বুঝি নখি লেকে ঝাঁপ দেবে! প্রকৃতির কি বিচিত্র সৃষ্টি !

টড রক্ থেকে আরো দূরে রয়েছে নান্ - রক্।

নান্-রক্

নান্ মানে সন্ন্যাসিনী। এ পাথরটির বৈশিষ্ট্য হল দেখতে একজন ঘোমটা পরা খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীর মত। এজন্য নাম হয়েছে নান্-রক্।

নক্কি লেকের চারদিক পরিক্রমা করে খুব ভাল লাগল। ফিরে এলাম আবু বাজারে। ঘুরে ঘুরে দেখছি দোকান পাট। আবু বাজারটি চার ভাগে বিভক্ত —

(ক) মেইন বাজার

(খ) সব্জি বাজার

(গ) নক্কি শপিং সেণ্টার

(ঘ) বাস স্ট্যান্ড।

কেনাকাটার জন্য ভাল ভাল দোকান এবং এম্পোরিয়াম আছে, যেমন—

ফেয়ার পিস এম্পোরিয়াম, রাজস্থান কঙ্গন সেণ্টার, ফ্যাসন ফেয়ার, গ্রামোদ্যোগ গান্ধী হাট, শিল্পী, চাচা - মিউজিয়াম, গুজরাট এম্পোরিয়াম, খাদি ভাণ্ডার, ভারতীয় শাড়ি ভাণ্ডার, কাশ্মিরী কলা উদ্যোগ, রাজস্থান গ্রামোদ্যোগ কলা, বোম্বে টাই সেণ্টার, মীনা বাজার, সরস্বতী শাড়ি সঙ্গম ইত্যাদি।

থাকার জায়গারও অভাব নেই মাউন্ট আবুতে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে—এম — ই — এস এবং রকভিউ বাংলো (পাওয়ার হাউসের কাছে), হলিডে হোম (পুরানো আলোয়ার হাউস), সার্কিট হাউস, ডাক বাংলো শঙ্কর মঠের কাছে), শেখর ট্যুরিস্ট বাংলো(১৭৬ শয্যা) — পেট্রল পাম্পের কাছে, ইয়ুথ হোস্টেল, ধলপুর বাংলো (দুটি সুইট দুটি কটেজ) রিটায়ারিং রুম চারিটি (পুরানো বাস স্ট্যাণ্ড), মিউনিসিপ্যাল রেস্ট হাউস (বাস স্ট্যান্ড),রেলওয়ে ডাক বাংলো, গুজরাট সার্কিট হাউস. ট্রেভর তাল এবং ওরিয়া, ২টি ডাক বাংলো —দিল ওয়ারাতে, সাধনা ভবন (১০০ শয্যা) গোমুখ রোড, ইত্যাদি।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে হোটেল এবং ধর্মশালা।

হোটেল — রাজেন্দ্র, সরস্বতী, নবজীবন, ভারতী, অশোক, হিলটন, সুধীর, সূর্যদর্শন, ভাবনা, চেতন, অম্বিকা, ভগবান, গিরি রাজ, নক্কিলজ, নক্কি বিহার, চরভূজা, লেকভিউ, মাউন্ট, সম্রাট ইত্যাদি।

গেস্ট হাউস — অনিল, লক্ষ্মণ, মিউনিসিপ্যাল, বীণা,। এ ছাড়া ভারত সেবক সমাজ, হোটেল ট্যুরিস্ট ইত্যাদি।

ধর্মশালা — শুরু শ্রী শান্তি সদন (ট্রাস্ট), দুলেশ্বর মহাদেও (ট্রাস্ট), রঘুনাথ, শ্রী বর্ধমান মহাবীর কেন্দ্র, হনুমান আশ্রম, দিগম্বর জৈন এবং জৈন (২টি) — দিলওয়ারাতে, এবং সীতাম্বর জৈন।

পথের কথা।

এখনও অনেক সময় হাতে আছে। দুপুরের খাবার খেয়ে আসি ট্যুরিস্ট অফিসে। বিকেলের ট্যুরের লোকজন আসতে শুরু করেছে। বাসের নাম্বার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা উঠে এলাম বাসে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছেড়ে দিল। এখন আমি ট্যুরিস্ট কোচে মাউন্ট আবু দর্শন করব। অবশ্য আমার মাউন্ট আবু দর্শন সুরু হয়েছে সেই সকালে। এসে থামল ওম শান্তি ভবনের সামনে।

ওম শান্তি ভবন

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে এই আশ্চর্য ভবনটি তৈরি হয়েছে। অনেক বড় হল ঘর। কিন্তু এর ছাদ ধরে রাখার জন্য কোন কলাম নেই। সম্পূর্ণ রূপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চারদিকের পিলারের উপর ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। ভবনটি আধুনিক স্থাপত্য কলার এক বিশেষ নজির।

হলটিতে চার হাজার লোকের বসার সীট আছে। হলের চারদিকে ঘেরা বারান্দা। শান্তিভবনের সামনের দিকে বাগিচা। শ'খানেক সিঁড়িবেয়ে উঠতে হয় হলের বারান্দায়। সিঁড়ির দু'দিকে কেয়ারী ফুলের বাগিচা এবং বিভিন্ন গাছগাছালি গড়ে তোলা হয়েছে। চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশও মনোমুগ্ধকর। পিছনে পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে তোলা হয়েছে ওম শান্তি ভবন।

প্রতি বছর আন্তরাষ্ট্রীয় অধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে এখানে ধর্মীয় জমায়েত হয। সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তগণ এই জমায়েতে অংশ গ্রহণ করেন। এই ধরণেব হলঘব এশিয়ায় পঞ্চম, ভারতে তৃতীয় এবং রাজস্থানে প্রথম।

সারা বছর ট্যুরিস্টগণ আসছেন এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার কুমার ও কুমারীগণ কর্তৃক পরমপিতা পরমাত্মার সম্বন্ধে গূঢ় ধারণা নিয়ে ফিরে যান।

ওম শান্তি ভবন দেখা শেষ।

আমরা ফিরে এলাম বাসে। বাস এগিয়ে চলেছে পাহাড়ি পথ ধরে। মেইন বাজারের উত্তর দিকে অর্বুদা দেবী পাহাড়ের পাদদেশে এসে বাস থামল।

অর্বুদ পাহাড়

সমুদ্র সমতা থেকে পাহাড়ের উচ্চতা ৪২৬৮ মিটার। এই পাহাড় চূড়াতেই রয়েছে অর্বুদা-দেবীর মন্দির। পুরাণে এর উল্লেখ আছে।

সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। বিভিন্ন পাহাড়ি গাছগাছালির সঙ্গে ফলের গাছ আছে। যেমন আম এবং পেয়ারা।

চারশ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হচ্ছে পাহাড়ে। প্রায় দুশ সিঁড়ি ওঠার পর জলতেষ্টা পেয়েছে।

জল এবং ফলের দোকান নিয়ে বসেছে অনেকে। সুতরাং জলতেষ্টা মেটানর কোন অসুবিধা নেই।

মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছি। আর ভাবছি সে বিখ্যাত গুহা আর কত দূর! যেখানে অর্বুদাদেবী বিরাজমানা।

মনে পড়ে স্বামী দিব্যাত্মানন্দের পৌরাণিক কাহিনী

নাগরাজ হিমালয়ের পুত্রকে নিয়ে সে গর্তে প্রবেশ করলেন, যে গর্তে বশিষ্ঠ দেবের প্রিয় কামধেনু পড়ে গিয়েছিল। তারপর কামধেনু নন্দিনীকে উদ্ধারের জন্য সরস্বতী সে গর্তে প্রবেশ করলেন, নন্দিনী উদ্ধার পেল বটে কিন্তু সরস্বতী সে গর্তে আবদ্ধ রইলেন। সরস্বতীকে উদ্ধারের জন্যই নাগরাজ সে গর্তে হিমালয় পুত্র নন্দিবর্ধনকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। আর গর্ত ভরে গিয়ে নন্দিবর্ধনের নাকটি দেখা যেতে লাগল। সে নাকই আবু পাহাড়।

তাহলে সে পাহাড় বেয়েই আমি এগিয়ে চলেছি। অনেক কষ্টে উঠে আসি পাহাড় চূড়ায়। দেখতে পাচ্ছি সেই কাঙ্খিত গুহাটি। উঠে আসি পরম তীর্থে।

অর্বুদা দেবী

হামাগুড়ি দিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকতে হয়। ভিতরে ঢোকার পর অনেকটা প্রশস্ত জায়গা মিলল। ভিতরে মায়ের সামনে প্রজ্জ্বলিত মোমের আলো এই ছাড়া নিয়ন লাইটের আলো। আলোয় দেখা যাচ্ছে গুহাঘরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা। এখানে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করা যাচ্ছে। গুহার ছাদ অনেকটা উপরে।

ভয়নাশিনী মা দুর্গা, নবদুর্গা রূপে মহিষাসুব বধে রত। অভয়রূপিনী, মা অর্বুদা রূপে স্থিত। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার কত রূপ! সিংহবাহিনী মা রূপোর সিংহাসনে উপবিষ্টা। তাঁর মাথার উপরে রূপোর চন্দ্রাতপ।

মা অর্বুদার সামনে তিনটি নারী মূর্তি — রাধা, জয়া এবং বিজয়া।

এই মূহুর্তে মনে পড়ছে দিব্যাত্মানন্দের কথাগুলো। তিনি তাঁর 'পূণ্যতীর্থ ভারত' বইতে আরো লিখেছেন —

'ঋষিগণ অর্বুদ পর্বত শিখরে তপস্যা করিতেন। তাঁহারা বনের ফল-মূলে জীবন ধারণ করিতেন। দৈত্যগণ তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতেন। তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিগণ ······ হোমানল জ্বালিয়া শিবধ্যানে রত রহিলেন। ঐ হোমানল হইতে এক সুপুরুষের আবির্ভাব হইল। ঋষিগণ তাঁহার নাম রাখিলেন—পরিহর। তাঁহাকে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারা কাজ হইল না। পর পর আরও দুই ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহাদের নাম হইল শোলাঙ্কি ও পরমার। ······ কিন্তু তাঁহাদের কেউই ঋষিদের এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইল না।

'উপায়ন্তর না দেখিয়া বশিষ্ঠদেব বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোমানলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে অস্ত্রধারী এক বীরপুরুষ আবির্ভূত হইল। ঋষিগণ তাহাকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া চৌহান নাম করণে শত্রু নিধনে আদেশ করিলেন ও কালিকাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। মা স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং সিংহবাহিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া অভয় বাণী প্রদানপূর্বক তিরোধান করিলেন। মহামায়ার শুভাশীর্বাদে চৌহান দৈত্যগণকে নিহত করিয়া শান্তি স্থাপন করিল। ঐ চার পুরুষের ……বংশধরগণ রাজপুত….আর ঐ দেবীই অর্বুদা দেবী।

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি সিংহবাহিনীরূপী মায়ের রূপ! প্রণাম করি অর্বুদা দেবীকে । তারপর গুহার চার দিকে তাকিয়ে দেখি। অর্বুদা দেবীর ডানদিকে গুহার গায়ে দেবীমূর্তি খোদিত। অর্বুদা দেবীর গুহা থেকে বাইরে আসি। সিঁড়ি পথের শেষ মাথায় একটু উপরে রয়েছে আর একটি মন্দির। এগিয়ে যাই সে দিকে।

এই মন্দিরটি নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। নীলকণ্ঠ মহাদেবকে প্রণাম করে নামতে থাকি। চারদিকে ঘন সবুজ। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের বাস ছাড়া আরো কয়েকটি যান বাহন। যেন সিনেমার পর্দার দৃশ্য। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নেমে আসি পাহাড়ের পাদদেশে।

এখন আমরা যাব বিখ্যাত দিলবারা মন্দিরে। দিলবারা মন্দিরের কথা বলতে গেলে স্মরণ করতে হয় দিব্যাত্মানন্দের কথা। তিনি 'পূণ্যতীর্থ ভারত' বইতে আরো লিখেছেন —

'সেই অবধি পরপর রাজগণ এই আবু পহাড়ে রাজত্ব করিতেছিল। …… অনন্তর তাঁহাদের রাজশক্তির হ্রাস হয়। ......গুজরাতের জৈন ধর্মাবলম্বী রাজার মন্ত্রী এই পার্বত্য রাজ্য অধিকার করেন। মন্ত্রী অর্বুদা দেবী মন্দিরের নিকটে জৈন মন্দির নির্মাণ করিলেন। উহাই বর্তমানে দিলবারা মন্দিব নামে বিখ্যাত। …… '

তাহলে দেখা যাচ্ছে দিলবারা বা দিলওয়ারা মন্দির কাছে পীঠে কোথাও হবে। কিন্তু সে রকম কোন মন্দির কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পথ থেকে কিছুটা উপরে উঠে একটা সমতলে বাস থামল। বাস আর যাবে না। এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে দিলওয়ারা মন্দির পর্যন্ত।

বাস থেকে নেমে হাঁটতে থাকি। সামনে দেখছি একটা সাদামাটা তোরণ। তোরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে না মন্দিরের আড়ম্বরতা কেমন! বাস থেকে নেমেও মন্দির দেখা গেল না। উৎরাই পথে হেঁটে চলেছি। বোঝা যাচ্ছে চারদিকে পাহাড় বেষ্টিত উপত্যকায় দিলওয়ারা মন্দির গড়ে উঠেছে। প্রশ্ন হল এ গোপনীয়তা কেন? স্বাভাবিকভাবে মনে উদয় হয় বিধর্মী শাসকের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ গোপনীয়তা। কেননা মুসলমান যুগে মন্দির ধ্বংস করাই যে তৎকালীন ইসলামিক মৌলবাদীদের নীতি ছিল। সে মন্দির হিন্দুদের হোক, কি জৈনদের হোক। এজন্যই মনে হয় মন্দির নির্মাতারা আড়ালে রাখতে চেয়েছেন। তোরণ পার হতেই গাইড বললেন এখানে পাঁচটি মন্দির আছে। পরেশনাথ বা চৌমুখা মন্দির, পিওলহর, খার্তার বসাহি, বিমলা-বসাহি ও লুনা-বসাহি।

পথের দুদিকে দেখছি দুটি মন্দির। বামদিকের মন্দিরটি চৌমুখা মন্দির। আর ডানদিকেরটি পিওলাহর মন্দির। চৌমুখা মন্দির দেখা যাচ্ছে। আমরা সে দিকে এগোতে থাকি। গাইড

বললেন — এই মন্দির ফেরার পথে দেখবেন, মন্দিরটি পরেশনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

সুতরাং সামনের দিকে এগোতে থাকি। মন্দিরের পথ প্রদর্শকগণও সামনের দিকে এগোবার নির্দেশ দেন। ডানদিকের মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে না। প্রাচীর ঘেরা। আমরা এগিয়ে চলি। সামনে আর একটি তোরণ। তোরণের সামনে মন্দিরের অফিস ঘর। এখানে আমরা জুতো রেখে দিলাম।

বিমল বসাহি

তোরণের পরে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। তার পরেই মন্দির দ্বার। এসে পড়ি মন্দিরের প্রথম অংশে। বিমল বসাহি একটি জৈন মন্দির। অপূর্ব! এতক্ষণ ভাবতেই পারিনি এখানে এমন একটি চমকপ্রদ মন্দির আছে।

এই জৈন মন্দিরটি তৈরি করেছেন রাজা ভীমদেবের মন্ত্রী বিমল শাহি; ইনি গুজরাটের প্রথম শোলাঙ্কি রাজা ভীমদেবের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। ১০৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্দিরটি তৈরি করেন এবং প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

মন্দিরটি তৈরি করতে তখনকার দিনে মোট আঠার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। ১২০০ শ্রমিক দিন রাত খেটে চৌদ্দ বছরে এই অপূর্ব সুন্দর মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ১৫০০ রাজমিস্ত্রী এই কাজে অংশ গ্রহন করেন। সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করেন কীর্তিধর স্থপতি।

বিস্ময়ের ব্যাপার, কি করে এত পাথর আনা হয়েছে ১১২৭ কিলো মিটার দূরের মাকরাণা থেকে !

কেমন করেই বা চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে তোলা হয়েছে? এ এক পরম রহস্য। কেননা সে যুগেতো আজকের দিনের মত বিজ্ঞান এতখানি এগিয়ে ছিল না। বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ আজ অজেয়কে জয় করছে।

হাজার বছর আগে কিন্তু আজকের মত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। তখন বিজ্ঞানের হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা। তাহলে ! কী করে এমন সম্ভব হল? জানি এসব ব্যাপারে ইতিহাস মূক এবং বধির। সুতরাং জানার আকাঙ্খা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।

পূর্বমূখী মন্দির। মন্দিরের এই চাতালটি চৌকো। এখানে রয়েছে কুড়িটি শ্বেত হস্তী। সবই শ্বেত পাথরের তৈরি। হস্তী পিঠে রয়েছে বিমল বসাহির পরিবার পরিজন।

কোথায় চলেছেন তারা?

এ শোভাযাত্রা চলেছে তীর্থ ক্ষেত্রে। সামনে যে মন্দির। প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথকে দর্শন করতে চলেছেন তাঁরা।

কি সুন্দর চিন্তা ভাবনা। প্রতিটি মূর্তি যেমন নিখুঁত তেমনি শ্রীমণ্ডিত। সামনে তোরণ। কিন্তু দেওয়ালে যে ভৈরবের ছবি। হিন্দুর ধর্মীয় চিন্তাধারা জৈনদের ধর্মে প্রভাব বিস্তার করেছিল কি? ভৈরবের হাতে নরমুন্ড, পিছনে ধাবমান কুকুর।

আমাদের গাইড এবং আমার সহযাত্রীগণএগিয়ে গেছেন। সুতরাং এগিয়ে চলি, নাহলে অনেক কিছুই বোঝা যাবে না। মন্দিরের কাছে এসে অবাক হয়ে যাই। সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরের তৈরি মন্দির। নিচে কালো পাথরের চৌকোণা চাতাল। প্রাচীর দেওয়া চাতালের মাঝখানে বিমল-বসাহি।

উঠে আসি মন্দিরে।

মন্দিরের দুটি অংশ। নাট মন্দির এবং গর্ভমন্দির। নাট মন্দিরকে বলা হয় মণ্ডপ। মন্দিরের তিন দিকে ঘেরা বারান্দা। সে কথা পরে। আমরা উঠে আসি মণ্ডপে। মণ্ডপের ছাদ ৪৮টি কারুকার্যময় শ্বেত পাথরের স্তম্ভের উপর স্থিত। এমন অপরূপ কাজ প্রতি স্তম্ভে, ভাবাই যায় না কত নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের ফসল এই সৃষ্টি। আর সিলিং ! মনের সমস্ত মাধুরি উজাড় করে দিয়েছেন শিল্পীগণ। এ যেন দৈব সৃষ্টি ! শিল্পীদের অবদান কত মহৎ এবং উচ্চস্তরের তা চিন্তার অগম্য।

নাট মন্দিরের মাঝখানে রয়েছে আটটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলো জ্যামিতিক অষ্টভুজের সৃষ্টি করেছে। স্তম্ভগুলোর উপরে গোলাকার গম্বুজ গড়ে তোলা হয়েছে। গোলাকার বেষ্টনীর মাঝখানে ঝুলছে একটি দোলক। কি সুক্ষ কাজ দোলকে! দোলকটির মাথা সরু। স্তরে স্তরে সুক্ষ কাজ। লাটিমের মত উপরের দিকটা একটু একটু করে মোটা হয়েছে। পাথরের তৈরি অথচ কি সুন্দর বিন্যাস! গোলাকার বেষ্টনীতে সৌন্দর্যের প্রকাশ। দোলকের চার দিকে বিভিন্ন মূর্তি। মোট ষোলটি মূর্তি।

কি আশ্চর্য সৃষ্টি!

আমরা প্রতিটি মানুষ মোহাবিষ্ট এবং উৎফুল্ল।

স্তম্ভগুলো সমগ্র সিলিংকে এগার ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক অংশে রয়েছে একটি অখণ্ড শ্বেত পাথর। কি অসাধারণ কারুকার্য এই সব পাথরগুলোতে। সব কাজ খোদাই করা। এত মসৃণ পাথর এবং সুক্ষ্ম কাজ, যেন ছাঁচে ঢালাই। কলা এবং স্থাপত্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রতি পাথরে মানুষ, হাতি, পশুপাখি এবং অন্যান্য জীব জন্তুর কোন না কোন কাজ রয়েছে। হাতির মিছিল মনকে দোলা দেয়।

এই সব শিল্পসম্ভারে ভূষিত পাথরগুলোকে ধরে রেখেছে কতগুলো বক্র আলম্ব। আলম্ব গুলো প্রতি স্তম্ভ শীর্ষ থেকে প্রসারিত। এক একটি স্তম্ভ থেকে চারটি আলম্ব প্রসারিত হয়ে আছে। প্রতি আলম্বে সুক্ষ্ম খোদাই কাজ। এই আলম্বের মাঝখানে ভগবতীর দশরূপ খোদিত। ভগবতী বা মহাবিদ্যা জ্যোতি বা জ্ঞানের আকর। অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করাই তো তাঁর মন্ত্র। মন্দিরই সে মন্ত্র দানের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। সুতরাং ভগবতীর চিত্রায়ন স্বাভাবিক।

নাট মন্দির থেকে আসি গর্ভমন্দিরের সামনে। উপরের ছাদ পিরামিডাকৃতি। নিচে মন্দিরের মাঝখানে শ্বেত পাথরের বেদী। বেদীর উপরে পদ্মাসনে উপবিষ্টা একটি বিশাল মূর্তি। ইনি

প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ। ভক্তদের কাছে তিনি পূজনীয়, দেবতা — মানব দেবতা। মানুষ যখন দেব - দ্বিজের মত গুণ সম্পন্ন হয় তখন তিনি মানুষের কাছেই পূজনীয় —বিগ্রহ স্বরূপ।

আদিনাথজীর দৃষ্টি সামনের ভক্তদের দিকে। যেন কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তদের দেখছেন। উজ্জ্বল তাঁর চোখের তারা। যেন হীরক কিংবা মণি বসানো। পিতলের বিগ্রহ এতই মসৃণ এবং ঝকঝকে যেন সোনার মূর্তি। বেদীর চারদিকে নয়টি শ্বেত হস্তি। ভাবগম্ভীর এবং সুন্দর পরিবেশ। আদিনাথজীকে প্রণাম করি এবং প্রার্থনা জানাই তাঁর নির্দেশিত পথে আজকের রণোম্মাদ মানুষ যেন শান্তির পথ খুঁজে পায়।

মন্দির থেকে আসি বারান্দায়। মন্দিরেব তিনদিকে অর্থাৎ মন্দিরের দিকে, সারি সারি কারু কার্যময় শ্বেতপাথরের স্তম্ভ। সামনের দিক খোলা অর্থাৎ স্তম্ভ ছাড়া আর কিছু নেই। আর পিছনে বারান্দার লাগোয়া ছোট ঠোট কোঠা ঘর। উপরে টানা ছাদ। কুঠরিগুলোব ভিতরে তিন ধাপ বেদীর উপর বসানো আছে জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। মূর্তিগুলোর গঠন এবং প্রতিকৃতি প্রায় একই রকম কিন্তু তাঁদের পায়ের কাছে রয়েছে প্রতীক চিহ্ন। এই প্রতীক চিহ্ন দেখেই বোঝা যায় প্রতিটি মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন তীর্থঙ্করদের। মোট ৫২টি কুঠরি।

বারান্দার সিলিং প্রতিভাধর শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায অপরূপা হয়ে উঠেছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে প্রতিটি চিত্রকলা। জৈন জনশ্রুতি এবং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে। শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য, রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বন গমন, শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন, নৃসিংহদেবের হিরণ্যকশিপু বধ উল্লেখযোগ্য। নকশা, ফুল, মানুষ জীবজন্তু এমনকি জন জীবন যাত্রা কি নেই এই খোদাই শিল্পকলার মধ্যে। বিস্ময়ে হতবাক হই।

কাহিনীর মাহাত্ম্য যেমন রুচিশীল, মনকে নাড়া দেয় তেমনি শিল্পীদের কাজের মুন্সিয়ানা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে—কত বড় শিল্পী ছিলেন তাঁরা। কাজেব মধ্যেয়ই অক্ষয় হয়ে আছেন, শুধু ইতিহাস তাঁদের স্মরণে রাখেনি। মনে মনে ভাবি মাউন্ট আবুতে না এলে এমন অপরূপ সৃষ্টি সম্ভার দেখতে পেতাম না।

প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী দিলওয়ারা মন্দির দেখে অনুপ্রাণীত হয়ে বলেছিলেন—

"I do not think that any Indian should miss paying a visit to these temples They are among the most beautiful sights of this country"

মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে অম্বাজীর মূর্তি। বিমল বসাহি হিন্দু ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রভাব থেকে যায় তাঁর মনে। তাই তিনি অম্বাদেবীর মূর্তি স্থাপন করেছেন বিমল-বসাহি মন্দির চত্তরে।

অম্বাজী মন্দির দর্শন করে আসি লুনা-বসাহি মন্দিরে।

লুনা-বসাহি

এই মন্দিরটি বিমল বসাহির উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। শোলাঙ্কি শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

১২৩১ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি তৈরি হয়। তখনকার দিনে ১২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা খরচ হয়। মন্দিরটি আয়তনে বিমল-বসাহি থেকে ছোট কিন্তু এর সৌন্দর্য বিমল-বসাহি থেকে অধিক এবং অতুলনীয়। বাস্তুপাল এবং তেজপাল মন্দিরটি তৈরি করেন। তাঁরা দুভাই ছিলেন গুজরাটের রাজা বীরধ্বলার মন্ত্রী।

বাস্তুপাল এবং তেজপালের স্বর্গীয় বড় ভাই লুনিগা (Looniga) - র নামে মন্দিরটি খ্যাত। এজন্য নাম হয়েছে লুনা- বসাই। মন্দিরটি ২২তম তীর্থঙ্কর নেমি- নাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

মন্দিরের গঠন শৈলী কম-বেশি বিমল-বসাহির মত তবে এর কারুকার্য আরো বেশি আকর্ষণীয়, সুক্ষ্মতর, সুন্দর এবং মোহময়।

তেজপালের স্ত্রী অনুপমার অনুরোধেই নাকি পাল ভ্রাতৃদ্বয় এই বিষ্ময়কর সৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়েছিলেন। অনুপমা দেবী নিজে শিল্পীদের খাওয়া দাওয়া এবং পরিচর্যা করেছিলেন। তেজপাল স্ত্রীকে খুশি করার জন্য এবং যথার্থ সৌন্দর্য বিকশিত করার জন্য শিল্পীদের খোদাই কাজে বের হওয়া পাথর কুচির (scrap) পরিবর্তে সমান ওজনের রূপো দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। পরিবর্তে শর্ত ছিল শিল্প-সৌন্দর্য পছন্দ হওয়া চাই।

স্বাভাবিক কারণে শিল্পীগণ তাদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করলেন এবং মনের মাধুরী উজাড় করে দিয়ে এই আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টির রূপদান করলেন। বলাবাহুল্য তেজপালের পছন্দ হয়েছিল এই সৃষ্টি কর্ম। সুতরাং গুণমুগ্ধ তেজপাল স্বঘোষিত পুরষ্কার রূপোর পরিবর্তে সোনা দিয়েই শিল্পীদের পুরস্কৃত করেছিলেন। মন্দিরের প্রবেশ তোরণের দুপাশে দুটি কুলুঙ্গি। দেবরাণী এবং জীথানী গোখলা। গোখলা দুটির জন্য খরচ হয়েছিল এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা। গোখলা দুটি কারুকার্য মণ্ডিত।

মণ্ডপের শিল্প কর্ম অতীব সুন্দর। সক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর। চোখ ফেরানো যায় না। বিশেষ করে অষ্ট স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত গম্বুজের দোলকটি। আহা! কি রূপ! কি রূপ! নয়নাভিরাম অর্ধপ্রস্ফুটিত একটি পদ্ম। যেন পদ্মবন থেকে সদ্য তুলে আনা ফুল। পাপড়িগুলো তার স্বচ্ছ যেন কমলেকামিনী জ্যোতি।

গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করা ছাড়া আমার গতি নেই। অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলটি যে নিজেই নিজের তুলনীয়। সুতরাং অর্ধপ্রস্ফুটিত কমলের পাপড়ি কামিনী হয়ে থাকুক চিরকাল আমার কাছে। এত সুক্ষ্ম কাজ! বিশ্বে এর তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। তাই তো ফার্গুসান মন্তব্য করেছেন, 'hangs from the centre more like a lustre of crystal drops than a solid mass of marble

আলম্ব গুলোর উপরে ষোলটি নারীমূর্তি খোদাই করা। চক্রাকারে সজ্জিত থাকার জন্য সৌন্দর্যের মাত্রা আরো প্রকট এবং আকর্ষণ বহুগুণে বর্ধিত। আর এ সবই বিদ্যাদেবীর মূর্তি।

সারা সিলিং জুড়ে শিল্পকলা ছড়িয়ে আছে। সিলিং-এর পাথর; গম্বুজ, গোলাকার বেষ্টনি

এবং স্তম্ভতে লতা পাতা, ফুল, পাখি, জীবজন্তু, এমনকি ব্যবসা-বানিজ্য এবং গোচারণের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। সবই জীবন্ত এবং নিখুঁত। যেন প্রকৃতির নিজহাতে গড়া।

গর্ভমন্দিরে রয়েছে নেমীনাথের বিশাল মূর্তি। নেমীনাথ বেদীর উপরে সমাসীন। শান্ত সৌম্য মূর্তি। বেদীর গায়ে নেমীনাথের প্রতীক চিহ্ন শঙ্খ খোদিত।

মন্দির থেকে আসি বারান্দায়। বারান্দায় উনচল্লিশটি কক্ষ আছে। তীর্থঙ্করদের মূর্তির সঙ্গে দেখার বিষয় মার্বেল পাথরের জালির কাজ। বারান্দার স্তম্ভগুলোতে নেমীনাথের জীবন - কাহিনী উৎকীর্ণ হয়েছে খোদাই কাজের মধ্যে। খোদাই কাজের মধ্যে আছে নেমীনাথের বিবাহ পর্ব যেমন তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয় তেমনি লোক শিক্ষার ব্যাপারও রয়েছে।

গির্ণার রাজকুমারী রাজমতীর সঙ্গে নেমীনাথের বিয়ের ঠিক। তিনি বরবেশে চলেছেন গির্ণার। গির্ণারে পৌঁছেও গেলেন কিন্তু যাওয়া হলনা রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। কেননা পথেই চিত্তের চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন ঘটল।

নেমীনাথজী দেখলেন গির্ণারের রাজপথে এক জায়গায় কিছু গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি কন্যা পক্ষীয় এক জনকে জিজ্ঞেস করলেন—

— গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

— আজ্ঞে রাজ বাড়িতে।

— কেন?

সহাস্য বদনে উত্তর দিলে ঐ কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি।

— আজ্ঞে আপনার বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করা হবে গরুগুলোর মাংস দিয়ে।

নেমীনাথজী শুনেই চমকে উঠলেন।

— ইস্ এতগুলো জীব মারা যাবে আমার জন্য!

নেমীনাথ নিজেকে অপরাধী ভাবলেন। সংসার জীবন যাত্রায় কত অপরাধই না করতে হয়। না, সংসারী হয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে সংসার ত্যাগ করে জীব সেবায় জীবন উৎসর্গ করা অনেক ভাল। মানুষকে ন্যায়ের পথে, ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। সংসারী মানুষদের চেতনায়, ভালবাসা মৈত্রী ও সুন্দরের ভাব জেগে উঠলেই মানুষ তমসাচ্ছন্নতা থেকে আলোর পথে ফিরে আসবে।

নেমীনাথ যেমন ভাবলেন তেমনই করলেন। বরবেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই জৈন ধর্ম ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

আলোর দিশারী, জীব - প্রেমিক নেমীনাথের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসি হাতিশালায়। হাতিশালাটি বিমল বসাহি হাতিশালা থেকে আয়তনে বড় এবং অতীব সুন্দর। দশটি শ্বেত হস্তী বাস্তুপাল, তেজপাল এবং তাদের পরিবার পরিজন ও আত্মীয়দের নিয়ে মন্দিরে চলেছে। ভগবান নেমীনাথকে দর্শন করার জন্য। এখন অবশ্য মূর্তিগুলো আর নেই। বহুকাল অরক্ষিত

থাকার সুযোগে কেউ নষ্ট করে ফেলেছে।

ফেরার পথে দেখলাম পরেশনাথের মন্দির।

চৌমুখা মন্দির :

পরেশনাথের মন্দিরকে চৌমুখা মন্দিরও বলে। কেননা এখানে মূর্তিটির চার মুখ। কিন্তু মূর্তিটি দেখার সুযোগ হল না। সবাই এগিয়ে গেছে। মন্দির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব দেখলাম। তিন তলা মন্দির। অসম্পূর্ণ কাজ। এই মন্দিরেও অনেকগুলো মার্বেল স্তম্ভ আছে। বিমল বসাহি এবং লুনা বসাহির শ্রমিক এবং শিল্পীগণ এই মন্দির গড়েছেন। ঐ মন্দির দুটি গড়ার অবসর সময়ে তাঁরা চৌমুখা মন্দিরের কাজ এগিয়ে নিয়েছেন। তার জন্য শ্রমিক এবং শিল্পীদের আলাদা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি।

দিলওয়ারায় আরো দুটি মন্দির আছে। একটি ঋষভ - দেবজী বা পিত্তল হর মন্দির এবং অন্যটি স্বামীজী বা খার্তার বসাহি মন্দির। পিত্তল হর মন্দিরে ৪.৩২ কুইন্টাল ওজনের পিতলের একটি মূর্তি আছে এজন্য পিত্তলহর বা পিতলের মন্দির নাম হয়েছে। আর মহাবীর স্বামীজী মন্দিরটি চৌমুখা মন্দিরের কাছে। এই মন্দিরটি শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এজন্য এমন নাম।

ব্যস্তবিক পক্ষে বিমল বসাহি এবং লুনা বসাহি মন্দির দুটি দর্শন করলেই দিলওয়ারা মন্দির দর্শন হয়। অথাৎ বেশির ভাগ পর্যটকেরা তাই করেন। গাইডগণও সেভাবে নির্দেশ দেন।

আমরা ফিরে এলাম বাসে।

আমরা এখন যাব অচলগড সেখান থেকে গুরুশিখর। আবু থেকে গুরুশিখরের দূরত্ব ১৫ কিমি। পথে পড়বে অচলগড়। বাস এগিয়ে চলেছে।

আমার মনে পড়ে স্বামী দিব্যাত্মানন্দের সে পুণ্য কাহিনী। আবু পাহাড়ে শিব নেই বলে ঋষিগণ হিমালয়ে যেতে চাইলেন। তখন বশিষ্ঠদেব মহাদেবের কাছে গেলেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব বললেন, "আমি যখন তান্ডব নৃত্য করব, তখন আবু পাহাড়ের চূড়ায় আমার পায়ের গোড়ালি পডবে।"

দিব্যাত্মানন্দ আরো বলেছেন, 'এই ঘটনা হতেই অচলেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা হয়। শিবের নাম হইতেই ঐ স্থানের নাম হয় অচলগড়। ইহা আবু বাজার হইতেই পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।'

অধুনা ট্যুরিস্ট গাইডে বলা হয়েছে অচলগড়, শিব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। আবু থেকে ১০কিমি দূরে অবস্থিত। সেখানে হিন্দু এবং জৈন মন্দির, অচলগড় দুর্গ এবং আরো কিছু দ্রষ্টব্য দেখার বিষয়।

অচলেশ্বর মহাদেব :

৮১৩ খৃষ্টাব্দে তৈরি এই শিব মন্দিরে অন্য শিব মন্দিরের মত কোন মূর্তি নেই। তার পরিবর্তে এখানে আছে একটি গর্ত।

শিবের গোড়ালীর ছাপ।

কিন্তু ট্যুরিস্ট গাইডের মতে বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ। বিশ্বাস করা হয় এই আঙ্গুলের ছাপ পাতাল পর্যন্ত গভীর।

ধরবর্ষা নামে পারমার রাজবংশের শেষ রাজকুমার এ ব্যাপারে অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শিবের গোড়ালির ছাপ বা গর্তটি পাতাল পর্যন্ত গিয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য ঐ গর্তে জল ঢালতে লাগলেন। ছয়মাস ধরে জল ঢালা হল কিন্তু গর্ত আর জলে ভর্তি হয় না।

শিবের মহিমায় অবিশ্বাস!

পশুপতিনাথের কৃপা হতে বঞ্চিত হলেন ধরবর্ষা। এই জন্য পারমার রাজবংশে তিনিই ছিলেন শেষ রাজপুত্র। এই গর্তকে ব্রহ্মখাদও বলে।

শিব মন্দিরের সামনে শিবপার্বতীর মূর্তি বিরাজমান। এছাড়া পিতলের তৈরি নন্দী মূর্তিও দর্শনীয় বিষয়। শিব মন্দিরের কিয়ৎদূরে রয়েছে মন্দাকিনী কুণ্ড।

মন্দাকিনী কুণ্ড :

কুণ্ডটি ৯০০ ফুট এবং ২৪০ ফুট চওড়া। কুণ্ডের জল পবিত্র গঙ্গার জলের মত পবিত্র এবং স্বচ্ছ। এই কুণ্ডকে কেন্দ্র করে একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

পুরাকালে কুণ্ডটি ঘি-তে পরিপূর্ণ ছিল। ঋষিগণ এই ঘি দিয়ে হোম-যজ্ঞ করতেন। প্রতি রাতে তিনজন অপদেবতা মহিষের বেশে এসে ঘি চুরি করত। ঋষিগণ অতিষ্ঠ হয়ে পারমার রাজা আদিপালের শরণাপন্ন হলেন। আদিপাল এক রাতে তীর-ধনুক হাতে পাহারায় বসলেন এবং ঘি চুরির মুহুর্তে তিনটি মহিষকে একই তীরে হত্যা করলেন।

ঋষিগণ তিনটি মহিষ এবং তীর ধনুক হাতে আদিপালের মূর্তি স্থাপন করলেন অন্য অপদেবতাদের ঘি চুরি থেকে নিরস্ত করার জন্য। সে ঘটনার সাক্ষী এই মূর্তিগুলো আজও বিরাজমান।

মানসিং-এর সমাধি :

সিরোহির রাজা মানসিংকে মন্দাকিনী কুন্ডুর কাছে কয়েকজন রাজপুত হত্যা করেন। অচলেশ্বর মন্দিরের নিকট মানসিং-এর সমাধির উঁপর ছত্রী গড়ে তোলা হয়। ১৬৩৮, খৃষ্টাব্দে এই ছত্রীটি তৈরি হয়।

স্বামীর মৃত্যু-শোকে রাজা মানসিং-এর পাঁচ মহিষী স্বর্ণেস্বর শিব-মন্দিরে সতী হন। এ ঘটনা জনমানসে স্মরণ করানোর জন্য গড়ে তোলা হয় মূর্তি। রাজা মানসিং এবং তাঁর পাঁচ মহিষী স্বর্ণেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনারত অবস্থায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, রাজা মানসিং-এর সমাধিস্থলে।

আর আছে ভরত-হরি-গুহা এবং রেবতী কুণ্ড। এছাড়া উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য অচলগড় দুর্গ।

অচলগড় দুর্গ :

অচলেশ্বর মন্দির থেকে দক্ষিণ দিকে উঠে গেছে। একটি পথ বিখ্যাত অচলগড় দুর্গ পর্যন্ত।

সমুদ্র সমতা থেকে সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচুতে ৯০০ খৃষ্টাব্দে পারমার রাজত্বে দুর্গটি তৈরি হয়। তারপর মেবারের রাণা কুম্ভ ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে এর সংস্কার করেন। দুর্গটি আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুর্গটির চারটি প্রবেশ তোরণ। গনেশ পোল, হনুমান পোল, চম্পাপোল এবং ভৈরব পোল। হনুমান পোলের কাছে রয়েছে কাপুর সাগর এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। হনুমান পোল থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় আরো উপরে সেখানে রয়েছে জৈন মন্দির। এ ছাড়া সাভন-ভাদোন ট্যাঙ্ক, ওখা প্যালেস দেখার বিষয়। মহারাণা কুম্ভের পত্নী ওখারাণীর নামে খ্যাত প্যালেস। এসব দেখা হলে আমরা যাব গুরুশিখরে ।

গুরুশিখর ঃ

আবু থেকে ১৮কিমি দূরে অবস্থিত। চূড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে। সমুদ্র সমতা থেকে গুরুশিখরের উচ্চতা ৫৬৫৩ ফুট । আবু পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরতো বটেই এমনকি হিমালয় থেকে নীলগিরির মধ্যে সর্বোচ্চ শিখর।

এখানকার অন্যান্য শিখরগুলি হল — অচলগড় ১৩৮০মি (৪৫২৮ফুট), দিলওয়ারা ১৪৪২ মি (৪৭৩১ ফুট), এবং ঋষিকেশ ১০১৭মি (৩৩৩৮ফুট)। গুরুশিখরে স্বামী দত্তাচার্যের একটি মন্দির আছে। গুরু দত্তাচার্যের নামানুসারে শিখরটির নাম গুরুশিখর। সেখানে গুহার মধ্যে গুরু দত্তাচার্য এবং রঘুনাথজী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী রামানন্দের পদচিহ্ন বিরাজমান।

দত্তাচার্যের মায়ের নামেও একটি মন্দির আছে। সে মন্দিরে ১৪১১ সালে নির্মিত একটি প্রকাণ্ড ঘন্টা আছে যার ধ্বনী বহুদূর থেকে শোনা যায়। গুরুশিখর থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব সুন্দর দেখায়। ভাবনায় ছেদ পড়ল। কেননা দেখছি আমাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দেখছি আরো কয়েকটি বাস। অবাক কাণ্ড ! পাহাড়ের পথেও কি জ্যাম হয়! দেখছি পুলিশ পিছনের বাসগুলোকে আরো পিছনে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে।

আমাদের গাইড নেমে খোঁজ খবর নিলেন। সামনে একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। এজন্য বাসগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাসের ড্রাইভার এবং গাইড কিছু একটা আলোচনা করলেন। শলাপরামর্শের পর পাশের সামান্য একটু জায়গায় লতাগুল্ম মাড়িয়ে বাস পিছনের দিকে ঘুরে গেল। আমরা ভাবলাম অন্য কোন পথ ধরে বাস অচলগড়ে যাবে। কিন্তু বাস এসে দাঁড়াল পাণ্ডব ভবনের সামনে। হায়! যাওয়া হলনা অচলগড়ে।

পাণ্ডব ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় এবং মিউজিয়াম (Brahma Kumaris World Spiritual University and Museum).

প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

১৯৩৭ সালে আন্তরাষ্ট্রীয় আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে এই সংস্থার প্রথম স্থাপন হয় হায়দ্রাবাদে (পাকিস্থান) সিন্ধুতে। পরবর্ত্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ সালে ভারতে পর্বতরাজ আবু রাজস্থানে স্থিত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সারা বিশ্বে সাত শতাধিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই

কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শত শত ব্রহ্মকুমারী ও ব্রহ্মকুমার বিশ্বের সকল আত্মাকে দিব্য ও সৌম্য রাজমার্গে নির্ভয়ে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দান করছেন।

পরম পিতা পরমাত্মার সহিত সকল আত্মার মঙ্গল মিলন তথা স্নেহ সম্পর্ক যুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করে, বিশ্বের সকল মানব চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল করে এই সৃষ্টিতে পুনরায় সত্যযুগের স্থাপন করাই এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লক্ষ্য।

এতদ্‌উদ্দেশ্যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান, সহজ রাজযোগ, দিব্যগুণের ধারণা এবং ঈশ্বরীয় সেবা এই সকল শিক্ষার দ্বারা নারীকে লক্ষ্মী এবং নরকে নারায়ণ রূপে গুণান্বিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

বর্তমান যুগে মানব চরিত্র গঠনের উদ্যোগী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াস এবং কর্মকাণ্ড দেখে খুব ভাল লাগল। সমাজ জীবনে বহুভাবে জর্জরিত, তিতিবিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত, সুখবর্জিত মানুষ স্বস্তি শান্তি পেতে পারে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে। এটুকু সান্ত্বনা।

পরমাত্মা শিবের তিন রূপ-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শঙ্কর, সুক্ষ্ম আকারী দেবতার মাধ্যমে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ সাধন কর্তব্য করে চলেছেন। এই অভিজ্ঞান কথা ও চিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট। মিউজিয়ামে ঘুরে ঘুরে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডারের উৎস প্রত্যক্ষ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। মানুষ এখানে আসুক, চৈতন্য পরিপূর্ণ করুক এইটুকু আশা।

পথের কথা।

ফিরে আসি বাসে। বাস এসে দাঁড়াল পোলো গ্রাউন্ডের পাশেই সান-সেট পয়েণ্ট রোডে। এখান থেকে আমরা হেঁটে যাব সান-সেট পয়েণ্টে। নির্দিষ্ট স্থানে বাস দাঁড়িয়ে থাকবে। সান-সেট দেখা হয়ে গেলে যাত্রীদের নক্কিলেকের পাড়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর বাস ফিরে যাবে বাস স্ট্যাণ্ডে। যারা নক্কিলেকে থাকতে চাইবেন থেকে যাবেন। কেননা নক্কিলেকই শেষ দ্রষ্টব্য। এখান থেকে যে যার জায়গায় ফিরে যাবেন। বাস অপেক্ষা করবে না।

আমরা হেঁটে চলেছি সান-সেট পয়েণ্টের দিকে। চড়াই পথ। অনেকে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। সান-সেট পয়েণ্টে নেমে পড়বেন। ফিরবেন হেঁটে। আমরা হেঁটে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের শেষ সীমানায়। এখানেই সান-সেট পয়েণ্ট।

সান-সেট পয়েণ্ট ঃ

সান-সেট রোড ধরে এগিয়ে গেলে পথের শেষ সীমানায় দেখা যায় পাহাড় হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। কিছু পাহাড়ি টিলা। তারপর গভীর জঙ্গল। ডান দিকে কিছু দূরে আর একটি নিচু পাহাড়। এছাড়া সামনের দিকে প্রায় হাজার ফুট গভীরতায় সমতল অরণ্য ভূমি।

পথের ডান দিকে পাহাড় টিলায় ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি। আমার আগে অনেক দর্শক এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মাঝখানে জায়গা করে বসে পড়ি। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু জঙ্গল আর অরণ্যভূমি। প্রায় হাজার ফুট নিচের অরণ্যময় প্রান্তরকে সবুজ গালিচার মত দেখাচ্ছে। সামনে যতদূর চোখ যায় একই দৃশ্য।

নিচে পথের দিকে তাকিয়ে দেখি পিল পিল করে লোক আসছে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য। সামনে অর্থাৎ দিগন্তরেখার উপরে সূর্য দিনান্তের স্তিমিত আলো ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

আমি যে পাহাড় চূড়ায় আছি তার সিঁড়ি এবং পাহাড় চূড়ায় সর্বত্র লোকে গিজ গিজ করছে। আমাদের সামনে প্রায় একশ ফুট নিচু টিলাতেও একই অবস্থা। সবাই সে মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছে। এরই মধ্যে পাহাড় চূড়ায় ফ্লাসের আলোয় উৎসবের মেজাজ এসে গেছে।

অপূর্ব দৃশ্য।

লাল অগ্নিপিণ্ডটি একটু একটু করে অদৃশ্য হতে চলেছে।

সোনালী আলো বিস্তৃত বনাঞ্চলে ঠিকরে পড়ছে। যেন লাল আবির ছড়ানো হচ্ছে মুঠো মুঠো করে। মাঝে মাঝে জলাশয়গুলো থেকে ঠিকরে পড়া আলোতে চক্ চব্ করছে। প্রতি- ফলনের জন্য ক্যামেরার লেন্সে তিনটি সূর্য দেখা যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সূর্যের এক তৃতীয়াংশ অদৃশ্য । সবাই ক্যামেরা বন্দী করছে এই দুর্লভ দৃশ্য। আলো অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। আলোকপিণ্ডের অর্ধেক মেঘের ফাঁক দিয়ে সার্চলাইটের মত আলো ছড়াচ্ছে। নিচে চরাচরে যেন কেউ নীল ছড়িয়ে দিয়েছে। নীলাচ্ছন্ন চরাচর।

সূর্যের তিন ভাগ অদৃশ্য। পশ্চিমাকাশে যেন লাল আবির ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুঠো মুঠো সোনা রোদ্দুর। সূর্য প্রায় ডুবে গেছে। সে এক অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। আলো - আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আমরা সে দৃশ্য উপভোগ করছি।

ইতোমধ্যে নিচের দিক থেকে এগিয়ে চলেছি। এই পাহাড় থেকেও মানুষের ঢল নামছে। গোধুলিবেলায় নেমে আসি পথে।

পোলো গ্রাউণ্ডের কাছে ফিরে আসি। আমাদের বাস এখনো দাঁড়িয়ে আছে। না, বাসে উঠলাম না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি। মাউন্ট আবু দর্শনের শেষ দ্রষ্টব্য নক্কিলেকে। নক্কিলেক আমার দেখা। সুতরাং আমি বাজারের দিকে এগিয়ে চলি। পথের জন্য কিছু ফল এবং শুকনো খাবার দরকার। তাছাড়া শেষবারের মত আবু বাজারটা আর একটু ঘুরে দেখি।

চৌদ্দ

আমি রাতের বাসে চলে যাব যোধপুর। সে কথা এখন থাক। কেননা আরাবল্লীর উত্তর-পশ্চিম অংশের দ্রষ্টব্যগুলো পরে আলাদা ভাবে বলব।

এখন আসি পিছনের কথায়। এগার থেকে চৌদ্দ এই চার দিনে যোধপুর, জয়শলমীর এবং বিকানীর ঘুরে ফিরে আসি জয়পুরে। আমি যাব সোয়াই মাধোপুরে। জুনাগড় থেকে সোয়াই মাধোপুরের সরাসরি কোন বাস নেই।

জুনাগড় বাস স্ট্যান্ড থেকে চৌদ্দ তারিখ রাত ৯টায় বাস ছাড়ল। সকাল পাঁচটায় পৌঁছো জয়পুরে। জয়পুর থেকেও সরাসরি কোন বাস নেই সোয়াই মাধোপুরে। ট্রেনে যাওয়াই উত্তম কিন্তু বাসপথের আকর্ষণই আলাদা। নতুন নতুন জায়গার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সুতর লোকাল বাসেই চাপলাম। যাব টঙ্ক (Tonk), টঙ্ক থেকে সোয়াই মাধোপুর।

১৫ই অক্টোবর।

আজ ভোর হয়েছে। পথে জয়পুরের পর চকসু, চকসুর পর নিবাই। নিবাইতে ভোরে আলো ফোটে। ইতিমধ্যে ৫৪ কিমি পথ অতিক্রম করেছি। নিবাই থেকে টঙ্ক ৫০ কিমি নিবাই এবং টঙ্কের মাঝামাঝি সাক্ষাৎ হয় বনাস নদীর সঙ্গে।

বনাস নদীর সঙ্গে প্রথম সখ্যতা হয়েছিল মাউন্ট আবুর পাদদেশে। পুরানো বন্ধুর সা দেখা হতে মনে অর্নিবচনীয় আনন্দ লাভ করি। নদী এখানে ক্ষীণকায়া। কিন্তু অনেক চওড়া। দুদিকে চড়া পড়ে গেছে — বালি আর বালি। কিন্তু বর্ষার সময় নদী যে খ স্রোতস্বিনী হয় তা বোঝা যাচ্ছে। দুদিকে চড়া পড়া বালি এবং বোল্ডারগুলোকে ক্ষয় কা তার অস্তিত্বের প্রমাণ রেখেছে।

টঙ্ক থেকে বাস পূর্বদিকে চলেছে। এক ঘণ্টার মত লাগল উনিয়ারা পৌঁছাতে। ট থেকে উনিয়ারা ৩৯ কিমি এবং উনিয়ারা থেকে সোয়াই মাধোপুর ৩৭ কিমি। টঙ্ক এ পৌঁছাই সকাল সাতটায়। সুন্দর জায়গা টঙ্ক (Tonk). ডানদিকের পাহাড় চুড়ায় দেখা পাচ্ছি টঙ্ক রাজপ্রাসাদ। কিন্তু এখানে হল্ট করার উপায় নেই। কেননা সময় সংক্ষেপ। ট থেকে বাসে চড়ে সোয়াই মাধোপুর এলাম সকাল সাড়ে দশটায়।

সোয়াই মাধোপুর :

বোম্বে-দিল্লী রেলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন। রাজ্যের রাজধানী জয়পুর থে রেলপথে দুরত্ব ১৬২ কিমি। বোম্বে থেকে ১০২৭ কিমি এবং দিল্লী থেকে ৩৬১ কি দূরত্ব। এখান থেকে কোটার দূরত্ব ১৭০ কিমি। এ পথের ট্রেনগুলো যথাক্রমে দেরাদু এক্সপ্রেস, ফিরোজপুর জনতা এক্সপ্রেস এবং ফ্রন্টিয়ার মেল। জয়পুর থেকে ট্রেন ছা ১০.১০, ১৩.৩০, ১৮.৫৫, এবং ২২.১৫ মিনিটে।

সড়ক পথে সোয়াই মাধোপুর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যুক্ত যেমন জয়পুর (ভা দোসা)- ১৬৪ কিমি, (ভায়া টঙ্ক)- ১৮০ কিমি, এছাড়া বুন্দি ১২৩ কিমি, চিতোরগড় ২৮ কিমি, ভরতপুর (ভায়া হিন্দন) - ২৩২ কিমি , (ভায়া দোসা) -২৩৩ কিমি, আলোয়ার ২২৮ কিমি এবং আজমীর -২৫২ কিমি।

সোয়াই মাধোপুরে থাকার ব্যবস্থাও ভাল আছে।

হোটেল। রণথম্বোর রোডে ঝুমার বাওরি (RTDC) টেলি ২০৪৯৫, কামধেনু (RTDC টেলি—২০৩৩৪, সোয়াই মাধোপুর লজ টেলি—২০৫৪১, অঙ্কুর রিসর্ট টেলি—২০৭৯

অনুরাগ রির্সট টেলি—২০৪৫১, হামির ওয়াইল্ড লাইফ টেলি—২০৫৬২, পিঙ্ক প্যালেস (টেনক রোড) টেলি—২০৭২২, টাইগার মুন টেলি—৩২ (ভায়া সেরপুর)।

বজরাই রোড — পরীক হোটেল (বাস স্ট্যান্ডের কাছে), টেলি নং ২০৬১৯, হোটেল আশা (বাস স্ট্যান্ড), স্বাগতম টেলি নং ২০৬০১, বিশাল টেলি নং ২০৬৯৫, মানস সরোবর, চৌখানি টেলি নং ২০৫২৩, টাইগার হেভেন টেলি নং ২০৭৯৩।

এছাড়া রয়েছে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম টেলি নং ২০২২২, বাঙ্গের ধর্মশালা — রেলস্টেশান টেলি নং২০২২২, এবং গৌতমাশ্রম। গৌতমাশ্রমের পাশে গুরুদোয়ারা। পি ডবলু - ডিতে ডাক বাংলো ইত্যাদি।

পথের কথায় আসি।

গৌতমাশ্রমে স্নান করে বিশ্রাম করি। তারপর পথে বেরিয়ে পড়ি রণথম্বোর ন্যাশানাল পার্কে যাবার ব্যবস্থা করতে। মাধোপুর কলেজের পাশে রয়েছে বনবিভাগের অফিস। এখান থেকেই বন্য প্রাণী সংরক্ষিত অঞ্চলে ঘোরার ব্যবস্থা করা হয়। জন প্রতি ৬৫ টাকা এবং ক্যামেরার জন্য লাগে ২ টাকা। সকাল ৬.৩০ থেকে ১০টা এবং বিকাল ২.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা, দু-শিফ্‌টে বন ঘুরে দেখার ব্যবস্থা আছে।

বিকালের শিফ্‌টে টিকিট কেটে খাওয়া দাওয়া সেরে নিই। তারপর বিশ্রাম । বিকালে যাব রণথম্বোর ন্যাশানাল পার্ক বা অভয়ারণ্যে।

দুপুর দুটার সময় বনবিভাগের অফিসে হাজির হই। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে Jungle king একটা বড় আকারের মেটাডোর। দুদিকে বসার সীট। উপরের দিক খোলা এবং লোহার বেড়।

আড়াইটার সময় জঙ্গলের রাজা আমাদের নিয়ে রওয়ানা হল। বাঁদিকে ট্যুরিস্ট অফিস ছাড়িয়ে বাহন এসে দাঁড়াল R.T.D.C- র হোটেল কামধেনুতে। এখান থেকে ৯ জন এবং একটি হোটেল থেকে ৮ জন, মোট কুড়ি জন যাত্রী নিয়ে মেটাডোর ছুটে চলেছে জঙ্গলের. দিকে।

তিন চার কিমি পথ এগোবার পর পথের বাম দিকে পড়ল একটি জলাশয়। জলাশয়ে কুমীর আছে। ড্রাইভার হাত দিয়ে ইশারা করল, একটি কুমীর জলাশয়ের ধারে রোদ পোহাচ্ছে। কুমীরটি অর্ধেক জলে এবং অর্ধেক স্থলে।

গাড়ী চড়াই পথ ধরে এগোতে থাকে। দুপাশে জঙ্গল, বিভিন্ন গাছগাছালী। মেটাডোর রাজপথ ছেড়ে ঘন জঙ্গলের পথে এগোতে থাকে। সামনে পাহাড়। দুদিকে বিশাল মহীরূহ এবং ঘন জঙ্গল। বানর এবং বনময়ূর নজরে পড়ছে। পাহাড়ের ঝর্ণাধারা পথের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বামদিকের নালায়। কেননা আমাদের বাহন বামদিকের কোল ঘেঁষে এগোচ্ছে।

প্রায় ৭০০ ফুট উঁচুতে দুর্গের পাদদেশে উঠে এলাম। দুর্গের কথা এখন থাক। দুর্গের পাদদেশে একটু সমতল জায়গা। ডানদিকে দুর্গে ওঠার পথ। বামদিকে প্রাচীর ঘেরা তোরণ। তোরণ দিয়ে আমাদের বাহন ঢুকে পড়ল জাতীয় উদ্যানে।

রণথম্বোর ন্যাশানাল পার্ক

এটি অভয়ারণ্য। বিন্ধ্য পর্বতের প্রায় চারশ কিমি জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে অভয়ারণ্য। অভয়ারণ্যটিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। কোর জোন ২৮৪ বর্গ কিমি এবং বাফার জোন ১০৮ বর্গ কিমি।

১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে এই বিরাট এলাকা রণথম্বোর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি হিসাবে পরিগণিত হয়। ১৯৭৪ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আসে। আর ১৯৮১ সালে ঘোষিত হয় জাতীয় উদ্যান হিসাবে। ব্যাঘ্র প্রকল্প হলেও ১৯৭২ সালে ছিল মাত্র ১৪টি বাঘ। তারপর বেড়ে ক্রমে বর্তমানে ২৫টি বাঘ আছে।

কোরজোনের মধ্যেই বাঘের বসবাস। বন দর্শনের জন্য ৫০-৬০ কিমি পর্যন্ত ঘোরার অনুমতি দেওয়া হয়। এই অরণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানুষ এবং গাড়ির চলাচল সত্ত্বেও বাঘ বিরক্ত হয় না। স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সুতরাং জীপ মেটাডোরে ঘুরে বাঘ দেখা খুব আনন্দের বিষয়।

বাঘ ছাড়া এই জাতীয় উদ্যানে নীলগাই, চিঙ্কারা, সম্বর, চিতল, শুকর, বনময়ুর, লেঙ্গুর এবং বনবিড়াল দেখা যায়। এছাড়া লেকে কুমীর, জঙ্গলে এবং গাছে গাছে পাখি বনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। হায়না খেঁক শেয়াল এবং চিতা বাঘও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

নভেম্বর থেকে মে মাস অরণ্য দর্শনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়। পহেলা অক্টোবর থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত দর্শকদের জন্য জাতীয় উদ্যান খোলা থাকে।

পথের কথা।

বনবিভাগের গাড়িতে অভয়ারণ্য দর্শন করতে এসেছি। বনবিভাগ থেকে একজন গাইডও দেওয়া হয়েছে।

উদ্যানে ঢুকেই গাইড নিয়ে এলেন একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের কাছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে বটবৃক্ষের ঝুরি ছড়িয়ে আছে। গাইড বললেন, বটবৃক্ষটি বয়সের দিক থেকে ভারতে দ্বিতীয়। প্রথমটি কোলকাতায় আর তৃতীয়টি মাদ্রাজে। এই প্রাচীন বটবৃক্ষটি পদম তালাত বা পদম লেকের পাড়ে যোগী মহল গেস্ট হাউসের পাশে অবস্থিত।

আমাদের বাহন পদম তালাতের তিনদিক ঘুরে জলাশয়ের বড় বড় ঘাসের সামনে এসে দাঁড়াল। এই জলাধরে ২৫০ টির বেশি কুমীর আছে। আসার পথে দেখেছি কয়েকটি কুমীর রোদ পোহাচ্ছে। সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে তালাতের পাড়ে উঠে লাইন দিয়ে রোদ পোহায়।

পদম তালাত-এর জলে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে হরিণ। আমরা তারিয়ে তারিয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছি। সিং-ওয়ালা হরিণ (পুং) এবং মেয়ে হরিণ (চিতল) প্রচুর দেখা যাচ্ছে। গাইড বলেন এ হরিণ শেরদের প্রিয় খাদ্য। সাধারণতঃ একটা নিলগাই ভক্ষণ করতে একটি বাঘের দু সপ্তাহ চলে যায়। আর একটি হরিণ চলে এক সপ্তাহ। বাপরে!

— তাহলে কত হরিণ মারা পড়ছে!

— জন্মাচ্ছেও সে রকম।

দেখছি সম্বর, চিতল এবং বনময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছে গাছে বানর ডালে ডালে ঝাল খাচ্ছে এবং পাখ পাখালি ঝাপটা ঝাপটি করছে। একটি পেঁচার চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। বনের চালচিত্র দেখতে দেখতে এগোচ্ছি।

পদম পুকুর ছাড়িয়ে রাজবাগের তীরে আসি। এখানে থক (Thok) নামে একটা গাছের পরিচয় পেলাম। থক বাঘের পক্ষে উপকারি গাছ। রাজবাগের তীরেও দেখছি প্রচুর হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছে গাছে বানর ঝোলাঝুলি করছে।

রাজবাগ থেকে এলাম দুধ পুকুর (Milk Talab)-এ। এখানকার চালচিত্রও প্রায় একই রকম। অনেকটা জলে নেমে হরিণ ঘাস খাচ্ছে। জলাশয়ের পাড়ে কয়েকটি শুয়োর দেখা গেল। এই জলাশয়গুলোতে বনের সমস্ত পশু জল খেতে আসে। এ জন্য ঘুরে ঘুরে জলাশয়ের পাড়ে এবং জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে যদি শেরকে দেখা যায়! না জঙ্গলের রাজা শের এখন পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না।

গাড়ি এদিক ওদিক ঘুরছে। আমরা সমানে দৃষ্টি রাখছি। যদি বাঘ নজরে পড়ে। বিভিন্ন ট্যুরিস্ট এবং গাইড প্রায়ই জঙ্গলে দর্শকদের নিয়ে আসে। স্বাভাবিক কারণে পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। দুটো গাড়ি পরস্পরের কাছাকাছি এলে ড্রাইভার এবং গাইডদের মধ্যে ভাব বিনিময় হয়। জানতে চাওয়া হয় শেরের দেখা মিলল কিনা! না, শেষ পর্যন্ত ঠাকুর নজরে পড়ল না। আমরা প্রায় হতাশ।

এমন সময় একটা টিলার উপরের দিকে উঠতে উঠতে লক্ষ্য করেছি কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। দর্শকবৃন্দ একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাকিয়ে আছেন। আমাদের গাড়িও এসে তাদের সঙ্গী হয়। মুহূর্তে খবর রটে গেল — শেরের দেখা মিলেছে। কে আগে দেখে কে পরে দেখে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বনের মধ্যে এতগুলো মানুষের মনে খুশির জোয়ার এসেছে। সবার চোখে মুখে আনন্দ। কিন্তু দেখা পাওয়া যে মুসকিল।

পাহাড়ের বুকে এদিকে একটি টিলা ওদিকে একটি টিলা মাঝখানে গভীর খাদ। শার্দুল মহাশয় ওপারের টিলায় শুয়ে আছেন। এপারের টিলায় কয়েকটি বন্য গাছ। গাছের ঢাল এবং পাতার জন্য আড়াল হয়ে গেছে এজন্য দেখা যাচ্ছে না। নইলে শার্দুল মশাই ওধারের টিলায় খোলা জায়গাতেই শুয়ে আছেন। একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে জঙ্গলের রাজকে ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে অনেক গাড়ি জড় হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ড্রেস পরা বাচ্চারাও আছে। সব গাড়ি থেকেই পরস্পরের প্রতি অনুরোধ আসছে একটু আগু-পিছু সরে বনের রাজাকে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। হচ্ছেও তাই। পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা সত্ত্বেও সবার দেখা সম্ভব হচ্ছে না। গাড়ির সংখ্যা যে অনেক। এ ওর কাছে ক্যামেরা বাড়িয়ে দিচ্ছে একটা

শট তুলে দেওয়ার জন্য। তাতে কি আর মুসকিল আসান হয়। ফলে ফিস ফিস কথাবার্তা ছাপিয়ে একটা গুঞ্জন উঠল। গাইডদের অনুরোধ আর কোন কাজে আসেনা।

একটা কলরবের সৃষ্টি হল। হয়তো শার্দুল মহাশয়ের কানেও তা পৌঁছে গেছে। তিনি যে মুখ তুলে এদিকে তাচ্ছিল্য ভরে তাকিয়ে আছেন তা দেখেই বোঝা যায়।

অবাক কাণ্ড! — এরা কারা?

শার্দুল মহাশয় যেন আমাদের করুণাই করলেন। ছবি তোলার হুড়োহুড়ি, সঙ্গে ফ্লাস। গাইডের চাপা ধমক — ফ্লাসে ছবি তুলবেন না। বনের নীতি মেনে চলুন। জঙ্গলের রাজাকে কোন রকম উত্যক্ত করা চলবে না।

জঙ্গলের রাজা একটুখানি তাকিয়ে আবার আয়েস করে ঘুমোচ্ছেন। কাত হওয়া থেকে একটুখানি চিত হয়ে শুলেন। তারপর কিছু একটা যেন মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখলেন আমাদের দিকে। ভাবটা যেন — এসব বালখিল্যের দল কি করছে! তারপর আড়মোড়া দিয়ে ভেঙে দাঁড়ালেন।

আ! কি রূপ!

পড়ন্ত বেলায় আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখছি। কালো এবং লাল ডোরা কাটা রূপ। কি এল মনে! হঠাৎ একটা হুঙ্কার ছাড়লেন — গগন ভেদি হুঙ্কার। কিছু বলতে চাইলেন কি বনের রাজা? আমরা কিন্তু ধন্য। বনের রাজাকে দেখতে পেলাম প্রাকৃতিক পরিবেশে। বনের রাজা কি মনে করে মন্থর গতিতে হেলে দুলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমরা তৃপ্ত। এবার আমাদের ফেরার পালা। অভয়ারণ্য দর্শন শেষ। গাড়ির কনভয় একে একে পদম তালাতের দিকে এগিয়ে চলেছে। তারপর অভয়ারণ্যের গেটের বাইরে এসে পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলে। এখন উৎরাই পথ। কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড় থেকে অবতরণ করি। জঙ্গল পেরিয়ে এসে পড়ি রাজপথে। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে এসে পৌঁছাই সোয়াই মাধোপুর।

আজকের মত ভ্রমণ শেষ।

১৬ই অক্টোবর।

আজ যাবো রণথম্বোর দুর্গটি দেখতে। দুর্গ গতকালই দেখা হয়ে যেত যদি ভোরে সোয়াই মাধোপুর এসে পৌঁছাতাম।

যাই হোক সকাল সাতটায় পথে বেরিয়ে পড়ি। স্টেশানের বাইরে থেকে ট্রেকার যাচ্ছে রণথম্বোর দুর্গে। স্টেশন থেকে দুর্গের দূরত্ব ১৪ কিমি। স্থানীয় লোকজন গণেশজীর পূজো দিতে যান দুর্গে। ট্রেকার দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ড্রাইভার নেই। প্রায় আধঘন্টা হয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ড্রাইভারকে পেলাম।

— কি ভাই ট্রেকার ছাড়তে দেরী হচ্ছে কেন?

— যাত্রী হচ্ছে না বলে।

— সাতজন যাত্রী তো হয়ে গেছে।

— বারজন না হলে পোষায় না।

শেষ পর্যন্ত তেরজন যাত্রী হল। ট্রেকার ছেড়ে দিল। দুর্গের পাদদেশে এসে পৌঁছাই সকাল ৮.১০ মিনিটে।

রণথম্বোর দুর্গ

বিন্ধ্য পর্বতে জঙ্গল পরিবেশে গড়ে উঠেছে দুর্গ। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রায় ৭০০ ফুট আর সমুদ্র সমতা থেকে ১৫৭৯ ফুট উঁচুতে অবস্থান করছে দুর্গ। পঞ্চম শতাব্দীতে চৌহান রাজপুত মহারাজা জয়ন্তের হাতে তৈরি।

পাহাড়ের চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। ইতিহাস বিখ্যাত দুর্গটি কারো কারো মতে ৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তৈরি। এর বুরুজ এবং গম্বুজগুলো আকর্ষণীয়। দুর্গটি বহু যুদ্ধের ক্ষত নিয়ে আজও কোন মতে টিকে আছে। পৃথ্বীরাজ চৌহানের দৌহিত্রের আমল থেকে এর হাত বদল হতে থাকে।

১২৫৩ খৃষ্টাব্দে বলবন দুর্গটি আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য হননি। রাজা হামীরের সময় দুর্গটি পরিপূর্ণতা লাভ করে এজন্য দুর্গটিকে হামীরের দুর্গও বলে। ঈর্ষাকাতর জালালুদ্দিন ১২৯০ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ করেও ফিরে যেতে বাধ্য হন। হামীরের পর দুর্গ মুসলিম শাসকের হাতে যায়।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে আকবর রণথম্বোর দুর্গ অধিকার করেন। তিনি দুর্গের মধ্যে মসজিদ স্থাপন করেন। আর রাজা হামীরের সময় অনেকগুলো মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ভক্তদের পদধ্বনিতে দুর্গ আজও মুখরিত।

রঘুনাথজী, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং গণেশজীর মন্দির রাজা হামীরের সময়ে প্রতিষ্ঠা হয়। হামীরের রাজপ্রাসাদ, রাণীমহল আজও অক্ষত। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে গণেশজী কল্পতরু — প্রত্যহ বহু মানুষ গণেশজীকে পূজো দিতে আসছেন। ভাদ্র মাসের গণেশ জনম চতুর্থী উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে মন্দিরের সামনে।

পথের কথায় আসি।

আমার সতীর্থগণ চলেছেন গণেশজীর পূজা দিতে। তাদের লক্ষ্য একটাই, পূজা দেওয়া। আমার লক্ষ্য একটা দুর্গ দেখা। গণেশজীর মন্দির পর্যন্ত যতটা সম্ভব দেখে নিচ্ছি। বাকিটা ফেরার পথে দেখব।

পাহাড়ের উপরিভাগে কোথাও সিঁড়িপথ। কোথাও বা মেঠো পথ। পথের ধারে জঙ্গল এবং ঝোপঝাড়। তৃতীয় তোরণের আগে পড়ল রঘুনাথজী মন্দির। মন্দিরে এখন আর কিছুই নেই। পূজো পার্বন হয় বলে মনে হল না। নিত্য পূজা কেইবা দেবেন।

এক সময়ে দুর্গে মানুষ বাস করত তখন সবই হত। এখন যে কেউ নেই। তাছাড়া বহিরাগত ভক্তগণ আসেন গণেশজীর পূজা দিতে।

এর পর পড়ল হামীর মহল। মহলে তালা ঝুলছে। প্রশস্ত লন। এক কালে অনেক কিছুই ছিল। এখন আর নেই। ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে পুরো দুর্গই গবেষণার বিষয়।

পুকুর পাড়ে রয়েছে একটি সাইনবোর্ড।সাইনবোর্ডের নির্দেশ অনুসারে এগিয়ে চলি, লক্ষ্মী - নারায়ণ দিগম্বর জৈন মন্দিরের দিকে। মন্দিরটি বন্ধ। ফিরে আসি পূর্বস্থানে। এগিয়ে যাই কালী মন্দিরের পথ ধরে। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে পথ। চড়াই পথ পেরিয়ে আসি মন্দিরের সামনে।

মন্দিরের সামনে বসে আছেন তিনজন সাধু। ধুনি জ্বলছে মন্দিরের সামনে। ধুনির আগুনে গরম হচ্ছে ত্রিশূল এবং একটা বড় চিমটা। মন্দিরে মায়ের মাথার দুদিকে মুক্ত কেশ। গলায় ফুলের মালা। মাকে প্রণাম করে ফিরে আসি রাণীদের পুকুর পাড়ে। পুকুর পাড় ধরে এগিয়ে চলি। কয়েকটি গৃহের ধ্বংসাবশেষ পার হতেই দেখি একটি মাজার। মাজারের তালা বন্ধ। ভিতরে অবহেলায় পড়ে আছে তিনটি সমাধি। বাইরে কিছুই লেখা নেই, কার সমাধি। কয়েকটি কুকুর বিচরণ করছে এখানে। তাদের সাবধানে এড়িয়ে চলি।

সামনে দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের পতাকা পত পত করে উড়ছে।

গণেশজীর মন্দির

বহু পুরানো মন্দির। অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি বলে অনেকে মনে করেন। মন্দিরকে কেন্দ্র করে কিছু দোকানপাট বসেছে। কয়েক ঘর বসতি আছে। পাহাড়ের আঁকে বাঁকে হয়তো আরো বাড়ি ঘর আছে। বোঝা যাচ্ছে না। গণেশজীর পূজার নৈবেদ্য লাড্ডু. মিঠাই, প্যাড়া, গজা, নারকেল,ফুলের মালা এবং ধূপ - ধুনো প্রায় দোকানে দেখা যাচ্ছে।

খোলা সমতল জায়গায় মন্দির। কিন্তু অনেকটা উপরে মন্দিরের চাতাল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দির তোরণে। প্রবেশ তোরণ দিয়ে ঢুকে দেখি চৌকোণা চাতাল। চাতালের চারদিকে প্রাচীর বেষ্টনী।

সামনের প্রচীরে প্রবেশ তোরণ। পিছনের প্রাচীরের সঙ্গে মন্দির। সামনের প্রবেশ পথ ছাড়া তিনদিকে মন্দির ব্যতীত থাকার ঘর। মন্দিরের কর্মচারী এবং মন্দির পরিচালকদের থাকার ঘর। এমনকি বহিরাগত ভক্তদের বিশ্রামাগার। সবই মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে। সাড়ে নয়টা বাজে। পূজা চলছে।

পূজারী ছাড়া আরো দুজন সাধু ব্যক্তি পূজার কাজে ব্যস্ত আছেন। এসব কিছু ছাড়িয়ে আমার নজর যায় শ্বেত পাথরের সিংহাসনের দিকে। গণেশজীর শ্বেত পাথরের মূর্তি। মাথার উপর রূপোর মুকুট। গণেশজীর ডানে ঋদ্ধি অর্থাৎ শুভ এবং বামে সিদ্ধি অর্থাৎ লাভ। মূর্তি দুটোর শুধু মুখ দেখা যাচ্ছে। বাকি অঙ্গ কাপড় ঢাকা। তাঁর দু'পাশে এবং মাথার উপরে রূপোর ছাতা।

একজন দুজন করে প্রচুর ভক্ত পূজোর ডালি নিয়ে এসেছেন। স্থানীয় ভক্তদের কাছে গণেশজী জাগ্রত দেবতা। অনেকে মানত করেন। মানত ছাড়াতে পূজো দেন।

এখানে কোথাও গুপ্ত গঙ্গা আছে। ভাবলাম খোঁজ খবর নিয়ে ঘুরে আসি। এলাম মন্দিরের বাইরে। দেখি দুজন মেম সাহেবকে নিয়ে দুজন পুলিশ এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। কৌতুহল বেড়ে যায়। তাদের পিছন পিছন ফিরে আসি মন্দিরে। সবর্ত্রই দেখছি বিদেশী পর্যটকদের কদর বেশি।

পুলিশের নির্দেশ মত মেমসাহেবগণ জুতো খুলে মন্দির চত্তরে ঢুকলেন। পূজো এখনও চলছে। একজন বিদেশীনী মন্দিরে পূজোস্থল থেকে কিছুটা দূরে করজোড়ে স্তবের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। কি জানি তার মনে কি আছে! আর একজন গণেশজীকে দেখছেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়ানর পর তারা বাইরে আসেন। আমিও বাইরে আসি। মন্দিরের সামনে রাস্তার ওপারে দেখছি একটা সাধারণ বাড়ি। সাধারণ গৃহস্থ। বাড়ির সামনে মিঠাই লাড্ডুর দোকান। জল তেষ্টা পেয়েছে। ভাবলাম লাড্ডু খেয়ে জল খাব।

খালি বেঞ্চ। তাতে বসে পড়ি। বাড়ির মালিকের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ খুঁজি। তার নাম পিলাল। কিন্তু বেশি কথা বলার সুযোগ হল না। পিলালের পূর্ব পুরুষ দু'টাকার মাস মাহিনায় মহারাজার অধীনে কাজ করতেন। তখন থেকেই তারা এখানে ঝুপড়ি বেঁধে আছেন। এখন তাদের নিজস্ব বাড়ি। তার অবস্থাও ভাল। তিনটি মহিষ আছে। মহিষগুলোর দুধ দুইবার জন্য তিনি এখন ব্যস্ত।

গুপ্ত গঙ্গার কথা পাড়তেই হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন — অনেকটা দূর যেতে হবে। এপর্যন্ত বলে তিনি মহিষের পরিচর্যায় উঠে গেলেন। কেননা তার মহিষগুলো বাড়ি ফিরে এসেছে। কেউ মহিষের বাচ্চা ধরেছে। কেউ দুধের পাত্র আনছে। দেখছি পুরো পরিবারই মহিষের পিছনে ছুটা - ছুটি করছে। দুধেল মহিষ। একসঙ্গে সবকটার দুধ দুইতে হবে।

কি আর করা যাবে।

আমি পিলাল মহাশয়ের কন্যার হাতে লাড্ডুর দাম দিয়ে উঠে পড়ি। গুপ্তগঙ্গা থাক। ফিরে চলেছি, কেননা আমার সহযাত্রী দুজন পূজো দিয়ে ফিরে চলেছেন। এদের সঙ্গেই যে আমায় ফিরতে হবে। ফেরার পথে দরগা এবং বাদল মহল দর্শন করি।

তৃতীয় তোরণের আগে একটি পথ চলে গেছে দরগার দিকে। দরগাটি তৈরি করেন সম্রাট আকবর। সুন্দর একটি তালাত। তার উত্তর পাড়ে দরগা। দরগায় অনেকগুলো সমাধি। প্রায় ধ্বংসের মুখে।

ফিরে আসি তালাতের স্নান ঘাটে। জীর্ণ ঘাট। কিন্তু ছায়া - শীতল জায়গা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই। তালাত এর পশ্চিম পাড়ে কোন এক বন্দুক বাজ পাখি শিকার করছে।

ফিরে আসি রাজপ্রাসাদের সামনে। যদি কোন ফাঁকফোকর দিয়ে ভিতরটা দেখতে পাই। দেখছি গণেশজী মন্দিরে যে দুজন মেমসাহেব গিয়েছেন তারা এখানেও এসেছেন। তাদের জন্য প্রাসাদের দরজা খোলা হয়েছে।

ছুটে যাই যদি এ সুযোগ নিতে পারি।

কিন্তু হায়!

রক্ষী রুখে দাঁড়ালেন।

— না ভিতরে যাওয়া চলবে না।

— কেন? ঐ দুজন বিদেশী পর্যটকতো ঢুকেছেন।

— তাদের ঢোকার পারমিশান আছে, আপনার নেই।

কি আর করা যাবে। পাঁচটা টাকা বার করে বলি,

— আপকা বখশিষ, আপ পারমিশান দিজিয়ে।

— নেহি।

ওরেব্বাস! এ দেখছি একেবারে যুধিষ্ঠির!

রক্ষী মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলাম বিদেশী পর্যটকদের কদর কতখানি! রক্ষীর সঙ্গে কথার ফাঁকে ভিতরটা চোখ বুলিয়ে নিই। অনেক জীর্ণ প্রাসাদ। মাঝখানের চৌহদ্দির মধ্যে জঙ্গল। মেমসাহেব দুজন বাইরে দাঁড়িয়ে প্রাসাদ দেখছেন। প্রাসাদের লনে কিছু ফুলের চাষও হয়েছে।

রাজপ্রাসাদ এবং রাণীমহল দেখা হল না। দেখা হল না অতিথি আবাস জরোয়ানওয়ালা। ফিরে আসি পাহাড়ের পাদদেশে। দুর্গের সিঁড়ি পথ এবং অভয়ারণ্যে প্রবেশ তোরণের মধ্যে অনেকখানি প্রশস্ত এবং সমতল জায়গা। আমার সঙ্গী দুজনকে দেখছি বসে আছেন। তাদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারি কয়েকজন এখনও ফেরেননি। দু এক জন থেকে যাবেন এদিকেই তাদের আত্মীয় বাড়িতে।

বসে আছি। যাত্রী না হলে ট্রেকার ছাড়বে না। ইতিমধ্যে অনেকগুলো গাড়ি এসেছে। প্রাইভেট কার। পূজো দিয়ে তারা ফিরেও যাচ্ছে। কিন্তু একটা কারেও ফেরার সুযোগ পেলাম না। আমার তেমন একটা তাড়াও নেই। ট্রেন সেইবিকেল বেলা। বিকেল চারটার দিকে সোয়াই মাধোপুর থেকে জয়পুরের উদ্দেশ্যে একটা ট্রেন ছাড়ে।

এই প্রশস্ত স্থানে রয়েছে একটি বটগাছ। বটের ছায়ায় একটি চায়ের দোকান এবং এর বিপরীতে উঁচু চাতালে রয়েছে খান দুয়েক শুকনো খাবারের দোকান। কেউ রাত্রি বেলা এখানে থাকে না। বেচা কেনা সেরে বাকি মাল নিয়ে বাড়ি চলে যায়। পরের দিন সাজিয়ে গুছিয়ে দোকানীরা আবার বসে।

বটগাছে থাকে অনেকগুলো বানর। পর্যটকগণ খাবারের দোকান থেকে খাবার কিনে বানরকে দেয়। বানরগুলো খাবার নেবার জন্য গাছ হতে নেমে আসে। শুরু হয়ে যায় খাবার ধরার প্রতিযোগিতা, খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি। বানরগুলো খাবার নিয়ে টানা হেঁচড়া করে। ডালে ডালে লাফালাফি করে। এসব দেখে দর্শকরা মজা পায়। অনেকক্ষণ বসে এসব চালচিত্র দেখলাম।

বাবুদের সঙ্গে এসেছে একটা ছেলে। সে গণেশজী মন্দিরে যায়নি। সে বাবুদের গাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ও সঙ্গে করে অনেকগুলো যবের রুটি এনেছে। ও মাঝে মাঝে একখানা রুটি ছোঁড়ে, অমনি বানরগুলো ডাল-পালা কাঁপিয়ে হুড়-মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাবারের লোভে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে লাঠি নিয়ে তাড়া করে। বানরগুলো যে যেখান দিয়ে পারে — দে ছুট।

আবার খাবার দেয়। বানরগুলো আবার আসে। ছেলেটি যথারীতি তাড়া করে। বানর পালায়। এভাবে ছেলেটি এবং বানরগুলোর মধ্যে লুকোচুরি খেলা হয় অনেকক্ষণ ধরে। বানরগুলো যে ভয় পায় এমন নয়। ছেলেটি একদিকে বানরের পিছনে ছুটলে অন্য বানরগুলো গাড়িতে উঠেই খাবারের খোঁজ করে।

এমনি জোর কাণ্ড কারখানা দেখলাম প্রায় ঘণ্টা খানেক। এতক্ষণেও কোন ট্রেকারে পুরোপুরি যাত্রী হয়নি। কেউ যেতে রাজি হয়না। শেষ পর্যন্ত আমরা ঠিক করলাম পায়ে হেঁটে পাহাড়ের নিচে গিয়ে বাস ধরব।

হাঁটতে শুরু করি। কিছুটা হাঁটার পর একটা ট্রেকার এগিয়ে এল। সুতরাং জনাদশেক যাত্রী নিয়েই ট্রেকারটি সোয়াই মাধোপুর পৌঁছাল। আমি ট্যুরিস্ট অফিসের সামনে নামলাম। প্রয়োজনীয় কাজ সেরে বারটায় পৌঁছালাম গৌতমাশ্রমে। তারপর স্নান খাওয়া• এবং বিশ্রাম।

বিকাল সাড়ে তিনটায় সোয়াই মাধোপুর রেলস্টেশনে পৌঁছাই। বিকেল চারটায় ট্রেন ছাড়ল জয়পুরের উদ্দেশ্যে। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় রেলপথের দুদিকে মাঠের সবুজ ফসল এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। মাঝে দুটো পাহাড় চূড়ায় রাজবাড়ি দেখা গেল। রাজপুতানা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি ছিল। সুতরাং এখানে রাজবাড়ির অভাব নেই। বাড়ির চারদিকের উঁচু প্রাচীর দেখে সহজে চেনা যায় রাজবাড়ি। সন্ধ্যা সাতটায় এসে পৌঁছাই জয়পুর।

১৭ই অক্টোবর।

আজই রাজস্থান ছেড়ে যাব। আজকের অনেক কথাই আগে বলে নিয়েছি পঞ্চম পরিচ্ছেদে। ১০ই অক্টোবর আবু পাহাড় থেকে গিয়েছিলাম আরাবল্লীর উত্তর-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ মরুভূমি অঞ্চলে। ১১ থেকে ১৪ তরিখ চারদিন ছিলাম ওখানে। সেখান থেকে ১৫ই অক্টোবর রণথম্বোর এসে পৌঁছাই এবং রণথম্বোর থেকে ১৬ই অক্টোবর জয়পুর ফিরি।

রাজস্থানের সবুজ শ্যামল ভূখণ্ড বা আরাবল্লীর দক্ষিণ-পূর্ব অংশ সুন্দর ভাবে দেখতে বার থেকে চৌদ্দ দিন যথেষ্ট। জয়পুর থেকে যদি ভ্রমণ শুরু করা যায় তাহলে জয়পুর দুদিন। প্রথম দিন কনডাকটেড ট্যুরে জয়পুর শহর ও অম্বরের দ্রষ্টব্যগুলো দেখা যায়। দ্বিতীয় দিন বাস কিংবা গাড়ি যোগে গলতা, অমর গড় দুর্গ, সাঙ্গানীর এবং নাহারগড় দেখা সম্ভব।

তৃতীয় দিন ভোর রাতে বাসে চাপলে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে কিষাণগঞ্জ পৌঁছানো যায়। ঘন্টা তিনের মধ্যে কিষাণগঞ্জের দ্রষ্টব্য দেখে ঐদিনই আজমীরের দ্রষ্টব্য দেখা সম্ভব। হয়তো তারাগড় পাহাড়ে ওঠা সম্ভব হবে না। অবশ্য আজকের দিনে তারাগড় পাহাড়ের চূড়ায় মিরণ সাহেবের দরগা ছাড়া তেমন কিছু দেখারও নেই। রাতটা আজমীরে থাকাই ভাল। কেননা কিষাণগঞ্জ থেকে এসে লাগেজ রাখার জন্য নিশ্চয় এখানেই হোটেল বুক করা হয়েছে নইলে থাকার পক্ষে পুষ্কর আরো ভাল জায়গা।

চতুর্থ দিন ভোরে উঠে পুষ্করে পূজো দিয়ে ব্রহ্মা মন্দির, সাবিত্রী মন্দির ও অন্যান্য মন্দির দর্শন করে আজমীরে পৌঁছে যেতে পারেন দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। আজমীরে চেক - আপ টাইম ২৪ ঘন্টা। এদিন যদি তারাগড় পাহাড়ে ওঠেন তাহলে বিকালের বাসে চিতোর আসুন। রাতটা চিতোরে কাটান। পঞ্চম দিনে ঘন্টা তিনেক লাগবে চিতোর গড়ের দ্রষ্টব্য দেখতে। দিনে দিনে চলে আসুন কোটায়।

ষষ্ঠ দিন কোটা ও বুঁদি দেখা হয়ে যাবে। যদি কোটা অভয়ারণ্য কিংবা অন্য দ্রষ্টব্য দেখতে চান তবে আরও একটা দিন থাকুন। তাহলে ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিন কোটা এবং বুন্দির জন্য বরাদ্দ রইল। অষ্টম দিন ভোরের বাসে আসুন উদয়পুর। পর পর অনেক ঘোরা হয়েছে। সুতরাং অষ্টম দিনের বাকি সময়টা বিশ্রাম। নবম দিনে দু'শিফ্‌টে উদয়পুর শহর এবং নাথদ্বার, হলদিঘাট এবং কৈলাশপুরী দেখা হয়ে যাবে কনডাকটেড ট্যুরের বাসে। এই দিনেই দ্বিতীয় শিফ্‌টে উদয়পুর হোটেলে চেক-আপ করে লাগেজ সঙ্গে নিয়ে নিন। উদয়পুরেও চেক-আপ টাইম ২৪ ঘন্টা। এখানেই ট্যুর শেষ হোক অথাৎ শেষ দ্রষ্টব্য কৈলাসপুরী বা নাথদ্বার সেখানে নেমে পড়ুন। দুটো জায়গা থেকে নাথদ্বার কাছে। বাস কিংবা অন্য বাহন পেয়ে যাবেন। মোটের উপর রাতটা নাথদ্বারে থাকুন। দশম দিন রাজসমন্দ এবং কাঁকরোলি দেখে নাথদ্বার থেকে ফলনা রেলস্টেশনে যেতে হবে। ওখান থেকে বাসে ৩২ কিমি দূরের রণকপুর দেখে নেওয়া উচিত হবে। ওখান থেকে ঐ দিনই ফিরে আসুন নাথদ্বার।

একাদশ দিন বাসে উদয়পুর হয়ে মাউন্ট আবু। রাতটা হল্ট করে পরদিন অথাৎ দ্বাদশ দিন মাউন্ট আবুর দ্রষ্টব্য কনডাকটেড ট্যুরে সারুন। তবে মনে রাখতে হবে মাউন্ট আবুতে চেক-আপ টাইম সকাল নয়টা। আবু রোড রেল স্টেশন দিল্লী - আমেদাবাদ রেলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। আবু রোড থেকে ট্রেনে কিংবা আবু পর্বত থেকে রাতের এক্সপ্রেস বাসে জয়পুর ফিরে আসুন। যদি রণথম্বোর দেখতে চান আরও একটা দিন ট্যুর প্রোগ্রামে যোগ করুন। বিশ্রাম নিয়ে মোট চৌদ্দ দিনের প্রোগ্রাম। এছাড়া বাড়ি থেকে রাজস্থান এবং রাজস্থান থেকে বাড়ি ফেরার জন্য আরও চারদিন। ১৮ দিনের প্রোগ্রামে রাজস্থানের আরাবল্লীর দক্ষিণ-পূর্ব অংশ ভালভাবে দেখা সম্ভব।

যদি সমগ্র রাজস্থান একই ট্যুরে দেখতে চান তবে একমাসের ধাক্কা। যার যেমন সুবিধা সে ভাবে প্রোগ্রাম করুন।

আগেই বলেছি আজ সিটি প্যালেস, গোবিন্দ জিউর মন্দির, হাওয়া মহল এবং মিউজিয়াম দেখেছি। সন্ধ্যার সময় ঢুকেছি মেলায়। রাম নিবাস গার্ডেনের পশ্চিম দিকে এই মেলা বসেছে। এটি আমাদের কোলকাতার লেক্সপো, এক্সপোর সমতুল্য মেলা। চামড়াজাত দ্রব্য, কাঁসা পিতল, পাথরের রকমারি বাহারি জিনিস এবং রাজস্থানি ঘরানার পুতুল ও যান্ত্রিক সভ্যতার ফসল হরেক রকম গৃহসজ্জার দ্রব্য সামগ্রী দেখতে দেখতে রাত আটটা বেজে যায়।

এর পর ফিরে আসি হোটেলে। খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর হোটেল চেক-আপ করে স্বগৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

দ্বিতীয় পর্ব

রাজপুতানা-রাজস্থানের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশের জন্য যখন সুলুকসন্ধান করতে পথে বের হই তখন কোন এক বঙ্গ সন্তানের চৌর্য-বিদ্যার কৌশল দেখে অবাক হই।

ঘটনাটি যখন রাজপুতানা-রাজস্থান সুলুকসন্ধানকারির নিজ রাজ্যের রাজধানীতে ঘটে তখন দুর্ভাগা লেখকের অন্তরের প্রতি কোণ থেকে ছি' ছি! ধ্বনি প্রকাশিত হতে চায়, আর তা প্রকাশিত হতে পারলে যেন নিস্তার পাই। বলা বাহুল্য পথের বিভ্রাট সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে কিঞ্চিৎ হুঁশিয়ার করে দিতেই উক্ত ঘটনার সবিস্তারে আলোচনা প্রয়োজন।

হাওড়া-যোধপুর এক্স-আপ্-২৩০৭, ট্রেনটি রাত ১১.৩০ মিঃ-এ হাওড়া স্টেশন ছাড়ে। তার আগেই উক্ত ঘটনাটি ঘটে।

ইদানিং কালের রেল ডিপার্টমেন্টের সময়সূচী অনুযায়ী রেলগাড়ি চলতে পারে না। চলতে গিয়ে কত বাধা বিঘ্ন যে অতিক্রম করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। কোন কারণে একবার দেরী হলতো—যাত্রী বিক্ষোভ শুরু হয়, দেখতে দেখতে রেল অবরোধ। আবার চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি.... ইত্যাদির কারণেও যাত্রী বিক্ষোভ। রেল ঠিকভাবে চলা না চলার উপর নির্ভর করছে লক্ষ লক্ষ নিত্য যাত্রীর রুটী রোজগার রক্ষার পথ। অসন্তোষের কারণ বহুবিধ। মোটের উপর নিরীহ যাত্রীদের দেখভালের নিমিত্ত কেউ আছে বলে মনে হয় না।

যত হাঙ্গামা—হুজ্জোতি পোহাতে হয় নিরীহ রেলযাত্রীদের। রেলের পরিসেবার উন্নতি নেই। ফলে বলির পাঁঠা সেই নিরীহ যাত্রী। ধৈর্য্যেরতো একটা সীমা আছে। ফলে যাত্রী বিক্ষোভ অনিবার্য। এসব হ্যাপার জন্য বর্ধিত সময় হাতে নিয়ে ক্যানিং স্টেশন থেকে ৫.১৪-র ট্রেনটিতে চাপতে হল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আজ আর কোন হ্যাপা রেলকে স্পর্শ করল না। সুতরাং রাত আটটার মধ্যে পৌঁছালাম হাওড়া-স্টেশনে।

হাতে অনেক সময়।

সময় আর কাটে না। হাওড়া-ষ্টেশনের প্লাটফরমগুলোর সামনে বিশ্রামের নিমিত্ত জায়গায় বসে আছি। দেখতে দেখতে ক্লান্ত শরীরে ঝিমুনি দেখা দিল। রাত নয়টার পর হাই তুলছি আর ঝিমুনি কাটানর চেষ্টা করছি।

চা এল। চা খেয়ে নিদ্রার হাত থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু রেহাই পেলাম না পকেটমারের হাত থেকে।

চা এর দাম মেটাতে গিয়ে মানি ব্যাগ পকেট থেকে বার করতে হল। বোধ হয় তখন থেকে চোর প্রবরের দৃষ্টি পড়ে আমার মানিব্যাগের প্রতি। দেখতে দেখতে ট্রেন ছাড়ার সময় হল। রাত এগারটায় সময় সারণী বোর্ডে হাওড়া-যোধপুর এক্সপ্রেস ছাড়ার সংকেত পেয়ে উঠে পড়লাম আসন ছেড়ে। তখনও লক্ষ্য করলাম মানিব্যাগ সঙ্গেই আছে।

S–3 বগিতে যখন উঠলাম তখন অন্ধকার। সীট খোঁজার তাড়াহুড়োর মধ্যে পকেটমার হাত সাফাইয়ের কাজটি সারে। আলো এল। সীট খুঁজে গোছগাছ করতে গিয়ে বুঝলাম মানি ব্যাগ উধাও।

যাত্রার প্রথমেই বিভ্রাট।

সুতরাং মানসিক বিপর্যয় অনিবার্য। ফল কথা দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের শুরু। ভাবনার রাশ আর নিজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না।

কি হয়! কি হয়! ভাবনা আর দুরু দুরু বক্ষে দ্বিতীয় দিনের ঊষাকালে ট্রেনের শৌচাগারে হাত ঘড়িটি রেখে আসি। প্রথম ঘটনার জেরে শঙ্কা এমনভাবে গ্রাস করেছে যে তারই ফলে দ্বিতীয়বারের ভুল। আ! কি কুক্ষণেই না ঘর থেকে বের হলাম!

ভোলার চেষ্টা করলাম সদ্য বিপর্যয়কারী ঘটনা দুটিকে—যাক, যা হবার হয়েছে! নতুন উদ্যমে নেমে পড়ি মেড়তা ষ্টেশনে। কেননা মনকে ভোলাবার চেষ্টা করলেও পেট ভুলবে কেন? তার যে চাহিদা আছে। ক্ষুধা নামক দৈত্যটিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। সুতরাং দুর্ভাবনা সিকেয় তুলে ভাজিভুজির দোকানে হাজির হই। পাঁচ টাকার আলু পকোড়া কিনে সীটে বসতে না বসতেই এক মাতৃসমা বৃদ্ধার হুঁশিয়ার বাণী শুনি —

ওরে বাছা ভাজি ভুজি না খেলে কি চলে না! দিল্লীতে ভেজাল তেল খেয়ে এত লোক মারা গেল, তাতেও তোদের হুঁশ হয় না!'

— মাগো মা, সময় কালে মনে করিয়ে দিলে, তাইতো তুমি মা ! আর দেরী কেন? ফিরে যাই সে ভাজিভুজির দোকানে।

— ও ভাই তোমার খাবার তুমি রাখ, আমার টাকাটা ফেরত দাও।

— খাবার একবার বিক্রী হলে, দাম ফেরত হয় না।

— তবে খাবারতো ফেরত হয়, এই নাও তোমার খাবার।

দোকানীকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে খাবার রেখে শূন্য হাতে ফিরি নিজের সীটে। পাঁচটি টাকা গচ্ছা গেল।

হায়!

তবে কি দুর্ভাগ্যের সময়কাল এখনও ফুরোয়নি। এমনি দুরু দুরু বক্ষে একরাশ ভাবনা নিয়ে যাত্রার তৃতীয় দিনের সকাল দশটায় মরুভূমির বুকে পা রাখি।

আশ্চর্য! যোধপুর ষ্টেশনে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বিগত দিনের দুর্ভাবনা নিমেষে হারিয়ে গেল। নতুন জায়গার আকর্ষণে এগিয়ে চলি।

স্টেশনের সামনেই রয়েছে যশবন্ত সরাইখানা। ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসেও এই সরাইখানায় এসে উঠেছিলাম। তখন রাজপুতানা —রাজস্থানের প্রথম পর্বের তথ্যাদির জন্য ভ্রমণ.করছিলাম। আরাবল্লীর দক্ষিণ-পূর্বের রাজস্থান ভ্রমণ শেষে এক ঝটিকা সফরে এসেছিলাম মরুভূমিতে। রাজপুতানা-রাজস্থানের প্রথম পর্বে উল্লেখও করেছি। সুতরাং পরিচিত জায়গাতেই উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে পথে বের হই। সোজা চলে

এলাম ঘুমার ট্যুরিষ্ট বাংলোতে। হাইকোর্ট রোডে ঘুমার ট্যুরিস্ট বাংলো। এরা কনডাক্টেড ট্যুরের আয়োজন করে থাকে। প্রতিদিন দুটি ট্রিপ। প্রথমটি সকাল ৯.৩০ মি. থেকে দুপুর ১টা এবং দ্বিতীয়টি দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫.৩০ মি।

আমি ইচ্ছা করলে আজকের দ্বিতীয় ট্রিপে শহর ঘুরে দেখতে পারি। কিন্তু তা করলাম না। আজকের দিনটি একাই ঘুরে বেড়াব। ঘুরে বেড়াবার আগে যোধপুর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

যোধপুর

রাজস্থানের অন্যান্য শহরের মত 'পুর' বা 'পুরম' ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে যোধপুর। রাজপুত রাঠোর প্রধান—রাও যোধা ১৪৫৯ খৃস্টাব্দে যোধপুর শহরটির গোড়াপত্তন করেন।

যোধপুর ২৫.৪ থেকে ২৭.৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭১.৫১ পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। তখনকার দিনে মারবারের রাজধানী যোধপুরের আয়তন ছিল ৮৭৭২ বর্গমাইল। আর স্বাধীনতা পরবর্তী রাজস্থানের চতুর্থ বৃহত্তম জেলা।

মরু অঞ্চল মারবারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একমাত্র নদী লুনি। ফলে এখানে জলকষ্ট সদা বিদ্যমান। সামান্য বৃষ্টিপাত হয় বলে কম পরিমাণে সব্জি, ফুল ও ফলের দেখা মেলে। রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয় এখানকার অধিবাসীদের। ফলে এরা খুব পরিশ্রমী সৎ এবং ধার্মিক। আর রঙ্গীন ফুলের অভাব পূরণের জন্য যোধপুর-বাসীগণ বিভিন্ন রংয়ের পোষাক পরতে ভালবাসে। আর ভালবাসে বিভিন্ন অলঙ্কারে সাজতে।

পশ্চিম রাজস্থানের মরু অঞ্চল যোধপুর অতীতের রাজপুতানার অন্তর্গত একটি বৃহৎ দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্যটি থর মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সুতরাং সদা অস্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ, কষ্ট, চরম অভাব, জলকষ্ট এবং লু অর্থাৎ গরম হল্কা প্রবাহ এদের জীবনযাত্রার নিত্য সঙ্গী। প্রাকৃতিক রুক্ষতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা, সহযোগিতা সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসা গড়ে উঠেছে। ফলে এরা বহিরাগত অতিথিদেরও দেবজ্ঞানে সেবা করে।

অতীতের রাজপুতনার অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য মারবার ৯টি মরু অঞ্চল নিয়ে গঠিত। যেমন—যোধপুর, বাড়মের, নাগাউর, কিষানগড়, ঝালোর, পোকরান, মেড়তা, নাদোল এবং বিকানীর। তখনকার দিনে এই অঞ্চলগুলোকে বলা হত নকুন্তি।

যোধপুর প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত মারবারের রাজধানী—ছিল মান্ডোর। বর্তমান যোধপুর শহর থেকে ৯ কি.মি. উত্তরে এর অবস্থান। সুতরাং মান্ডোর একটি দর্শনীয় বিষয়। মান্ডোরের কথা এখন থাক।

যোধপুরের স্বাভাবিক যানবাহন

টাঙ্গা, মিনিবাস, টেম্পো, অটোরিকসা, ট্যাক্সি এবং জীপ।

ইনফরমেশান সেন্টার ঃ

১। ট্যুরিস্ট ইনফরমেশ্যন ব্যুরো, ঘুমার ট্যুরিস্ট বাংলো, টেলিফোন—২৫১৮৩, ২১৯০০।

২। ইনফরমেশান সেন্টার, হাইকোর্ট রোড, টেলিফোন—২০৪৯৩।

ব্যবস্থাপনা সফর এবং গাইড পরিষেবা পাওয়া যায়।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

বিমানে আসতে হলে শহর থেকে ৫ কি.মি. দূরের রতনাদা বিমানক্ষেত্রে নামতে হবে। I.C. রুটে জয়পুরের সঙ্গে দিল্লী, বোম্বে, ওরঙ্গাবাদ, আমেদাবাদ এবং উদয়পুর শহর যুক্ত।

রেলে যোধপুরেই নামতে হবে। ট্রেন আসছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর থেকে। আর সড়ক পথে রাজস্থানের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো যুক্ত। এদের সিটি বাস স্ট্যাণ্ডটি সুবার্বান স্টেশান রায়-কা-বাগের কাছে।

অন্যান্য খবর

যোধপুরের আয়তন ২২৯৫০ বর্গকি.মি। লোকসংখ্যা ২২৫৩.৪৮৩। শিক্ষিতের হার শতকরা ৪০.৫৯ জন। ৬টি তহশীল আর গ্রামের সংখ্যা ৮৬৩। এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য বজরা, জোয়ার এবং পালসেস।

যোধপুরের দর্শনীয় বিষয়

যোধপুর শহর, ফোর্ট, যশবন্ত থাডা, উমেদভবন প্যালেস, সরদার মিউজিয়াম, বালসামান্দ কৈলানা মহামন্দির, গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম, মান্ডোর এবং ওশিয়ান।

RTDC-র ব্যবস্থাপনায় শহর দর্শনের ব্যবস্থা আছে। বাস ছাড়ে হাইকোর্ট রোড-এ ঘুমার ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে। এরা সকাল এবং বিকাল দু'শিফটে শহর দর্শন করায়।

সকালের সাইট-সিইং। ৯.৩০ থেকে দুপর ১টা। দর্শনীয় বিষয় উমেদভবন প্যালেস, মেহরান গড় দুর্গ, যশবন্ত থাডা এবং মান্ডোর গার্ডেন। সীট রিজার্ভেশন ৬৩.০০ টাকা। ১৯৯৮ সালের এই রেট।

থাকার ব্যবস্থা

থাকার জায়গারও অভাব নেই।

ডিল্যুক্স হোটেল—উমেদভবন প্যালেস, ফোঃ২২৩১৬, ২২৫১৬, ২২৩৬৬, অজিত ভবন প্যালেস, এয়ার পোর্ট রোড, ফোঃ ২০৪০৯, হোটেল রতনাদা ইন্টারন্যাশনাল, পলি রোড—ফোঃ২৫৯১৯, করণী নিবাস, রতনাদা—ফোঃ ২০৯৫৭, ঘুমর ট্যুরিস্ট বাংলো, হাইকোর্ট রোড—ফোঃ ২১৯০০, ডাক বাংলো, ডি-এস অফিসের (রেল) কাছে — ফোঃ ২১৬৩৮।

বাজেট হোটেল

রেল স্টেশানের কাছে। রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম, ফোঃ ২২৭৪১। আদর্শ নিবাস হোটেল— ফোঃ ২৩৯৩৬, আগরওয়াল লজ, ফোঃ ২০৮৩৭, আলপনা হোটেল, ফোঃ ২৪৫০৪, অশোকা— ফোঃ ২৩৯৮৫, শান্তি লজ— ফোঃ ২১৬৮৯।

সোজাতি গেটে

অরুণ হোটেল— ফোঃ ২০২৩৮।

ঝালৌরি গেটের কাছে— হোটেল লক্ষ্মী নিবাস।

স্টেশন রোডে—পৃথ্বী হোটেল ফোঃ ২৪৯৯৯। এছাড়া বোম্বে লজ— ফোঃ ২৩৭৮৬। সেন্ট্রাল লজ, রঘুনাথ দাশ ধর্মশালা এবং যশবন্ত সরাই।

দুই

দুপুর বেলা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি। যাত্রার তৃতীয় দিনে যোধপুর দর্শন শুরু করি। আমি যাব মাণ্ডোর। যশবন্ত সরাইখানার পাশ থেকেই টেম্পো যাচ্ছে মাণ্ডোর। চাঁদপোল থেকে আসছে এই টেম্পোগুলো। টেম্পো চলেছে সোজা উত্তর দিকে। মাণ্ডোরের পথ থেকে একটি পথ চলে গেছে বালসামান্দ লেকের দিকে। ১৯৯৫ সালে ঝটিকা সফরের সময় গিয়েছিলাম বালসামান্দ লেকে। সুতরাং এবার যাব না।

বালসামান্দ লেক

শহর থেকে ৮ কি.মি. মাণ্ডোরের পথে পড়ে এই লেক। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বুলক রাও পরিহার হ্রদটি তৈরি করেন। হ্রদটিতে ৫৬০০০ ঘনফুট জল ধরে। বুলকরাও পরিহার একটি বাঁধ দিয়ে এই হ্রদ তৈরি করেন। পরে মহারাজ সুর সিং বাঁধটির সম্প্রসারণ করেন।

হ্রদের দক্ষিণ দিকে একটি মনুমেন্ট আছে। যোধপুর সৃষ্টির আগে যখন মাড়োয়ারের রাজধানী মাণ্ডোর ছিল সে সময় মাড়োয়ারের রাজা রাও যোধার সঙ্গে আহদা হিঞ্জোল এর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাও যোধা পরাজিত হন। আর এই মাড়োয়ার যুদ্ধের স্মরণে গড়ে তোলা হয় একটি মনুমেন্ট। অবশ্য রাও ১৪৫৩ সালে আহদা হিঞ্জোলের কাছ থেকে মাণ্ডোর পুনরুদ্ধার করেন।

আর লেক সংলগ্ন একটি বাগিচা আছে। লেক ও বাগিচা দেখার সময় সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাগিচা। ১৯৯৫ সালে যখন বালসামান্দ লেক দর্শন করতে যাই তখন প্রবেশমূল্য দুটাকা। বাগিচায় ঢোকার মুখেই টিকিট কাউন্টার।

সুন্দর বাগিচা

বাগিচার মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে লেক পর্যন্ত। সেদিন বাগিচার গেট পর্যন্ত অটোতে গিয়েছিলাম। তারপর পদচারণা করে এগোচ্ছিলাম। বাগানে জলের ফোয়ারা আর

বিভিন্ন ফুলের গাছ বাগিচার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। পদচারণা করে এগোচ্ছিলাম। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে কতিপয় বানর। আর নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূর।

এসব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে লেক-এর উত্তর প্রান্তে গিয়ে উঠি। এখানে মহারাজা সুরসিং একটি "গ্রীষ্মাবাস (Summer Palace) তৈরি করেন। যশোবন্ত সিং দ্বিতীয় এই গ্রীষ্মাবাসটির সম্প্রসারণ করেন।

যাই হোক ১৯৯৫ সালে দেখেছিলাম গ্রীষ্মাবাসটির ভাঙ্গা-গড়া চলছিল। এই প্যালেসটি হোটেলে রূপান্তরিত হবে। সেদিন প্যালেসের সামনে দাঁড়িয়ে লেক দেখছিলাম। বেশ বড় লেক। মরুভূমির মাঝখানে এমন একটি লেক ভাবাই যায় ন! প্রকৃতি যে কত চিন্তা করে মানুষের জন্য, এই লেকই তার প্রমাণ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেক দেখছিলাম। আর সে সময় দেখা হল দেবেন্দ্রনাথ ভকতের সঙ্গে। কিছুক্ষণের আলাপচারিতায় বুঝতে পারলাম আগন্তুক বাঙালী। তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

— আপনি কি বাঙ্গালী?

— হ্যাঁ, আমার বাড়ি মালদায়।

—আপনার টাইটেল দেখে মনে হচ্ছে······

(আমার কথা শেষ না হতেই দেবেন্দ্রনাথ বলতে থাকেন।)

— হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন মাড়োয়ারী। তার জন্য আমার টাইটেল ভকত। আমার পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল ইউ-পিতে। নয় পুরুষ ধরে আমরা মালদায় আছি। ইউ পি-র সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা এখন পুরোপুরি বাঙ্গালী।

— আপনি যোধপুরে কবে এসেছেন?

— আমি একমাস হল এখানে B.S.F. ক্যাম্পে ট্রেনিং নিতে এসেছি।

সে দিন হাঁটতে হাঁটতে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। দেখলাম সারা ময়দান জুড়ে ক্যাম্প। দেবেন্দ্রনাথ বলল সে এখানে এসেছে Camel training নিতে। দেবেন্দ্রনাথ মিলিটারিতে চাকরি করে বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে তার পোস্টিং ছিল বিকানীর সেক্টরে। ট্রেনিং শেষ হলে দেবেন্দ্রনাথ বিকানীরে ফিরে যাবে।

যাইহোক আজও সেই ময়দানের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আর মনে পড়ছে পুরানো দিনের কথা। বিকেল চারটায় মান্ডোর এসে পৌছালাম।

মান্ডোর

অতীতে মান্ডোরের নাম ছিল মান্ডবপুরা। ঋষি মান্ডুরের নামানুসারে এই নাম হয়। আর সেই যুগে জায়গাটি প্রথমে পারমার এবং পরে পরিহারদের অধীনে ছিল। সর্বশেষে রাঠোর প্রধান চুন্দা ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে পরিহারদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। যোধপুর প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত মান্ডোর ছিল মারবার বা মাড়োয়ারের রাজধানী।

বাগিচার প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতেই দেখি কতগুলো বানর এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। বাগিচার দর্শকদের কাছে বিক্রীর জন্য কলা নিয়ে বসে আছে কয়েক জন। তার মধ্যে একজন মহিলার সামনে একটি রামছাগল এসে দাঁড়ায়। ছাগলটি লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কলার দিকে। দোকানী ছাগলটিকে তাড়া করে। মহিলার লাঠি উঠানো দেখে রামছাগলটিতো পালালই তার সঙ্গে বানরগুলো ধুপ ধাপ গাছে উঠে ডালে ডালে লাফা লাফি শুরু করে।

কয়েকজন রাজস্থানী বাঁশের তৈরি বেহুলা বাজিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করছেন। দর্শকদের বখশীষ পেয়েই কিছু লোক সংসার চালাচ্ছে। তবে কোন ভিক্ষুক দেখলাম না। সুন্দর চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুদিকে মাঝে মাঝে বসার আসন রয়েছে। স্থানীয় এবং বহিরাগত দর্শকগণ বিশ্রাম নিতে পারেন গাছের ছায়ায় বসে।

পথের দুদিকের বাগিচায় পাতাবাহারী এবং ফুলের গাছ। আর আছে পাম, ইউক্যালিপটাস, নিম, বটলব্রাস এবং মেলিয়ার মত গাছ। সুন্দর বাগিচা। মাঝে মাঝে জলের ফোয়ারা। মরুভূমির মাঝখানে সবুজ দেখে খুব ভাল লাগে। আমি হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়ি অজিত পোল্। এটি মান্ডোরের পুরানো গেট। গেট দিয়ে ঢুকতেই পড়ল "হল অফ হিরোজ।"

হল অফ হিরোজ

অজিত পোলের বাম দিকে একটি নিচু সিলিংওয়ালা বিল্ডিং এবং সামনের দিক খোলা। ছাদটি কয়েকটি স্তম্ভের উপর ধরা। এটি তেত্রিশ কোটি দেবস্থান বা দেব-দেবী মন্দির। এখানে দেব-দেবী ছাড়া স্থানীয় বীরদের প্রদর্শনী হচ্ছে। অখণ্ড পাথরে ষোলটি বিশাল খোদিত মূর্তি।

যোধপুর আর্কিওলজি এবং মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের সাইনবোর্ডের বক্তব্য এরকম—

Hall of Heroes and Divinities

The sculptures in this hall (Varandha) carved out of natural rock represent some cult images and some great heroes of Marwar held by local people in high esteem. They were embodiment of courage, valour and chivalry, and are remembered for their love for motherland and the sacrifies they made in upholding the cultural traditions of the land. The hall and the figures were given shape during the regin of Maharaja Ajit Singh (1701–1724 A.D.) and completed when Maharaja Abhay Singh (1724–1849 AD) graced the throne of Marwar. Later on the figures were given a coat of fine plaster made of lime and powdered white marble.

গণেশজী, জলন্ধরনাথজী, মহাদেব, কৃষ্ণ ভগবান, রামচন্দ্রজী, সুরজী, ব্রহ্মাজী (চতুর্মুখ), মেহাজী, গোগাজী, হারবতজী, রামদেবজী, পাপুজী, মালীনাথজী, গুসাইনজী, মহিষাসুর মর্দিনীজী, এবং চামুন্ডাজী।

হল অফ হিরোজের পরেই রয়েছে একটি মন্দির। ভেরুজী মন্দির। এর পোষাকী নাম কালা-গোরা ভেরুজী।

মন্দিরে আরাধ্য তিনজন। দুদিকে কালা ভেরুজী এবং গোরা ভেরুজী। মাঝখানে গণেশজী। পাথরের মূর্তি। ভেরুজী মন্দিরে এখনও প্রাত্যহিক পূজা হয়।

ভেরুজী মন্দিরের পিছন দিকে এক সময় অট্টালিকা ছিল। এখন আর নেই। এখন শুধু ধ্বংসাবশেষ আর জঙ্গল। ফিরে আসি হল অফ হিরোজের সামনে। এখানে পাম এবং বটলব্রাস গাছগুলো সুন্দরভাবে সাজানো।

সামনে জানানা বাগ। বাগ মানে বাগিচা। মহিলাদের নিমিত্ত বাগিচা। বাগিচার সামনে পাহাড়ে ছিল মাণ্ডোর রাজপ্রাসাদ। আজ আর কিছু নেই। কিন্তু নিচের জানানা বাগ এবং একস্তম্ভ মহল এখনও টিকে আছে। এখানেই রয়েছে লাল গঙ্গা। এক সময় পূজা হত। এখন সবই অবহেলায় পড়ে আছে।

একস্তম্ভ মহল থেকে মহারাণী পাথরের জালির ফাঁক দিয়ে বাগিচার দৃশ্য দেখতেন। উৎসব এবং আনন্দের দৃশ্য উপভোগ করতেন। বাগিচা এবং একস্তম্ভ মহল দেখে উঠি পাহাড়ের উপর।

পাহাড়ের উপরে প্রাসাদ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে গড়ে তোলা হয়েছে একটি রেস্টুরেণ্ট। গজসিং-এর বংশধরের হাতেই রয়েছে রেষ্টুরেণ্টের মালিকানা। গজসিং আজও বেঁচে আছেন। রাজমাতা কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে যোধপুরে থাকেন।

পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ি পথ। লতানো গাছ দিয়ে সুদৃশ্য করা হয়েছে। মাণ্ডোরে যারা বেড়াতে আসেন তাদের জন্য খোলা রয়েছে রেস্টুরেণ্ট। রেস্টুরেণ্টে চা খেয়ে নেমে এলাম মহারাজাদের সমাধিক্ষেত্রে।

বাগিচা সংলগ্ন যোধপুর রাজাদের সমাধিক্ষেত্রটিও দেখার মত। এই শ্মশান স্থানে রয়েছে রাজাদের স্মৃতিস্তম্ভ। স্তম্ভগুলো উঁচু বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে মিতালি গড়েছে। আর অতীত মাড়োয়ারের গৌরব কাহিনী শোনাচ্ছে। মানুষের হাতে গড়া লেক-এর কিনারায় দাঁড়িয়ে কিংবা লেক-এর উপর ব্রীজে দাঁড়িয়ে স্মৃতি স্তম্ভগুলোর ছবি তোলাও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে রাজস্থানীরা 'দেবল' বলে। অজিত সিং-এর স্মরণে গড়া দেবলটি সব থেকে উঁচু এবং সুন্দর। এছাড়া উত্তর-দক্ষিণে এক রেখা বরাবর আরো পাঁচটি স্মৃতি স্তম্ভ রয়েছে। এগুলি যথাক্রমে—

(১) রাওমল দিও-কা দেবল।

(২) মোটা রাজু উদয় সিং কা দেবল।

(৩) সোয়াই রাজা সুরসিং কা দেবল।

(৪) রাজা গজ-সিং কা দেবল।

(৫) মহারাজ যশবন্ত-সিং কা দেবল।

সমাধি ক্ষেত্র দেখে ফিরে আসি রাজপথে। ফেরার পথে থামি পাওটায়। পাওটাতে রয়েছে ইন্টার- স্টেট বাসস্ট্যাণ্ড। প্রয়োজনীয় কথা সেরে উঠে আসি রেল-ব্রীজে। রেল লাইনের উপর ব্রীজ। ৬নং বাসটি রেল ব্রীজ পেরিয়ে উমেদ ভবনের পাশ দিয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আজ আর ওদিকে যাব না।

তিন

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।

আজ মঙ্গলবার, শহর দর্শনে বের হব। ঘুমর ট্যুরিস্ট বাংলোতে গতকাল সীট রির্জাভ করে রেখেছিলাম। সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে পড়ি। ঘুমর হোটেলের পরে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট স্টপেজে নেমে পড়ি।

হাইকোর্ট এরিয়ায় এক চক্কর মেরে আসি পাবলিক পার্কে। হাইকোর্ট কম্পাউণ্ডের লাগোয়া পাবলিক পার্ক। পার্কের বাইরে রয়েছে একটি শিবমন্দির। আর পার্কের মধ্যে সর্দার মিউজিয়াম এবং চিড়িয়াখানা।

পার্কে গিরিরাজ অম্বামাতা এবং হনুমান মন্দির। একই ছাদের তলায় তিন মন্দির। অম্বামা অর্থাৎ মা দুর্গার আট হাত। তিনি সিংহের উপর উপবেশন করে আছেন। ত্রিশূল, কৃপাণ, শঙ্খ, গদা ইত্যাদি তাঁর অস্ত্র। এক হাত অভয় দানের ভঙ্গিতে প্রসারিত। তিনি প্রসন্ন চিত্তে বসে আছেন। মাথায় চূড়া, গায়ে অলঙ্কার। শ্বেত পাথরের মূর্তি। মায়ের লাবণ্যময় মূর্তি মনোমুগ্ধকর।

গিরিরাজ মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণ এবং হনুমান। এই প্রথম সারির মূর্তির পিছনে রয়েছে শ্রীবলরাম ও অন্যান্য মূর্তি। সবই শ্বেত পাথরের। সুন্দর মূর্তি।

আর হনুমান মন্দিরে হনুমানজী গন্ধমাধন পর্বত নিয়ে চলেছেন তারই দৃশ্য।

কয়েক ধাঁপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দ্বিতলে। এখানেও তিনটি মন্দির। শিব মন্দির। শিব মন্দিরের ডানদিকে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা এবং বাম দিকে হনুমান মন্দির। সবই শ্বেত পাথরের মূর্তি। প্রথমে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্য মন্দিরটি শিব মন্দির নামে খ্যাত।

রাম মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনাবলী অঙ্কিত টালি লাগানো হয়েছে।

শিব মন্দিরের পাশে দেব-দেবী প্রদর্শনী গ্যালারি। এখানে প্রতিটি মূর্তি শ্বেত পাথরের তৈরি। প্রদর্শনী দেখে শিব মন্দিরের সামনে বসে পড়ি। পূজা এবং আরতি শেষ হলে ভক্তগণ সুর ধরে গান ধরেছেন। এক সময় সমবেত কণ্ঠের গীত শেষ হল। প্রসাদ বিতরণ হল।

প্রসাদ নিয়ে আসি পাবলিক পার্কে। পায়চারি করতে থাকি। এখন নয়টা বাজে।

আমার হাতে আর বেশি সময় নেই। সাড়ে নয়টায় ঘুমর বাংলোয় R.T.D.C-র অফিসে রিপোর্ট করতে হবে। পাবলিক পার্কের লাগোয়া চিড়িয়াখানার বাইরে থেকে তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাখিগুলো। সাইট-সিইইং-এ শহর দেখে এসে মিউজিয়াম এবং চিড়িয়াখানা দেখব।

পার্কের বাইরে ঘুমর ট্যুরিস্ট বাংলো। সাড়ে নয়টার R.T.D.C-র অফিসে রিপোর্ট করি। সাইট-সিইইং-এ জন প্রতি ভাড়া লাগে ৬০্। দর্শনীয় বিষয়—

(১) উমেদ প্যালেস্

(২) মেহরান গড় দুর্গ

(৩) যশবন্ত থারা

(৪) মান্ডোর গার্ডেন

সকাল ১০টায় আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করে। ১৮ সীটের মিনি বাস। আমরা যাত্রী মাত্র তিনজন। আমি ছাড়া আর দুজন বিদেশী ট্যুরিস্ট।

এত কম যাত্রী!

এর কারণ এখন অফ-সীজন। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস রাজস্থান বেড়াবার উপযুক্ত সময়। সুতরাং ট্যুরিস্ট আসা এখনও শুরু হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এসে পড়ি পাওটায়। রেল লাইনের উপর ব্রীজ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। রাজপথ ছেড়ে গাড়ি উমেদ ভবন কম্পাউণ্ডের মধ্যে এসে পড়ল।

উমেদ ভবন প্যালেস

১৯২৮ সালের ১৮ই নভেম্বর পুরোহিতের মধ্য দিয়ে পূজারি ও পণ্ডিতদের সামনে ভবনটির শিলান্যাস করেন মহারাজা উমেদ সিং। তারপর ১৯৪০ সালের মে মাসের মধ্যে ভবনের মুখ্য কাজগুলো সারা হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভবনটির কাজ সম্পন্ন হয়। মহারাজা উমেদসিংজীর নামাঙ্কিত ভবনটি সুউচ্চ পাহাড়ের উপরে গড়ে তোলা হয়।

এই বিশাল ভবনটির কাজ সম্পন্ন করতে ৩০৯০ জন শ্রমিকের দরকার হয়। ভবনটি লন্ডনের রয়াল ইন্সটিটিউট অফ আর্কিটেক্টের প্রেসিডেন্ট J.D Lodge এবং H.S Lanchestor এর পরিকল্পনায় জোড়াহীন ইন্টারলকিং পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে। পাথরগুলো আনা হয়েছে মাকরানা থেকে।

১৯৫ মিটার লম্বা ও ১০৩ মিটার চওড়া ভবনটি নির্মাণ করতে দেড় মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। গোলাপী রং-এর প্রাসাদটি ২৬ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ১০ একর জমি জুড়ে শুধু বাগিচা।

আধুনিক প্রাসাদের সমস্ত বিলাসিতার সম্ভার সাজানো রয়েছে। প্রাসাদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি দুটি স্তম্ভে বিন্যস্ত। প্রথমটির উচ্চতা ৩২ মিটার। এটি কংক্রিটের তৈরি। উপরেরটি ছাই রংয়ের বেলে পাথরের তৈরি। আর মাঝেরটি থেকে উপরেরটি ২৪.৩৮ মিটার উঁচু।

কেন্দ্রীয় গম্বুজটির ঠিক নিচে রয়েছে একটি বিশাল সুইমিং পুল। পুল এবং করিডরে নীল রংয়ের টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। রাশি চক্রের প্রতীক এবং ম্যুরাল চিত্রের ব্যবহার হয়েছে পুলের গাত্রে। আলোক মালায় সজ্জিত পুলটিতে ৬০.০০০ গ্যালন জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। মরুভূমির বুকে এমন ব্যবস্থা ভাবা যায়!

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—বাগিচার মধ্য দিয়ে পথ। পাকা মসৃণ পথ চলে গেছে উমেদ ভবনের দিকে। পাহাড়ের নিচে একটি ঝিল। ঝিলে কতকগুলো মহিষ নাক উঁচু করে জলে ডুবে আছে। আর বাগিচায় ফলহীন গাছ। কোনরকম প্লান প্রোগাম ছাড়াই এসব গাছ বড় হয়েছে।

উমেদ ভবনের চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সামনের গেটের সামনে আমাদের গাড়ি এসে থামল। এখানেই টিকিট কাউণ্টার। প্রবেশ মূল্য জন প্রতি দশ টাকা। বড় গম্বুজের নিচের অংশে হোটেল। তার পূর্ব দিকের অংশে মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের পিছনের অংশে রাজপরিবার থাকেন।

আমাদের হাতে সময় কম। আমরা ঢুকি যাদুঘরে।

উমেদ যাদুঘর

প্রথমেই পড়ল দরবার হল। এখানে রয়েছে কয়েকটি মডেল। অস্ত্র — বিভিন্ন রকম অস্ত্র। গ্লাস রুমে —বিদেশী কাচের তৈরি গ্লাস এবং পাত্র। আর ঘড়িঘর! বিস্ময়ে ভরা ঘড়ির কারসাজি দেখতে হলে বেশ কিছু সময় দেওয়া দরকার. বিভিন্ন মডেলের ঘড়ি। পুরানো ঘড়ির সারি। আংটির মধ্যে ঘড়ি. বিস্ময় জাগায়! এও সম্ভব! ঘড়ির ধ্বনিতে পাখির কূজন। ঘড়ির এত সংগ্রহ সাধারণতঃ কম দেখা যায়।

সময় মাপক যন্ত্র, স্টীম ইঞ্জিনের মডেল, জাহাজ....ইত্যাদি। বইয়ের বিশাল সংগ্রহ। এখানেই রয়েছে সোনায় পালিশ করা একটি চেয়ার। চেয়ারটির ব্যাপারে বলা হয়েছে—

His Highness Maharaja Jaswant Singh Bahadur G.C.S.T. of Jodhpur From Victoria Empress of India – Jan 1877

আর দেখার আছে বিভিন্ন ট্রফি, শিকারে জেতা এসব ট্রফি—কখন কিভাবে পাওয়া গেছে সে কথাও বলা আছে। এছাড়া রয়েছে মানপত্র এবং দলিল।

যাদুঘরটি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে । প্রবেশ মূল্য ১০। যাদুঘর দর্শন হল।

ফিরে আসি বাসে। বাস চলেছে উল্টোদিকে। শহরের পশ্চিম দিকে দুর্গ। এই দুর্গটি বহুদিক থেকে মূল্যবান। যোধপুরের এই দুর্গের নাম মেহরান গড় দুর্গ। অবশ্য দুর্গের কথা বলতে গেলে যোধপুর শহরের কথা উল্লেখ করতে হয়।

যোধপুর শহর

যোধপুর শহরটি আসলে একটি মরু দুর্গ। রাঠোর প্রধান রাও যোধা ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে

থর মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে এই মরু দুর্গটি তৈরি করেন। নিচু বালি পাথরের একটি পাহাড়কে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। প্রায় ১৩ কিমি এর পরিধি। এই পুরানো নগরটি যোধপুর সিটি। যদিও পরবর্তী কালে শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে। বাইরের আধুনিক শহরে বাণিজ্য কেন্দ্র, ভারতীয় বিমান বাহিনীর শিক্ষা কেন্দ্র, সেনা বাহিনীর অন্যতম কেন্দ্র, যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মরু গবেষণা কেন্দ্র এই সব বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠেছে।

ট্যুরিস্টদের দেখার বিষয় পুরানো যোধপুর শহর। মরু দুর্গটিতে সাতটি তোরণ আছে। যেমন— চাঁদপোল, নাগৌরি গেট, সোজাতি গেট, মেরতি গেট, ঝালৌরি গেট, সিবাঞ্চি গেট, ইত্যাদি। এই শহরের কিছু বাড়ি এবং মন্দির লাল বেলে পাথরে তৈরি।

দুর্গ নগরের মধ্যে আবার ২ বর্গমাইল পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। এই প্রাচীরটি ২৪৬০০ ফুট লম্বা। ৩ থেকে ৯ ফুট চওড়া এবং উচ্চতায় ১৫ থেকে ৩০ ফুট। বিভিন্ন স্থানে রয়েছে গম্বুজ এবং দেওয়ালের ঠেস। শহরে প্রায় ১০০টি গম্বুজ রয়েছে আর সেইসব গম্বুজে আছে চৌকির ব্যবস্থা। মোটের উপর বহিঃশত্রুর হাত থেকে দুর্গরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। এই সুরক্ষার ব্যবস্থাটি করেন মহারাজা অভয়সিং এবং মহারাজা ভকত সিং।

আমরা চলেছি দুর্গ দর্শনে। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে একটা নির্জন স্থানে বাস এসে থামল। মেহরানগড় দুর্গের প্রবেশ পথে একটা প্রশস্ত জায়গা। ট্যুরিস্টদের জন্য কয়েকটি দোকান বসেছে। এছাড়া বাইরের নির্জনতার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গ।

মেহরানগড় দুর্গ

রাঠোর প্রধান মহারাজা যোধা ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে দুর্গটি তৈরি করেন। যোধপুরের এই দুর্ভেদ্য দুর্গটির নাম মেহেরান গড় দুর্গ।

শহর থেকে প্রায় ১৪৯০ ফুট উঁচুতে এবং নির্জন পরিবেশে গড়ে উঠেছে এই দুর্গ। পাহাড়ি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গ। দুর্গের দেওয়ালগুলোর উচ্চতা ২০ থেকে ১২০ ফুট পর্যন্ত এবং চওড়ায় ২০ থেকে ৭০ ফুট। এই দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা দুর্গের মাঝখানে আবার ৪৫৭ মিটার লম্বা এবং ২২৮ মিটার চওড়া পরিধির জায়গার মধ্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রাসাদ, অট্টালিকা, ব্যারাক, অস্ত্রাগার এবং মন্দির।

মেহরানগড় দুর্গটি মাণ্ডোর এবং যোধপুর শহরের মাঝখানে অবস্থিত। ফলে মাণ্ডোর থেকে উত্তর-পূর্ব কোণের জয়পোল এবং যোধপুর শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ফতেপোল দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করা যায়।

আমরা এসেছি যোধপুর থেকে। ফলে ফতেপোল তোরণের সামনে এসে থামলাম। ড্রাইভার বল্লেন "এইটি মেহরানগড় দুর্গ, আর এই তোরণের নাম ফতেপোল। দেখছেন তোরণ গাত্রে কামানের গোলার ক্ষত চিহ্ন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরের মহারাণার কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে যোধপুরের মহারাজা এবং জয়পুরের মহারাজা জগৎসিং-এর মধ্যে এক প্রচন্ড যুদ্ধ বাধে। এই ক্ষত চিহ্ন সেই যুদ্ধে কামানের গোলার দ্বারা সৃষ্ট।'

কৃষ্ণকুমারীর প্রসঙ্গ উঠতেই আমার মনে পড়ে। টড সাহেব তার 'কর্ণেল টডের রাজস্থান' (সারানুবাদ ক্ষিতীশ সরকার) বইতে লিখেছেন—'রাণার কন্যার সঙ্গে জয়পুর রাজের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হওয়ায় দুই পক্ষের সংবাদ ও যৌতুকাদি বহন করার উদ্দেশ্যে রাজকুমারের সৈন্যদল তখন উদয়পুরে বাস করছিল। কিন্তু আর বেশিদিন তাদের থাকতে হল না সেখানে।

অদৃষ্টের ফেরে মেবারের রাণা ভীমসিংহ আজ সহায় সম্বলহীন এক সাধারণ সামন্তরাজা মাত্র। কিন্তু একদিন গিহ্লোট বংশের রাণাদের বিত্তবৈভব অন্যসব রাজার আদর্শ ছিল। আজ কিন্তু নেই। কালে আর জলে ধুয়ে সব একাকার হয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে সুখেদুঃখে এক রকম করে দিন কাটছিল। কিন্তু ভীমসিংহর এই সাধারণ জীবনযাত্রাতেও বিধি বাধ সাধল। রাণার কোন উপায় নেই। অবলম্বন নেই। শুধুমাত্র স্বর্ণপ্রতিমা কন্যা কৃষ্ণকুমারীর মুখ চেয়ে সে সব দুঃখ, সব বেদনা তুচ্ছ করতে পারছিল। শেষে তাকে নিয়েই সে শোচনীয় অবস্থায় পড়ল। এখন, কৃষ্ণকুমারীই তার জীবনে, রাজ্যে একমাত্র সঙ্কট।'

হ্যাঁ, ভীম সিংহর এই সঙ্কটের মূলে মানসিংহ। জয়সিংহর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য সেও তিন হাজার সৈন্যসহ যৌতুক উপঢৌকনাদি পাঠাল উদয়পুরে। এবার রাণা ভীম সিংহ প্রমাদ গুনল, কেননা কন্যা তার একটিই। একদিকে জগৎসিংহ অন্যদিকে মানসিংহ দুই রাজাই তার কন্যার পাণিপ্রার্থী। মানসিংহর যুক্তি হল এর আগে মারবারের রাজার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহসম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল, সে জীবিত নেই, সেই সিংহাসনে মানসিংহ বসেছে আজ, তবে কেন তার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দেওয়া হবে না!

অদ্ভুত যুক্তি! শুধু তাই নয়, মানসিংহ রাণাকে ভয় দেখাল—'আমার বাসনা যদি পূর্ণ না হয় তবে এও ঠিক জগৎ সিংহর সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ সম্পন্ন হতে দেব না আমি। তা সে যে উপায়েই হোক।' তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী রাণা ঠিক করল জগৎ সিংহর সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। রাণা ভীমসিংহ জয়পুরের সৈন্যদলকে বিদায় দিয়ে দিল। এতে ক্ষুব্ধ জগৎসিংহ এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মেবার আক্রমণ করার জন্য রওয়ানা হল।

এদিকে মারবারপতি মানসিংহ এ সংবাদ শুনে জগৎসিংহকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এক বিরাট সৈন্যদল সংগ্রহের আয়োজন করল। হলে কি হবে সে সময় মারবারে ঘোর অন্তর্বিপ্লব চলছিল। সিংহাসন নিয়ে চলছিল কাড়াকাড়ি। এ সুযোগে মারবারের প্রধান সর্দারগণ মানসিংহর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য জয়পুরের এক লক্ষ সৈন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানসিংহকে আক্রমণ করল। ফলে মানসিংহ পরাজিত হল। শত্রু সৈন্যরা রাজধানীর তোরণদ্বারে এসে অবরোধ করল। শেষ পর্যন্ত শত্রু সৈন্যরা ঢুকে পড়ল রাজধানীর মধ্যে। যে যা পারল লুঠপাট করল। আর এই সূত্রে কচ্ছবাহ সৈন্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ জোরদার হয়ে ওঠায় সেনাবল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই সুযোগে রাঠোর বীরগণ বেপরোয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুসৈন্য নিধন করল।

মহারাজ জগৎসিংহ বেকায়দা বুঝে পলায়ন করল। পুরবৎসরও যোধপুরের লুণ্ঠিত ধনরত্ন জয়পুরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পথের মধ্যে রাঠোর সৈন্যরা আক্রমণ করে আবার সব উদ্ধার করে নিয়ে এল।

যে সব সামন্ত সর্দার মানসিংহর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বিপক্ষে যোগ দিয়েছিল তারা মাতৃভূমির এই লাঞ্ছনা দেখে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবার মানসিংহর দলে চলে এল। বুঝেছিল অম্বরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ না দিলে কিছুতেই রাঠোর দুর্গ লুঠ করতে সাহস পেত না কচ্ছবাহরা।

যাই হোক, কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের কথা ঠিক, আমাদের ড্রাইভারের মুখে শুনে বুঝতে পারলাম। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল সে কথা জানতে হলে টড সাহেবের ভাষাতেই বলি—

'মারবার এবং অম্বরের যুদ্ধ এক রকম থেমে গেল ঠিকই, কিন্তু যাকে নিয়ে এই যুদ্ধ সেই কৃষ্ণকুমারীর আশা কেউই ত্যাগ করতে পারল না। আমীর খাঁর প্ররোচনাতেই মান সিংহর মনে আবার আশার মুকুল ধরেছিল। ষোড়শী সুন্দরী কৃষ্ণকুমারীকে অঙ্কলক্ষী করার বাসনা আবার প্রবল হয়ে উঠল তার।

কৃষ্ণকুমারীর দেহে যৌবনের জোয়ার এসেছে। স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের তীরে এসে আছাড় খায় কামনার ঢেউ। তার চোখের তারায় অনেক স্বপ্ন, অনেক প্রেম, অফুরন্ত বাসনা। কিন্তু হায় সেই অনাঘ্রাত ফুল কোন পূজার থালাতেই স্থান পেল না। সূর্যের প্রচণ্ড তেজে শুকিয়ে ঝরে গেল সে ধুলোয়।'

রাজস্থানের কমলিনী কৃষ্ণার নিরুপম রূপযৌবন অতৃপ্ত রয়েই বিদায় নিল। তার মত পরমা সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে খুব বেশী জন্মায় না। পিতৃকুলে সে উচ্চ, শিশোদীয়, মাতা আনন্দলবাঈ পত্তনের সৌর-কন্যা। এই দুই উচ্চকুলের রক্ত প্রবাহিত তার ধমনীতে। তাই সে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্যে নিজের জীবন বলি দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুবই অল্প। রোমের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নিউসিয়াসের কন্যা ভার্জিনিয়া। এপিয়স ক্লডিয়স নামে এক ব্যক্তি ভার্জিনিয়াকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল। নিউসিয়াস প্রাণাধিকা কন্যার সতীত্ব রক্ষার কোন উপায় না দেখে প্রকাশ্যে ফোরাম প্রান্তরে নিজের হাতে হত্যা করেছিল তাকে। আরও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ গ্রীসে আছে। মহাযোদ্ধা এগামেননের কন্যা ইফিজিনিয়া। আলীস দ্বীপে গ্রীসের যুদ্ধ-জাহাজ চড়ায় আটকে যায়। ডায়ানা দেবীর প্রসাদ লাভ করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে দেবীর চরণে কন্যা ইফিজিনিয়াকে বলি দিয়েছিল। অবশ্য গ্রীক পুরাণে উল্লেখ আছে, দেবী ডায়ানা বলি দিতে না দিয়ে নিজে গ্রহণ করে নিয়ে গিয়েছিল।

হতভাগ্য রাঠোর নৃপতিকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর পাষণ্ড আমীর খাঁ উদয়পুরে এসে হানা দিল। তার মত নিষ্ঠুর এবং বিশ্বাসঘাতক নর-খাদক পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী

খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমীর খাঁ দাবি জানাল, কৃষ্ণকুমারীকে মানসিংহের হাতে সমর্পণ করতে হবে। তা না হলে ভীম সিংহকে রেহাই দেবে না সে। এ ব্যাপারে আমীরকে সাহায্য করেছিল বিশ্বাসঘাতক চম্পাবৎ অজিতসিংহ। রাণা ভীমসিংহ এই মহা বিপদে পড়ে দারুণ চিন্তিত, ভীত হয়ে পড়ল। কিভাবে প্রাণাধিকা কন্যার জীবন ও মাতৃভূমির সম্মান রক্ষা হয় তার কোন উপায় ঠিক করতে পারল না সে। অবশেষে ঠিক হল, কৃষ্ণাকে বলি দেওয়া হবে। কিন্তু এই পাপকর্মের নায়ক হবে কে? এমন কে আছে যে নির্মল শতদলকে দলিত করবে।

সর্দার সামন্ত এবং আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে এক জরুরী সভা ডাকল রাণা। দৌলতসিংহ নামে শিশোদীয় কুলের এক সামন্ত উপস্থিত ছিল সেখানে। তাকেই বলা হল এই লোমহর্ষক কান্ডের নায়ক হওয়ার জন্যে। রাণার নির্দেশ শুনে ঘৃণায়, বিস্ময়ে শিউরে উঠল দৌলত।

—না, না, এ কিছুতেই সম্ভব না আমার পক্ষে, আমি পারব না। তার বদলে আমাকে বলি দেওয়া হোক, আমি এই নৃশংস কাজের নায়ক হতে পারব না। রাণার আজ্ঞা পালনে আমি অক্ষম, এ কথায় রাজভক্তির অবমাননা হল জানি, কিন্তু এই নিষ্ঠুর কাজ করে আমি রাজভক্তির নিদর্শন রাখতে চাই না।'

দৌলতসিংহ ছুরিকা গ্রহণ করল না। এর পর মহারাজ যোয়ানদাসের ওপর এই নৃশংস কাজের ভার দেওয়া হল। ভীমসিংহের পিতার এক উপপত্নীর গর্ভে তার জন্ম। বেশ্যা-গর্ভজাত বলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, সে স্বভাবত পাষাণ-প্রাণ। এই কঠোর নির্দেশ শোনার পর তার হৃদয় ব্যথিত হওয়া দূরে থাক বিচলিত হল না একটুও। কিন্তু কৃষ্ণার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতেই তার সারা দেহমন শিউরে উঠল। শাণিত ছুরিকা খসে পড়ল হাত থেকে। প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল সে সেখান থেকে। মুহূর্তের মধ্যে এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা ছড়িয়ে পড়ল সারা অন্তপুরে। রাণার এই অভিসন্ধির কথা শোনামাত্র রাণী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল।

কৃষ্ণকুমারীকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই। মর্মভেদী আর্তনাদে রাজঅন্তপুর গুমরে উঠল। আবালবৃদ্ধবনিতা চোখের জলে ভিজিয়ে দিল বুক। রাণা নিজে যাকে উৎসর্গ করতে চায় কেউ কি তাকে বাঁচাতে পারে? কিন্তু হত্যাই বা করবে কে তাকে? অতিবড় পাষাণ-হৃদয় ছুরিকা ফেলে পালিয়ে গেছে। তার রূপের বহ্নির সামনে দাঁড়াতে সাহস নেই কারো। অন্তত কোন রক্তমাংসে গড়া পুরুষ তা পারল না। শেষে নিযুক্ত করা হল এক নারীকে। না, ছুরিকা দিয়ে নয়, বিষ খাইয়ে মারা হবে তাকে। বিষের বাটি কৃষ্ণকুমারীর হাতে তুলে দেওয়া হল রাণার নির্দেশে। সব জেনে শুনেও বিষপাত্র সুধাপাত্র জ্ঞান করে পান করল কৃষ্ণা। কিন্তু কি আশ্চর্য, কিছুই হল না। বিষ কোন ক্রিয়া করতে পারল না তার দেহে। মা ধুলোয় লুটিয়ে মাথা কুটছে। কিন্তু রাণার নির্দেশের কোন রদ হল না। কৃষ্ণার দিকে চেয়ে কিছু অনুমান করা সম্ভব না। তার চোখে জল নেই, শান্ত সমাহিত মুখমন্ডল,

কোনও অনিশ্চিত শঙ্কা তাকে এক বিন্দু বিচলিত করতে পারে নি। মুখে তার কথা নেই, চোখের পলক পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যায় না। যেন এক ইন্দ্রলোকবাসিনীর মর্মর মূর্তি। মাতার আকুল ক্রন্দনে কথা বলল সে, 'মা, কেন কাঁদছ মা, কাঁদার তো কোন কারণ নেই। এ জীবন অনিত্য, যন্ত্রণায় সারাক্ষণ জ্বলতে হয় মানুষকে। আজ আমি এ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দলোকের পথে পা বাড়িয়েছি, এতে তুমি আনন্দ কর, কেঁদ না। তোমার চোখের জলে আমার যাবার পথ পিছল করে দিও না, মা। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, কেনই বা করব? তোমার গর্ভেই তো আমার জন্ম। তুমি বীর প্রসবিনী মা। আমি মৃত্যুকে ভয় করব? আমি রাজপুত কুলের কুমারী হয়ে জন্মেছি তো অপঘাতে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্যেই। তবে এতদিন যে জীবিত ছিলাম, সে জন্য আমার পিতাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

রাজপুতদের মধ্যে শিশু হত্যার জঘন্য প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণার কথা থেকেই বোঝা যায়। যাই হোক, পরপর তিনবার কালকূট খাওয়ানোর পরও তাকে হত্যা করা গেল না। রাণা এবং তার সামন্ত সর্দাররা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। এ কি কান্ড! তবে উপায়? আমীর খাঁ এবং অজিতের চক্রান্ত ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে। এই ক্ষণেই কন্যাকে ইহজগত থেকে সরাতে না পারলে সারা মেবার এবং অন্তঃপুরের ইজ্জত একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আরও একবার এক ডেলা আফিং এর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেতে দেওয়া হল তাকে। করুণাময় ভগবানের কাছে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা জানাল সে, 'ভগবান, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। আর পারি না আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে। তোমার পায়ে আমাকে ঠাঁই দাও।

পাষণ্ডদের উদ্দেশ্য সফল হল। মর্ত্যের অপ্সরী অনন্ত-নিদ্রায় অনড় হয়ে পড়ে রইল। কৃষ্ণকুমারীর কথা মনে পড়ায় কিছুক্ষণের জন্যে বিমর্ষ হয়ে পড়ি। তাই গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। ততক্ষণে আমার সাথীরা অনেকদূর এগিয়ে যায়। পর্যটকের পক্ষে বিষণ্ণতা সাজে না। সুখ দুঃখ সব কিছুতেই অবিচল থাকতে হয়। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠি এবং দ্রুত চলতে থাকি ফতেপোল ধরে।

ফতেপোল তোরণের পর আমরা যথাক্রমে অমৃতি পোল এবং যোধাফলসা পেরিয়ে এলাম লোহাপোলে।

লোহাপোলে রাজস্থানী-বাদ্যবাদকগণ বাজনা বাজাচ্ছেন আর তাদের ঘিরে রয়েছে অনেক ভ্রমণার্থী। তাদের সঙ্গে গাইড রয়েছে। এরা ইউ-পি থেকে এসেছেন। আমরাও এই দলের সঙ্গে এগোতে থাকি।

লোহাপোলটি আগের তোরণ দুটি থেকেও মজবুত। তার উপর কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরে ইঞ্জিনীয়ারদের তৈরি করা পাথরের বেড়াজাল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্গরক্ষার প্রয়োজনে পাথর সাজিয়ে প্রাচীর তোলা হয়েছে। এর ফলে কামানের গোলাতে দুর্গের কোন ক্ষতি করতে পারত না।

গাইড বললেন—

'লোহাপোলটি তৈরি করেছেন মহারাজা বিজয়সিং। এই তোরণটি এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে, আর সেই সঙ্গে যশবন্ত সিং-এর রাজমহিষী হরিরাণীর স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্তও উজ্জ্বল হয়ে আছে।'

তিনি বলতে থাকেন।

'একদা মহারাজ যশবন্ত সিং-এর সঙ্গে শত্রুপক্ষের যুদ্ধ বাধে। মহারাজ শত্রুর রণকৌশলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এলেন। এইভাবে কাপুরুষের মত পালিয়ে আসাটা রাজপুতদেব কাছে অগৌরবের বিষয়। সাহসী বীর রাজপুতদের নীতি হল— হয় যুদ্ধে জয়লাভ করবে নয়তো বীরের মত যুদ্ধ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দেবে।

মহারাজ যশবন্ত সিং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মত পালিয়ে এলেন ব'লে রাজমহিষী হবিবাণী মহাবাজকে লোহাপোল দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে দেননি। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে বাজপুতদের স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।'

'আর ঐ দেখুন সতীদেব হস্ত চিহ্ন।'

লোহাপোলের পরে টিকিট কাউন্টার। প্রবেশ মূল্য ১০্। টিকিট কেটে এগোতে থাকি। উপবেব দিকে তাকাতেই রাজপ্রাসাদের জাফরির জানালা এবং ব্যালকনি নজরে পড়ল। খুব আকর্ষণীয়। আমার সঙ্গীরা সব এগিয়ে গেছে। ডানদিকে ফোর্ট রেস্টুরেন্ট। সুরযপোল দিয়ে ঢুকি মিউজিয়ামে। এখানে দাঁড়িয়ে আছে মিউজিয়ামের নিজস্ব গাইড। ট্যুরিস্টদের গাইড করার জন্য এবা নিযুক্ত। হলে কি হবে আমার অভিজ্ঞতা হল এদের আলাদা ভাবে বখশিষ না দিলে তেমন সহযোগিতা করে না।

যাইহোক একজন গাইড ঠিক করে নিলাম। শুরু হল আমার দুর্গ দেখা।

মেহরানগড় মিউজিয়াম

Meherangarh Meuseum Historic Fort of Jodhpur 1459 A D

প্রথমে ঢুকি নক্করখানায়। এখানে মহারাজদের সময়কার বাদ্যযন্ত্রাদি, ঢাকঢোল রাখা হয়েছে।

শৃঙ্গার চৌকি

শৃঙ্গার চৌকি সাদা মারবেল পাথরের তৈরি। শৃঙ্গার চৌকিটি ছিল মহারাজদের রাজ্যাভিষেক মহল। মহারাজাদের মৃত্যুর এগার দিন পর এখানে যুবরাজদের রাজকীয় মর্যাদায় অভিষেক কর্ম সম্পন্ন হত। শৃঙ্গার চৌকিতে শ্বেত পাথরের আসনটির নাম রাজতিলক।

হাতি হাওদা হল

শৃঙ্গার চৌকির বামদিকে রয়েছে অবিশ্বাস্য রকমের পাল্কি ও হাওদার সংগ্রহশালা। রূপার তৈরি হাতির অলঙ্কার। মহারাজারা হাতির পিঠে যেসব আসনে বসতেন সেসব হাওদা, হাতি বাঁধার চেইন, হাতির ঘন্টা এবং ছড়ি।

পালকিখানা

পাশের ঘরে মহারাণীদের ব্যবহৃত পালকির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পালকি, 'মহাদোল'। মালবের বাহাদুর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসাবে এটি নিয়ে আসেন যোধপুরের মহারাজা, ১৭৩০ সালে। মহাদোলটিতে কাঠের সুক্ষ্ম কারুকার্য যেমন আছে তেমনি মহাদোলটি সোনার-পাতে মোড়া।

মহারাজা-মহারাণী এমনকি মহারাজার মেহমানদেরও আলাদা পালকি ছিল। এছাড়া বিবাহের প্রয়োজনে ব্যবহৃত পালকিও রয়েছে। এই পালকিটিতে চারজন বাহক ছিল। মহারাণীর পালকির বাহক ছিলেন ৮জন। আবার মহারাজার পালকিতে চেয়ার থাকত বসার সুবিধার জন্য, সেটিও আছে।

শৃঙ্গার চৌকির বামদিকে আরো খানিকটা দূরে রয়েছে খোয়াব-কা-মহল, অথাৎ ঘুম-ঘর। প্রাসাদের অন্যদিকে রয়েছে মোতিমহল। খোয়াব-কা-মহল না গিয়ে আমরা এলাম শিলেখানায়।

শিলেখানা

মহারাজাদের ব্যবহৃত তরবারি। সোনার এবং রূপোর হাতল; তোপ, তোপের বিভিন্ন অংশ, তরবারি, ঢাল, কুড়াল, চাকু, বিভিন্ন অস্ত্র। আবার হাতে তৈরি পর্দা, ৩০০ বছরের পুরানো কার্পেট, বিবাহ উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত তোরণ, সবই রয়েছে মিলে মিশে; পরীর আকারের মদের বোতল, কত কি।

আবার হাতির দাঁতের তৈরি সাজার বাক্স। মহারাজা টক্কর সিং-এর মহিষী এই বাক্সটি ব্যবহার করতেন। আবার কোথাও পিতলের তৈরি হুক্কা, মদের বোতল, কেটলী, কাপ-প্লেট, সর্বই থরে থরে সাজানো। এছাড়া প্রচুর অস্ত্রের প্রদর্শনী হচ্ছে এখানে। বন্দুক গ্যালারিতে—বন্দুক, তলোয়ার, ছুরি, বিভিন্ন রকম অস্ত্র। আর রয়েছে গাঙ্গুরের মডেল, তালার বিভিন্ন অংশ খুলে দেখান হয়েছে। একটি তালার ওজন ১৭½ কেজি। আয়নাওয়ালা তাক, কত কি দেখার!

বীর দুর্গাদাসের ছবি এঁকেছেন জার্মান শিল্পী A.H. Muller-এ সবই ধৈর্য্য ধরে দেখার বিষয়। চিত্রের থ্রি-ডায়মেনসন্যাল এফেক্ট সকলকে বিস্মিত করে তোলে।

উপরের তলায় আসি—প্রিন্টিং বিভাগে। এখানে শুধু পেইন্টিং এর কাজ। ১৬ থেকে ১৯ শতকের মিনিয়েচার প্রিন্টিং দেখে চোখ ফেরানো দায়। কাগজের উপর মুঘল এবং

রাজপুত ঘরানার প্রিন্টিং, সোনালী রং করা। গোল্ডেন কালার। চামুন্ডা দেবীর হাতে মহিষাসুর বধ—অনবদ্য সৃষ্টি। এই হলে টাঙ্গানো আছে পিকনিক টেন্ট। মহারাজাদের চড়ুই ভাতির সময় এই তাঁবু ব্যবহার হত। আবার পাশের প্রার্থনা ঘরের ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি। ঝাড়বাতির কাচে আলো পড়ে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

এখান থেকে আসি ফুল মহলে। এই মহলটি রয়েছে তৃতীয় তলে।

ফুলমহল

ফুলমহলটি তৈরি করেন মহারাজা অভয় সিং। এখানে রয়েছে পুষ্পদল। ফুলের পাপড়ি যেন জীবন্ত। সতেজ ফুল। ফুলমহলের সিলিং এবং থামে সোনার কাজ দেখার মত। চোখ ফেরানো দায। বিশেষ করে ভগবান বিষ্ণু, শিব এবং কৃষ্ণের চিত্র সোনার কাজের জন্য উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আর নিচের সারির রাগ-রাগিণীই বা কম কিসে।

স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য উদাহরণ। আবার মেঝেতে কাশ্মিরী কার্পেট বিছানো। তার উপর মহারাজের আসন এবং ছত্রী। যোধপুরে যতগুলো মহল আছে তার মধ্যে এই মহলটি বোধ হয শ্রেষ্ঠ।

মর্দানা মহল

এখান থেকে আসি চতুর্থ তলে। এটিকে মর্দানা মহল বলে। এখানে রয়েছে খাঁটি পারস্যদেশীয় সোনার সিংহাসন। মহারাজা ভকত সিং-এর শয়ন কক্ষ। দেড়শ বছরের পুরানো বিছানা। বিছানার উপর হতে টানা পাখা ঝুলানো। সিলিং এবং দেওয়াল পেইন্টিং করা। তাঁর উপপত্নী আনারা বেগমের মুক্তো বসানো জুতো।

এখান থেকে আসি দৌলতখানায়

দৌলতখানা

দৌলতখানায় হাতির দাঁতের তৈরি মডেল আছে। রেল স্টেশনের মডেল। স্টেশনে ট্রেন এবং রেলের স্টাফ বক্রাকারে সাজানো। সুন্দর এবং রুচিশীল পরিবেশনা। কিছুটা দূরে মার্বেল পাথরে তৈরি টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে বিভিন্ন সাইজের হুক্কা বা গুড়গুড়ি। তার মাঝখানে নাগর দুর্গের মডেল।

এখান থেকে আসি ঝাক্কিমহলে। ঝাক্কিমহলকে জেনানা মহলও বলে।

ঝাক্কি মহল

ঝাক্কি অর্থাৎ ঝাঁকুনি খাওয়ার মহল। এখানে বাচ্চাদের জন্য তৈরি অনেক দোলনা আছে। কোন কোন দোলনায় আবার মশারি খাটানো। রয়াল ফ্যামিলির বাচ্চাদের এখানে দোল খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। এমনকি মহারাজাদের দোলনাও এখানে আছে। বর্তমান মহারাজা গজসিং-এর পিতা এই দোলনা ব্যবহার করতেন।

এর পর আসি মোতি মহলে।

মোতি মহল

মোতিমহল তৈরি করেন মহারাজা সুরসিং ১৮৮১ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে। মোতি মহলের দেওয়াল এবং সিলিং সোনার পাতে মোড়া। এর দরবার হলটিতে ৮০ কেজি সোনা লেগেছিল। ভাবতে অবাক লাগে। মহারাজাদের অর্থবৈভবের পরিমাণ কিছুটা অনুমান করা যায় প্রাসাদগুলোতে সোনার ব্যবহার দেখে। প্রাসাদগুলোর জালির কাজ এবং সুক্ষ্ম কারুকার্য দেখে অবাক হতে হয়। রুচি এবং শিল্পবোধ কত উঁচু পর্যায়ের ছিল!

সামনে হোলি চক। মহারাজা এবং মহারাণী এখান থেকেই হোলি খেলা দেখতেন। হোলিচকের চারদিকেও জালির কাজ করা। এখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার গাইড বললেন—'ঐ দেখুন মহারাজাদের মন্দির। এখানে গৃহদেবতার পূজা হত। বাইরের ছাদে রয়েছে কামানের গোলা। না, মন্দিরে গেলাম না! ফিরে আসি বাসে। আমার সতীর্থগণ আমার আগেই ফিরে এসেছেন।

বাস এগিয়ে চলেছে।

মেহরাণগড় দুর্গ থেকে ফেরার পথে পড়ল যশবন্ত থারা। দুর্গের কাছেই এই থারা।

যশোবন্ত থারা

মেহরাণগড় দুর্গের লাগোয়া এই স্মৃতি সৌধটি তৈরি করেন মহারাজা যশবন্ত সিং-এর বিধবা পত্নী, স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্বেত মার্বেল পাথরে তৈরি করা হয় এই স্মৃতি সৌধ। এই শ্মশান ভূমিতে যোধপুরের অনেক মহারাজাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এই জন্য শ্মশানক্ষেত্রটি সংরক্ষিত। স্মৃতিসৌধটিতে মহারাজাদের বংশপঞ্জী উৎকীর্ণ রয়েছে। যশবন্ত সিং ছাড়া, সর্দার সিং, সুমের সিং, উমেদ সিং এবং হনুমন্তসিং-এর স্মৃতিস্তম্ভও আছে এখানে।

সারা যোধপুরের এই একমাত্র স্মৃতিসৌধ যা ঝকঝকে মার্বেল পাথরে তৈরি হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে দর্শনের জন্য। প্রবেশ মূল্য দশটাকা। থারার বাইরে জুতো রেখে প্রবেশ করতে হয়, কেননা এই স্মৃতিসৌধেই রয়েছে যশবন্ত সিং-এর গুরুজীর মন্দির। এখানে নিত্য পূজা হয়। থারায় প্রবেশ করলে প্রথমে নজরে পড়ে একটি উঁচু বেদী। বেদীর উপর যশবন্ত সিং এর ছবি। এখানেই যশোবন্ত সিং-এর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বেদীর পিছনে যশোবন্ত সিং-এর গুরুজীর মন্দির। আর চারদিকের দেওয়ালে যোধপুরের বাকি মহারাজাদের তৈলচিত্র এবং বংশপঞ্জী লিপিবদ্ধ আছে।

বাইরে থেকে খুব সুন্দর দেখায় থারাটি। ফিরে আসি বাসে। আমাদের বাহন এগিয়ে চলেছে উত্তর দিকে। আমাদের আজকের মত শেষ দ্রষ্টব্য মান্ডোর গার্ডেন। আমি গতকাল মান্ডোর দর্শন করেছি। সুতরাং আজ বাগিচায় পায়চারি করে কাটিয়ে দিই বাকি সময়। আমার সতীর্থদ্বয় ফিরে এলে বাস চলতে থাকে। ঘুমর ট্যুরিস্ট বাংলোয় ফিরে আসি।

ব্যবস্থাপিত সফরে শহর দর্শন শেষ হলেও আমার যোধপুর ভ্রমণ শেষ হয়নি। আমি এলাম হাইকোর্টের লাগাও পাবলিক পার্কে। পাবলিক পার্কের পোষাকী নাম উইলিংটন বাগিচা। এখানে একটি ছোট চিড়িয়াখানা আছে। চিড়িয়াখানায় ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড এবং হরেক রকম ছোট ছোট পাখি আছে। এসব দেখে এলাম সর্দার মিউজিয়ামে।

সর্দার মিউজিয়াম

মিউজিয়ামটি শুক্রবার এবং সরকারি ছুটি ছাড়া সবদিন খোলা থাকে। প্রবেশ মূল্য পাঁচ টাকা। মিউজিয়ামে প্রবেশ পথের সঙ্গে Natural History গ্যালারি। এখানে কুমীর, বাঘ, সিংহ—এই সব জানোয়ারের খড় ভরা অবয়ব ধরে রাখা হয়েছে। শুধু কি তাই। দুটি বাঘের লড়াই, একি কম কথা! আবার কাঁটাওয়ালা গাছে পাখি। ছোট ছোট অনেক পাখি, এসব পাখিও সংরক্ষিত।

এই গ্যালারিতেই পিতলের তৈরি পাত্র—এটি নাগরের শিল্প। তাছাড়া ঝিনুক ও মুক্তার তৈরি শৌখিন জিনিস। চিনেমাটির প্লেট, তার উপর নকসা করা, টী-কাপ, বদনা, কলস্, পাথরের প্লেট, হুক্কা, রাজস্থানী ঘরানার বিভিন্ন পুতুল। কি নেই! স্থানীয় শিল্প সম্ভার এবং খোদাই কর্ম দেখে রাজস্থানের শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়।

আবার পুতুলের দ্বারা রাজস্থানী বিশেষ করে মাড়োয়ারের জীবন যাত্রা প্রদর্শিত হচ্ছে। পালকি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুতুল বাহকরা, এছাড়া প্রাত্যহিক জীবন ধারনের ছবি পুতুলের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে।

কাঠের তৈরি বাক্স, সাজের বাক্স, পট ও বিভিন্ন ব্যবহার্য পাত্র। প্লেনের মডেল ও তোপ। পুরানো মডেলের বন্দুক, রাইফেল, ঢাল, তলোয়ার, বল্লম, সভকি... মোটের উপর বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, ব্যবহার্য দ্রব্য এবং পোষাক, কত কি! সব থেকে আকর্ষণীয় এরোপ্লেনের মডেলগুলো। হরেক রকম এরোপ্লেন। এছাড়া জাহাজ আর সাবমেরিনের মডেল সাধারণতঃ মিউজিয়ামে কম দেখা যায়।

এসব দেখে ঢুকলাম আর্কিওলজি গ্যালারিতে। এই পুরাতত্ত্ব গ্যালারিতে নবম শতাব্দীতে পাথরে খোদাই গণেশ মূর্তি, গৌর দর্শন, বিষ্ণু (যোধপুর), দ্বাদশ শতাব্দীর বিষ্ণু কিরাড়ু (ওঁশিয়ান)। পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহে আরো অনেক পাথরে খোদাই মূর্তি দেখার আছে, যেমন—পদ্মপাণি (মান্ডুর) এটি গুপ্তযুগের মূর্তি। অখণ্ড পাথরে খোদাই চিত্র, বিষ্ণুর শয়নশয্যা। বিষ্ণুর এই মূর্তিটি অখণ্ড পাথরেই গড়া ছিল কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বিষ্ণুর কোমর থেকে ভেঙ্গে যায়। আর সে অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

ইন্দ্রাণী (আবু) এটি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মূর্তি, নৃত্যরত মূর্তির প্যানেল, এটি দশম শতাব্দীর মূর্তি। এমন আরো অনেক মূর্তি আছে। আর আছে দুটি বড় মাটির জার (মটকা)।

তৃতীয় এবং শেষ দ্রষ্টব্য কলা বিভাগ

এখানে এ্যালবাম, কারুকার্য করা বাক্স, কাঠের পুতুল (মেড়তা), ধাতুর তৈরি (পিতল) প্ল্যানেট ও জোডিয়াক। মোট ২৮টি প্ল্যানেট এবং ১২টি জোডিয়াক। লোহার বড় তালা (ভিন্ন ভিন্ন অংশে দেখান হয়েছে), উটের হাড়ের তৈরি পাত্র, কারুকার্য করা চাদর।

মাড়োয়ার মিউজিয়ামের নক্সি কাঁথা, চাদর। দোলনা—সোনায় পালিশ করা, কাচ ঘরে কাচের বিভিন্ন পাত্র। এছাড়া দেওয়ালে টাঙ্গানো মহারাজাদের তৈলচিত্র।

পাশের হলের (ডান দিকে) মহাবীর কক্ষটিতে রয়েছে মহাপুরুষদের পাথরের মূর্তি। সব মূর্তি কাঠের মঞ্চে বসানো। সর্দার মিউজিয়ামের প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুগুলো বেশির ভাগ—মান্ডোর, কিরাডু, ওশিয়া, সাঞ্চোর এবং নাগর থেকে সংগৃহীত।

বিকেলবেলা ভেবেছিলাম কৈলানা লেক এবং মহামন্দিরটি দেখব। কিন্তু এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় আর যাওয়া হল না।

কৈলানা লেক

কৈলানা লেকটি যোধপুর শহরের পশ্চিম দিকে, ৯ কিমি. দূরে অবস্থিত। ১১৩ কিমি দূরের জওয়ান বাঁধের সঙ্গে লেকটির সংযোগ ঘটান হয়েছে, আর এই কাজটি করেন স্যার প্রতাপ। কৈলানা লেকের জলই পান করতে হয় যোধপুরবাসিদের।

মহামন্দির

শহর থেকে মাত্র আড়াই কিমি দূরে রয়েছে মহামন্দির শহর। মন্দিরের নামেই শহর। অনেক পুরানো শহর। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে এই শহরের অবস্থান। আর মহা-মন্দির এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়। মন্দিরটির ছাদ ১০০টি থামের উপর ধরা আছে। মন্দিরের পূজ্যদেব শ্রীনাথজী।

বিকেলবেলা এখানকার দর্পণ সিনেমা হলে গডজিলা দেখলাম। সুন্দর হল। কিন্তু দর্শকের সংখ্যা কম। বড়জোর শ-দেড়েক লোক হবে। যা আমাদের কোলকাতার যে কোন হলের তুলনায় খুব কম।

চার

৯ই সেপ্টেম্বর'৯৮।

সকাল ছটায় ইন্টারস্টেট বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছালাম। ৯নং কাউন্টার থেকে ওশিয়ার টিকিট দেয়। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর ওশিয়ার বাস ছাড়ে। ওশিয়া পর্যন্ত ভাড়া ১৫.৫০ টাকা। যোধপুর থেকে ওশিয়ার দূরত্ব ৬৬ কিমি। ওশিয়া পৌঁছাতে সময় নেয় দেড় ঘণ্টা। ওশিয়ার মূল দ্রষ্টব্য মাতাজী মন্দির। ট্রেনেও যাওয়া যায় ওশিয়া। যোধপুর থেকে সকাল ৮টায় ট্রেন ছাড়ে। পোখরান, জয়সলমীর থেকেও বাসে আসা যায়। যোধপুর-ওশিয়ার মধ্যে শেয়ার ট্যাক্সিও যাতায়াত করে।

ওশিয়া ঃ

অতীতকালে ওশিয়ার নাম ছিল পতঙ্গিরি। রাজা উত্থল দত্ত এর প্রতিষ্ঠাতা। ওশিয়া হিন্দু এবং জৈন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। খৃষ্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে গড়ে ওঠা মন্দিরগুলোর মধ্যে ১৬টি মন্দির এখনও টিকে আছে। এদের মধ্যে ছোট পিড়া দেউল এবং আয়ত আসন বিশিষ্ট একটি মন্দির আছে। বেশির ভাগ মন্দির স্তম্ভযুক্ত। তার পাশে কক্ষাসন বিশিষ্ট মণ্ডপ। এই রেখমন্দিরগুলির সঙ্গে খাজুরাহো এবং গুজরাটের খেড় ব্রহ্মার নিকট সাদৃশ্য আছে।

হিন্দুমন্দিরগুলো সূর্য, বিষ্ণু বা শক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মাতাজীকা মন্দির বা শচীয়া মাতা মন্দির বন্ধ্যা নারীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। কেননা দেবীর কাছে সন্তান কামনা করলে কেউ নিষ্ফল হয় না। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ আসেন মাতাজীকে পূজো দেবার জন্য। স্থানীয় মানুষ মনে করেন মন্দিরটি প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো।

ওশিয়ায় বছরে দুবার মেলা বসে। একটি হিন্দুদের অসোজ। সুদি উপলক্ষে ১লা অক্টোবর থেকে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত চলে এ মেলা। অন্যটি জৈন মন্দিরে ফাগুণ মাসে হয়। এ মেলাকে পট মহোৎসব বলে। কিন্তু মজার বিষয় হল ওশিয়া গ্রামে কোন জৈন পরিবার নেই। এক সময়ের জৈনদের দাপট কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

সকাল ছটায় ওশিয়ার বাসে চাপলাম। ৯নং কাউণ্টারে ওশিয়ার টিকিট দেয়। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর ওশিয়ার বাস ছাড়ছে। যোধপুর থেকে ৬.৩০ মিনিটে বাস ছাড়ল। ওশিয়া এসে পৌঁছালাম সকাল ৮টায়।

মাতাজী মন্দির

একটি [illegible] পাহাড়ের চূড়ায় [illegible] উঠেছে মন্দির। নিচে থেকে মন্দির পর্যন্ত সিঁড়ি পথ। কয়েক [illegible] অন্তর [illegible] তোরণ। খুব সুন্দর লাগে তোরণের সারি দেখে। মন্দির চত্বরের সামনে শেষ তোরণ। এই তোরণের নিচে লোহা এবং কাঠের তৈরি মজবুত দরজা। এই দরজার পাশে রয়েছে বিশ্রামকক্ষ। চাইলে এখানে থাকতে পারেন। দশ টাকায় মিলবে ঘর। খাওয়ার আয়োজনও ভাল। মাতাজীর ভক্তদের যাতে খাওয়া থাকার অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রেখেছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

অখণ্ড পাথরের থামের উপর দাঁড়িয়ে আছে মন্দির। থামগুলোর গায়ে উপরের অংশ নানা রংয়ের কাচ দিয়ে মোড়া। আর নিচের অংশে টালি। মূল চূড়ার নিচে গর্ভ মন্দির। গর্ভ মন্দিরে মায়ের আসনের সামনে রূপোর দরজা। মায়ের শিলামূর্তি। মন্দিরের প্রতি দুটি স্তম্ভের মধ্যে আর্চ করা।

গর্ভমন্দিরটি কয়েক ধাপ সিঁড়ির উপরে বেদী নির্মিত। মাতাজীর মূর্তির উপর চাঁদোয়া। সকাল বেলার পূজোর আয়োজন চলছে। এক সময় পূজা শুরু হল। গর্ভ মন্দিরের সামনে মহিলারা এসে জড় হয়েছেন।

আমি মাকে প্রণাম করে নিচে আসি। পূজা অন্তে পূজারী আরতি শুরু করলেন। আর তখন বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল। একজন মহিলা ড্রাম বাজাতে শুরু করলেন। পাশে দেখছি আরো বাদ্য বাজছে মটরের সাহায্যে। বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের সাহায্যে কাঁসর ঘণ্টা এবং ঢাক বাজানো অভিনব ব্যাপার। আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি অন্য মন্দিরগুলো। একই মন্দির চত্বরে রয়েছে—সূরীয় ভগবান, লক্ষ্মীনারায়ণ, সন্তোষীমাতা, গজানন, শঙ্কর ভগবান এবং শিবমন্দির।

আবার বাইরের দিকে রয়েছে হনুমান, অম্বামাতা, সত্যনারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, চন্ডিকা মাতা, নবদুর্গা, গরুড়জী এবং গণেশজী মন্দির।

মন্দির দর্শন শেষ। ফিরে আসি ওশিয়া বাজারে। এখানে একটি মিষ্টির দোকানে আমার লাগেজ রয়েছে। লাগেজ নিয়ে একটি শেয়ার ট্রেকারে চাপি। ফিরে চলেছি যোধপুর। যোধপুর থেকে ঘুরপথে বাড়মের হয়ে যাব জয়সলমীর।

১৯৯৫ সালে যোধপুর থেকে পোখরান হয়ে জয়সলমীর গিয়েছিলাম। এই পথটি খুব আকর্ষণীয়। শহর ছাড়ানোর পরেই শহরের অট্টালিকা পথঘাট অদৃশ্য হতে থাকে। বেশ কিছুটা গেলে বোঝা যায় নিচু পাহাড়ের উপর গড়ে উঠেছে যোধপুর শহর। যত দূরে যাওয়া যায় পাহাড় শ্রেণী অদৃশ্য হতে থাকে, পরিবর্তে মরুভূমির বাবলা কাঁটা আর ঝোপ ঝাড় হয়ে দাঁড়ায় পথের বন্ধু।

দীর্ঘ পথে পড়ে মরুভূমির অনাবাদি জমি। আবার মাঝে মাঝে গ্রাম এবং ফসলাদিও দেখা যায়। এপথেই পড়ে পোখরান। পোখরান এপথের একটি টারনিং পয়েন্ট। পোখরান থেকেই একটি পথ যায় জয়সলমীর আর একটি পথ যায় বিকানীরের দিকে।

গ্রামের বাড়িগুলোতে মাঝে মাঝে, পাকাবাড়ি দেখা যায়। বেশির ভাগ বাড়িতে মাটির দেওয়াল, বজরার ডাঁটা দিয়ে ঘরের ছাউনি আর দেখা যায় বজরা কিংবা যবের গাছ।

এপথের উল্লেখযোগ্য শহর যোধপুরের পর যেচু। যেচুর পর পোখরান। পোখরান একটি বর্ধিষ্ণু শহর। এখানে একটি ঐতিহাসিক কেল্লাও আছে। পোখরান বহু কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে যতটা এর পরিচিতি আছে তার থেকে বেশি গুরুত্ব এবং পরিচিতি লাভ করেছে পরমাণু পরীক্ষার স্থল হিসাবে।

১৯৭৫ সালে থর মরুভূমির অন্তর্গত পোখরানে প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তখন থেকে সারা বিশ্বে এর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। আর এবার ১৯৯৮ সালে পোখরানের ভূগর্ভে পরপর পাঁচটি পরমাণু বোমা ফাটানোর পর পোখরান সারা বিশ্বের নজর কাড়ে।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম তা হল এ পথের আকর্ষণ। পোখরানের পর আর একটি জনবসতি দেখা গেল। তারপর থেকে শুধু ধু ধু মাঠ। যতদূর চোখ যায় অনাবাদি জমি পড়ে আছে। এই বিস্তৃত অঞ্চল ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অধীনে রয়েছে। পথ থেকে দেখা যায় এই ধু ধু প্রান্তরে চারতলা বাড়ি যেন যক্ষের ধন আগলাচ্ছে।

এই নিরাসক্ত উদাস পরিবেশে বিল্ডিংগুলো আমাদের জওয়ানদের চৌকি বা ওয়াচ টাওয়ার। বিল্ডিংগুলোর জানালা স্বচ্ছ কাচের। যাতে ঘরে বসেই চারদিকের কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় ভেড়া, খচ্চর আর ছাগলের পাল চরে বেড়াচ্ছে এই মরু প্রান্তরে। পোখরানের পর থেকে বাবলা কাঁটা এবং আকন্দ ফুলের গাছের সঙ্গে সাদা একরকমের গুল্ম দেখা গেছে বেশি করে।

এপথে জয়সলমীর যেতে সময় লেগেছিল চারঘন্টা। এবার ফিরে আসি যোধপুর-বাড়মের পথের কথায়। এক একটা অঞ্চলের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য। ভিন্ন পথ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে এজন্য ভাল লাগে। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে সমাজের মানুষের চালচলন পোষাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাদির পরিবর্তন ঘটে। আঞ্চলিক এই সব পরিবর্তন জানতে হলে, যত বেশি নতুন জায়গায় যাওয়া যায়, যত নতুন পথে ঘোরা যায় তত বেশি জ্ঞানের ভান্ডার বাড়ে।

আর এজন্যই এবার বাড়মের হয়ে জয়সলমীর যাব। তাছাড়া বাড়মের পাকিস্থানের লাগোয়া একটি শহর। এ কারণে বাড়মেরের আলাদা একটা গুরুত্ব আছে। বাড়মেরের বাস পেতে হলে যেতে হবে যোধপুর শহরের পশ্চিম দিকে বাড়মের বাস স্ট্যান্ডে। 12th বাড়মের রোড-এ। যোধপুর থেকে বাড়মেরের দূরত্ব ২০০ কিমি। ভাড়া নেয় ৪৭ টাকা।

দুপুর বারটায় বাড়মেরের বাস ছাড়ল। বেলা যত বাড়ছে গরম তত বাড়ছে। বাইরের আবহাওয়া এত গরম হয়ে উঠেছে যে বাসের জানালা খোলা রাখা দায় হয়ে উঠেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গরমের সময় ভ্যাপসা গরমে যে রকম জ্বালা করে শরীরে এখানে তা নয়। অসহ্য জ্বালা হয় না ঠিক কিন্তু শরীরের জল শুষে নেয়। ফলে সারাদিন কয়েকবার জল পান করলেও খুব সামান্য হলদে মূত্র ত্যাগ হয়।

একটানা চলেছে বাস। বাড়মের জেলাটি একেবারে ছোট নয়। এর আয়তন ২৮,৩৪৭ বর্গ কিমি। লোক সংখ্যা ১৪,৩৫,২২২ জন। গ্রামের সংখ্যা ১৬৩৪টি। ৭টি তহশিল এর অন্তর্গত। এখানকার প্রধান ফসল বজরা, মেইজ, আর পালসেস।

পথে পথে যেমন অনাবাদি জমি দেখেছি, তেমনি গ্রামও দেখেছি অনেক। মানুষের আনাগোনা কম দেখা যাচ্ছে পথে। হয়তো গরমের কারণেই এমন। চলার পথে পড়েছে পঞ্চপদরা এবং বৈইটু শহর। এই দুপুর বেলাতেও শহর কিন্তু ঘুমিয়ে নেই। বিশেষ করে বাসের যাত্রীদের কাছে ফলমূল, বাদাম, তেলেভাজি ওয়ালারা তাদের পসরা বিক্রির জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দোকানগুলো যথারীতি খোলা আছে কিন্তু খদ্দের নজরে পড়ছে না।

বিকেল সাড়ে তিনটায় পৌঁছাই বাড়মের শহরে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে সেবাসদন ধর্মশালায় উঠলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নেওয়া দরকার। বিকেল বেলা এক পসলা বৃষ্টি হল। মরুভূমিতে বৃষ্টি হতে দেখে খুব ভাল লাগল।

সন্ধ্যার সময় পথে বের হই। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে বাড়মেরের তেমন কোন মূল্য নেই। দেখার মধ্যে আছে কয়েকটি মন্দির। যেমন —

১। মাতাজী মন্দির।

২। শিব এবং হনুমান মন্দির। দুটো মন্দিরই সব্জি মন্ডি রোডে অবস্থিত।

৩। সফেদ আখড়া—মহাদেব মন্দির। শহর থেকে ৩ কিমি দূরে এর অবস্থান।

৪। জৈন মন্দির, খাগল মহল্লা, সব্জিমন্ডির কাছে।

৫। কিরাড়ু—এখানে ১১ শতকে নির্মিত ৫টি মন্দির আছে। মন্দিরগুলোতে গুপ্তযুগের শিল্প ভাস্কর্য উৎকীর্ণ। বিষ্ণু মন্দিরটি সব থেকে প্রাচীন। তবে সোমেশ্বর মন্দিরটি এখনও অনেকটা সুরক্ষিত।

বাড়মেরের রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা জিনিস দেখে খুব অবাক হলাম, এখানকার বেশির ভাগ পুরুষদের কানের লতিতে ফুটো করা। কেউ সোনার রিং কেউবা কানপাশা পরেছে। কারুর কানে ফুটো আছে কিন্তু অলঙ্কার নেই।

বয়স্ক পুরুষদের মাথায় পাগড়ি, পরনে ধুতি, ঢিলে হাতা দন্ডিয়া আংরাখা। কিন্তু যুবকেরা বেশির ভাগ প্যান্ট শার্ট পরা। আর মহিলারা সাধারণতঃ ঘাঘরা পরেন, সঙ্গে কাঁচুলী আর ওড়না। বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলাদের সারা শরীরে অলঙ্কার পরা অবস্থায় হেঁটে বেড়ালে খুব সহজে নজরে আসে।

বিকেলবেলা এক পসলা বৃষ্টি হয়েছিল। এখন মাটি খটখটে। মরুভূমিতে বৃষ্টি পরিমাণে কম হয়। যেটুকু বৃষ্টির জল আকাশ থেকে পড়ে তাও মরুভূমির বালি শুষে নেয়। এজন্য সচরাচর কোন জলাশয় দেখা যায় না। যেখানে কয়েকটি পাহাড় এর মাঝখানে নিচু জায়গা থাকে সেখানে বৃষ্টির জল এসে জমা হয়। আর জলাশয়-এর সৃষ্টি হয়। এমনিতে মাটির তলার জল কুয়ো কেটে সাধারণ মানুষের ব্যবহারে আসে।

চরাচরে অন্ধকার নেমে এসেছে। ফিরে এলাম সেবাসদনে। ঠিক করেছি আগামী দিন জয়সলমীর চলে যাব। শুধু মন্দির দেখার জন্য এখানে একটা দিন থাকা ঠিক হবে না।

পাঁচ

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

সকাল সাড়ে ছটায় সেবাসদন থেকে বের হই। বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করি। এর মধ্যে জয়সলমীরের উদ্দেশ্যে লোকাল বাস ছেড়েছে পর পর দুটি। আমি যাব এক্সপ্রেস বাসে। অবশ্য ট্রেনও যায় জয়সলমীর। তবে রেল স্টেশান কিছুটা দূরে। সুতরাং বাসেই যাব। লোকাল বাসে সময় নেয় চার ঘণ্টা। এক্সপ্রেস বাসে বাড়মের থেকে জয়সলমীরের ভাড়া নিল ৬১্।

বাস এগিয়ে চলেছে। বাড়মের থেকে জয়সলমীর-এ পথের আকর্ষণ, যোধপুর-বাড়মের

পথের থেকেও বেশি আকর্ষণীয়। যেহেতু বেশির ভাগ জমি অনাবাদি সেজন্য এসব জায়গা জন্তুদের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর এজন্যই পথে পথে রামছাগল, ভেড়া, খচ্চর চরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

এ যেন জন্তুগুলোর অবাধ বিচরণের জায়গা। উটগুলো কাঁটা বাবলার কাঁচপাতা খায়। আর ছোট পশুরা নিচের জঙ্গলে ঘাস লতাপাতা খায়। এপথের গ্রামগুলোতে দেখছি বড় পাতা-কুয়ো থেকে হাতে কিংবা মটরে জল তুলছে। আর মেয়েরা মাথায় দু-তিনটে জলের পাত্র পর পর সাজিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে দূরে।

বাবলা কাঁটাতো সারা রাজস্থানের অলঙ্কার। কিন্তু এই পথে আকন্দ ফুলের গাছও দেখছি প্রচুর। আর গুল্মতো আছেই। বাড়মেরের পর থেকেই দেখছি ময়ূর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। আর ছাগল ভেড়া এবং খচ্চর দলে দলে ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। দু'তিন জন লোক এক একটা দল পাহারা দিচ্ছে। গরু আর উট সবই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাটির উপর সারা পথে কোথাও জলাশয় দেখা গেল না। কিন্তু জল রয়েছে মাটির নিচে। পথে এক জায়গায় দেখলাম গভীর কূয়োর জল পাম্পের সাহায্যে তোলা হচ্ছে। সে জল হাঁটু সমান জলাধারে (বাঁধানো পাত্রে) রাখা হয়েছে। আর সেই জলাধারের জল গরু, ছাগল, ভেড়া সব পশুরাই খাচ্ছে।

গ্রামগুলোতে পাকাবাড়ি কম। বেশির ভাগ বজরার ডাঁটা দিয়ে তৈরি ছাদ এবং মাটির দেওয়াল। যেখানে পাথর সুলভে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে পাথরকে ইটের মত ভেঙ্গে ঐ পাথরে ইট, সিমেন্ট সুরকি দিয়ে গেঁথে পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে।

এসব চালচিত্র দেখতে দেখতে ১০.২০ মি. এসে পৌঁছাই জয়সলমীর শহরে। জয়সলমীর বাস স্ট্যাণ্ডটি সোনার কেল্লার দক্ষিণে অবস্থিত। এখান থেকে মহীশূর সেবাসদনে পৌঁছাই রিক্সা করে।

জয়সলমীর

পুরানো দিনের মাড়োয়ারের একটি দেশীয় রাজ্য। আর আজকের দিনে রাজস্থানের একটি জেলা। জয়সলমীর জেলাটি রাজস্থানের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই জেলার পশ্চিমে ও উত্তর দিকে পাকিস্তান আর দক্ষিণ ও পূর্বে বাড়মের এবং যোধপুর জেলা অবস্থিত।

জয়সলমীর শহর ২৬°৫ থেকে ২৮°২৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬২°২৯ থেকে ৭৭°১৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। জয়সলমীর জেলার আয়তন ৩৮,৪০১.৫৯ কিমি এবং জয়সলমীর পুরানো শহরের আয়তন ৫১ বর্গকিমি।

এই জেলার লোক সংখ্যা ৩,৪৩,৬৪৮ জন। এবং শহরের লোকসংখ্যা ৩৮,৬১৩ জন। দুর্গ সমেত সমগ্র শহরের চারদিকে ৩ থেকে ৫ মিটার উঁচু এবং ২ থেকে৩ ফুট চওড়া একটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এই দেওয়াল লম্বায় ৫ কিমি।

সমুদ্র সমতা থেকে ২২৫ মিঃ উঁচুতে অবস্থিত এই শহরে গরম এবং শীত দুটোই তীব্র।

গরমকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৬° সেঃ এবং শীত কালে নেমে আসে ১° সেঃ এ। সুতরাং অক্টোবর থেকে মার্চ মাস বেড়ানোর পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়।

জয়সলমীরের সঙ্গে আকাশ পথে বায়ুদূত ফ্লাইট-এ সপ্তাহে তিনদিন দিল্লী, জয়পুর, যোধপুরের সংযোগ রয়েছে। রেলপথে দিন এবং রাতে দুটি ট্রেন যোধপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। জয়সলমীরের রেল স্টেশন-এ দিনে ৮টা থেকে ১১টা এবং রাত ২টা থেকে ৪টার মধ্যে ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়। আর সড়ক পথে মরুভূমির প্রতি শহর এবং ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

যোধপুর থেকে সড়ক পথে জয়সলমীরের দূরত্ব ২৯০ কিমি। বাসে সময় নেয় ৫-৬ ঘণ্টা। আর বাড়মের থেকে দূরত্ব ১৫৫ কিমি। প্রতিদিন উভয় দিক থেকে ১৫টি করে বাস যাতায়াত করে বাড়মের এবং জয়সলমীরের মধ্যে।

থাকার জায়গারও অভাব নেই। যেমন— ব্যয়বহুল হোটেল।

নারায়ণ নিবাস হোটেল ফোঃ ৫২০৮, নারায়ণ ভিলাস ফোঃ ৫২২৮৩, গড়বন্দ প্যালেস হোটেল ফোঃ ৫২৭৪৯, হোটেল হ্যারিটেজ ইন ফোঃ ৫২৭৬৯, হিম্মত গড় হোটেল ফোঃ ৫২২১৩, ধোলামরু হোটেল ফোঃ ৫২৮৬৩ এবং ৫২৭৬১ ..... ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত হোটেল।

মুমাল প্যালেস ফোঃ ৫২৩৯২, জহর নিবাস হোটেল ফোঃ ৫২৪৪২, সোনা হোটেল ফোঃ ৫২৭৩২ ... ইত্যাদি।

সাধারণ হোটেল

হোটেল	ঠিকানা	ফোন নং
প্রকাশ হোটেল	বড় বাগ রোড	৫৩১৮৮
মোনালিসা ”	”	৫২৭৫৫
খুশবু ”	”	৫২২৩৭
মরুধরা ”	”	—
প্রিন্স ”	হনুমান চৌবায়া	৫২৭২৯
আকাশ দ্বীপ ”	”	৫৩২৩০
হোটেল মেঘনাম	অমর সাগর গেইট	৫২১৬০
	পুরানো শহরের মধ্যে	
হোটেল স্বস্তিকা	চৈইন পুরা স্ট্রীট	৫২৪৮৩
হোটেল রেণুকা	”	৫২৭৫৭
হোটেল প্লেন্ডার	”	৫২৩২৩
রয়াল প্যালেস	বলাকা কলোনী	৫২৮৪৭
হোটেল মধুবন্	মৈইন পুরা স্ট্রীট	৫৩০২৭

রিঙ্গো গেস্ট হাউস	মৈইন পুরা স্ট্রীট	৫৩০২৭
হোটেল শিব প্যালেস	”	৫২৬১৩
হোটেল অনুরাগ	”	৫২৬০৮
হোটেল জয়সাল প্যালেস	স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পিছনে	৫৩২১৭
হোটেল সান-রে	”	৫৩২১৭
গোল্ডেন রেষ্ট হাউস	”	৫১২২৬

শহরের মাঝামাঝি হিন্দু অধ্যুসিত স্থান

ফোর্ট ভিউ হোটেল	সেন্ট্রাল মার্কেট	৫২২১৪
ফ্লেমিংগো হোটেল	”	৫২৮৮৯
শ্রীগিরিরাজ হোটেল	মনাক চক	৫২২৬৮
সুনীল ভাটিয়া রেস্ট হাউস	সেন্ট্রাল মার্কেট	৫২৫২৩
হোটেল হেনা	ফোর্ট গেট এর কাছে	৫৩৩৯০
নিউ ট্যুরিস্ট হোটেল	আসনি পাড়া	৫২২৮২
হোটেল পূজা	গুভি পাড়া	৫২৬০৮

শিব মার্গে

ভিরিভি প্যালেস	শিব রোড	৫৩০২৫
আদর্শ নিবাস	”	৫২২১৬
স্কাইরুম হোটেল	”	৫২৭৬৫
উষা কিরণ প্যালেস	”	৫৩১১৫

পটওয়া-কি-হ্যাভেলিয়ার কাছে।

হোটেল রাজধানী	কুম্ভর পাড়া	৫২৭৫৭

ফোর্টের মধ্যে।

জয়সাল কাসেল	ফোর্টের মধ্যে	৫২৩৬৩
প্যারাডাইস হোটেল	”	৫২৬৭৪
শ্রীনাথ প্যালেস	”	৫২৭০৯
হোটেল সুরথ	”	৫২৪৪২

খুব কম ভাড়ার হোটেল

দীপক রেস্ট হাউস ফোঃ ৫২৬৬৫, লক্ষ্মীনিবাস ফোঃ ৫৩০৬৫, কাসল হোটেল এবং স্টার মুন হোটেল।

এছাড়া আছে কিছু ধর্মশালা।

মহীশূর সেবাসদন—হনুমান চৌরায়া

কাশীরাম ধরমশালা—স্টেশান রোড

ভাটিয়া বাগেচি—হনুমান চৌরায়া

মরুশ্রী সেবাসদন—অমর সাগর গেইট

জৈন ভবন— মালকা পোল, ফোঃ ৫২৪০৪।

জৈন ধরমশালা—পটোয়ান কি হাভেলির কাছে।

ডাক বাংলো—অমর সাগর রোড ফোঃ ৫২৬৬৪

সার্কিট হাউস—বড়বাগ রোড ফোঃ ৫২৫৬৬।

জয়সলমীরের অতীত কাহিনী

থর মরুভূমির অন্তর্গত এক অনবদ্য দুর্গশহর জয়সলমীর। ঐতিহাসিক দিক থেকে আকর্ষণ অনস্বীকার্য। মরুভূমির আশ্চর্য ঘটনা প্রবাহের জীবন্ত সাক্ষী এই শহর। এর মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ, বাগিচা এবং জলাধার আরব্য রজনীর গল্প গাথার মত আকর্ষণীয়। কাচা সোনারঙের হলুদ দুর্গটি দেখে চলচ্চিত্র জগতের প্রাণপুরুষ সত্যজিৎ রায় এর নামকরণ করেন 'সোনার কেল্লা।'

১১৫৮ খৃষ্টাব্দে ভাটি রাজপুত রাওয়াল জয়সাল এই শহরের পত্তন করেন। এই রাজপুতগণ নিজেদের মহাভারতের কেন্দ্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বংশজাত বলে দাবী করেন। আর তারই নিদর্শন স্বরূপ একটি সোনার ছাতা আজও সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চৌতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত জয়সলমীর খুব দুর্দিনের মধ্যে ছিল। কেননা এই সময়ে জয়সলমীরে তিনবার জহরব্রত পালন করতে হয়েছিল। প্রথমবার ঘটেছিল ১৩১৫ সালে। সে সময় আলাউদ্দিন জয়সলমীর আক্রমণ করেন। রাওয়াল মুলরাজ এবং জৈত সিং আলাউদ্দিনের কাছে পরাজিত হন। দ্বিতীয়বার ঘটেছিল ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে। এসময় মহম্মদ তুঘলক জয়সলমীর আক্রমণ করেন। তখন জয়সলমীরের মহারাজা দুদা রাওয়াল তুঘলকের কাছে পরাজিত হন। স্বাভাবিক কারণে দু'বারই মুসলমানদের হাত থেকে ইজ্জত রক্ষার জন্য পুরনারীগণ জহরব্রত পালন করেন। আর তৃতীয় এবং শেষ বার ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাওয়াল লুনকরনের সময়ে জহরব্রত পালন করতে হয়েছিল। তবে তা ব্যাপক ছিল না। এই সময় আফগানিস্থানের আমির আলি দুর্গ থেকে ৭ কিমি দূরে অবস্থান করছিলেন। তিনি লুনাকরণের বন্ধুও ছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সামন্তদের হাত করে দুর্গ দখলের ষড়যন্ত্র করেন। আর তখনই জহরব্রত পালন করা হয়।

আজই শুরু করি জয়সলমীর দর্শন। ১১টার সময় মহীশূর সেবা সদন থেকে বেরিয়ে পড়ি। সোজা এগিয়ে চলেছি পূর্ব দিকে। মহীশূর সেবাসদনটি জয়সলমীর শহরের পশ্চিম দিকে। এই পথেই পড়ে দুর্গ শহর।

হনুমান চক

হনুমান চকেই রয়েছে মহীশূর সেবাসদন। খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সেবাসদনের অবস্থান। অটো রিকশা স্ট্যান্ড, স্থানীয় ভিলেজ বাস স্ট্যান্ড, হোটেল, রেস্তোরা নিয়ে জমজমাটি জায়গা।

হনুমান চকের পর পড়ল গান্ধীচক। এখানে আছে মন্দির প্যালেস এবং অনেকগুলো ট্যুর কনডাকটেড অফিস। সাইট-সিইইং থেকে আরম্ভ করে, ক্যামেল সাফারি, সব ব্যবস্থাই এরা করে। এছাড়া আছে হোটেল। এমনকি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জয়সলমীর শাখাটিও এখানে।

এসব ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি পূর্ব দিকে। রাস্তার দুদিকে গুরুত্বপূর্ণ দোকানপাট। জনজীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া রাজস্থানী ঘরানার এমব্রয়ডারি এবং পাথরের তৈরি জিনিসের দোকান ছড়িয়ে আছে। এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

ট্যুরিস্ট সমাগম এখনও তেমনভাবে শুরু হয়নি। তবে বিদেশী ট্যুরিস্টদের আগমন ঘটেছে এরই মধ্যে। প্রায়ই নজরে পড়ছে সাহেব ট্যুরিস্টদের। এগিয়ে চলি সোজা রাস্তা ধরে। পথে পড়ল জয়সলমীর কেল্লার মেইন গেইট—অক্ষয়পোল। না, কেল্লায় এখন যাব না। আমি চলেছি আরো পূর্ব দিকে। শহরের পূর্বদিকে রয়েছে ফোকলোর মিউজিয়াম। আমি যাব সে মিউজিয়ামে।

ফোকলোর মিউজিয়ামটি গরিসর ট্যাঙ্কের ধারে গড়ে তোলা হয়েছে। মিউজিয়ামের কথা বলার আগে গরিসর ট্যাঙ্কের কথা বলে নিই। জয়সলমীর শহরে ঢোকার দুটি পথ। একটি গরিসর গেইট, এটি শহরের পূর্বপ্রান্তে। আর একটি অমর সাগর গেইট, এটি শহরের পশ্চিম প্রান্তে। আর এদুটি গেট-এর মধ্যে দূরত্ব ৫০০ মিটার।

আমি চলেছি গরিসর গেটের দিকে। সাধারণতঃ বাসে বা অন্য যানবাহনে আমরা সরাসরি শহরে ঢুকে পড়ি। তারপর দুর্গ শহরের আকর্ষণে ঘুরে বেড়াই। ফলে গরিসর গেটে আর আসা হয় না। কিন্তু এ জায়গাটি শহরের যে কোন স্থান থেকে হাঁটা পথে ১৫ থেকে ২০ মিনিট দূরত্বের পথ। আর বাইসাইকেল, অটো রিকশা, ট্যাক্সিতে তো আসা যায়ই।

গরিসর ট্যাঙ্ক

এই জলাধারটি মানুষের হাতে খনন করা। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে মহারাওয়াল গরসি-সিং এটি খনন করেন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জয়সলমীর শহরের পানীয় জল এই পুষ্করিণী থেকে সরবরাহ করা হত। আজকাল ২৫ কিমি দূরের ডাবলা গ্রাম থেকে পাইপ লাইনের সাহায্যে জল আনা হয়।

এখানে একটি সুন্দর তোরণ আছে। এছাড়া মন্দির, স্মৃতি সৌধ এবং ছত্রী দেখার বিষয়। এখানে যে তোরণটি আছে এর নাম তিলন-কি-পোল। তিলন ছিল একজন পতিতা।

তিলন-কি-পোল

গরিসর ট্যাঙ্কে ঢোকার মুখে হলুদ পাথরে তৈরি একটি তোরণ। এই তোরণটির নির্মাণের পিছনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। তিলন নামে একজন ধার্মিক মহিলা পেশায় ছিল পতিতা। সমাজ সেবায় সে অর্থ ব্যয় করত। তিলন বিবাহের পর হায়দারাবাদে বাস করত। বর্তমানে জায়গাটি পাকিস্তানের অন্তর্গত। যাই হোক, তিলন বর্ষাকালে বেড়াতে আসত বাপের বাড়ি।

তিলনের সাধ হল একটি তোরণ গড়তে। তার অর্থের অভাব নেই। সুতরাং এই তোরণটি গড়া হল। লোকে তিলনের জয়গান গাইতে লাগল। সংসারে মন্দলোকের অভাব নেই। কিছু লোক মহারাজকে বোঝাল—'মহারাজ, পতিতার তৈরি করা তোরণের নিচ দিয়ে চলাচল করা একজন রাজার পক্ষে লজ্জার বিষয়।'

শুনে রাজা তোরণটি ধ্বংস করার মনস্থ করলেন। তিলন দেখল মহাবিপদ। সে তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে পরামর্শ চাইল, কিভাবে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। পন্ডিতগণ তিলনকে উপদেশ দিল—তোরণের উপরে সত্যনারায়ণের মূর্তি বসাতে। যথাসময়ে ভগবান সত্যনারায়ণের মূর্তি বসান হল তোরণের উপরে। রাজা একথা জানার পর নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন। সেই থেকে তোরণটি তিলনের তোরণ বলে পরিচিত হল।

ফোকলোর মিউজিয়াম

গরিসর ট্যাঙ্কের ধারে গড়ে তোলা হয়েছে একটি মিউজিয়াম। এন-কে-শর্মা নামে একজন 'জাতীয় পুরস্কার' প্রাপ্ত শিক্ষকের একক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই মিউজিয়ামটি।

মরুভূমির সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে প্রথমেই এই মিউজিয়ামটি দেখা উচিত। এখানে স্থানীয় পোষাক পরিচ্ছদ, চিত্র, রাজস্থানী অলঙ্কার, মুদ্রা, ফসিল, উটের গয়না, বাদ্যযন্ত্র, ঐতিহ্যগত দ্রব্যাদি এবং পুরানো পুঁথির সংগ্রহ দেখা যায়।

এখন দুপুরবেলা। গনগনে রোদ। পাকা রাস্তা থেকে নজরে পড়ল তিলন-কি-পোল। তোরণের পিছনে জলাশায়। তোরণের গঠনশৈলি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি গরিসর ট্যাঙ্কের দিকে। ডানদিকে পড়ল ফোকলোর মিউজিয়াম। মিউজিয়াম পরে দেখব। মিউজিয়ামের পিছনে ট্যাঙ্কের ধারে দেখছি কতকগুলো ছত্রী। ছত্রীর ছায়ায় কয়েকজন বিদেশী ট্যুরিস্ট বসে আছে। আর আছে স্থানীয় কিছু বাচ্চা। বাচ্চাদের দুষ্টুমি দেখছে বিদেশী ট্যুরিস্টরা। আমি তাদের পাশ কেটে ট্যাঙ্কে এলাম।

বেশ বড় জলাধার

তোরণের দুদিকে গরিসর ট্যাঙ্কে শান বাঁধানো ঘাট আছে। ট্যাঙ্কে স্নান করছে একজন সাহেব। তার সঙ্গে আছে সাহায্যকারি। আমি তাদের বললাম তোমরা আমার একটা ফটো তুলে দাও। গরিসর ট্যাঙ্কের মধ্যেই রয়েছে দুটি ছত্রী। ছত্রী নিয়ে গরিসর ট্যাঙ্কের ছবি তোলা হল।

শীতকালে গরিসর ট্যাঙ্কে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে বেড়ায়। ট্যাঙ্কের চারদিকের দৃশ্য ঘুরে ঘুরে দেখাও মজার বিষয়। স্মৃতি সৌধ, ছত্রী, মন্দির এবং ফোকলোর মিউজিয়াম—অনেক কিছু দেখবার আছে। তিলন-কি-পোলের বাম দিকে মন্দির এবং ঘাট দেখে ফিরে আসি মিউজিয়ামে।

মিউজিয়ামে প্রবেশমূল্য পাঁচ টাকা।

গাইডের দরকার হয় না। সবই লেখা আছে। মিউজিয়ামে ঢুকতেই বামদিকের গ্যালারিতে দেখি একটি মডেল—MooMal–Ki–Meri-র মডেল। এই মহলটি লুদার্ভায় কক (Kak) নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। তা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। মুমালের প্রাসাদ ধ্বংস হলেও মুমালের প্রেম-কাহিনী আজও স্থানীয় মানুষের মনে গাঁথা আছে।

এই গ্যালারিতেই, মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদ, জয়সলমীর এবং বাড়মেরের পেইন্টিং তরবাল, বান্দরমালা, মহিলাদের চুলের স্টাইল, কাঁসা-পিতলের তৈরি পুরানো তৈজসবাতি, কালির দোয়াত, কাঁসার তৈরি কলস, জগ, এমন অনেক কিছু আছে, যা দেখে এতদ্অঞ্চলের জীবন যাত্রার ধারণা পাওয়া যায়। বিশেষ করে ১৯ শতকের রবি ভার্মার পেইন্টিং এবং এতদ্অঞ্চলের এমব্রয়ডারির কাজ যেমন রুমাল, ক্রশ, পাখা, কাঁথা ইত্যাদি দেখার মত।

পরের গ্যালারিতে ফসিল-এর প্রচুর সংগ্রহ—সী-ফসিল এবং উড-ফসিল। এসব জীবাশ্মগুলো দেখতে পাথরের মত। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে পার্থক্য বোঝা যায়। প্রত্যেক ফসিলের স্বকীয়তা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ের মুদ্রার ছবি। আর আছে চলতি শতকের প্রথম দিকের মুদ্রা।

জয়সলমীরের কিল্লা এবং হাভেলির ছবি। মহারাজাদের বিবাহে ব্যবহার্য তোরণ। মেহেন্দি, হাত এবং পায়ের মেহেন্দির নকসা। উটের অলঙ্কার, সারা গায়ের বিভিন্ন অলঙ্কার। পাথরের তৈরি বিভিন্ন সরঞ্জাম। রাজস্থানী মহিলাদের ব্যবহৃত অলঙ্কার। যেমন ইন্দোনি—বিবাহ বাসরে কন্যার সাজের রিং, চুদাস—বিবাহিত মহিলাদের হাতে শাঁখের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন রকমের জাঁতি, পাবুজি—কি-পদ, এছাড়া রাজস্থানী পুতুল। পুতুলের সাহায্যে জীবিকা প্রদর্শনী। এছাড়া অনেক পুরানো পুঁথি।

মিউজিয়াম দেখে ফিরে আসি মহীশূর সেবা সদনে। বিকেল বেলা মুমাল হোটেল (R.T.D.C)-তে জানতে পারলাম এখন অফ সীজন হওয়ায় কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং ঠিক করলাম এবেলা দূরে কোথাও যাব না। শুধু হাভেলিগুলো দেখব।

হাভেলি মানে বাড়ি—বাসগৃহ। দুর্গের বাইরে পুরানো শহরের চৌহদ্দির মধ্যে রাজাদের মন্ত্রী ও দেওয়ানগণ কারুকার্যময় বাড়ি তৈরি করেন। এই সব বাড়িগুলোর গঠন এবং নক্‌সা দেখার বিষয়। দুর্গ থেকে বেরিয়ে শহরের প্রধান পথ ধরে চলতে গেলে পথের পাশে পড়ে সেলিম সিং-এর হাভেলি।

সেমিল সিং হাভেলি বা মোতি মহল

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোতি মহলটি তৈরি করেন সেলিম সিং নামে জয়সলমীরের এক প্রধান মন্ত্রী। এই প্রাসাদের নিচের দিক সরু আর উপরের দিক ক্রমশ চওড়া, এটাই এই বাড়ির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই বাড়ির গঠন শৈলী এমন, প্রথম তলার ছাদের উপর দ্বিতীয় তলাটি ঝুল বারান্দা সহ গড়ে উঠেছে। আবার দ্বিতীয় তলার ঝুল বারান্দা সহ ছাদের যে পরিধি তার উপর তৃতীয় তলা উঠেছে। এইভাবে ছয়তলা বিশিষ্ট হাভেলিটি ঝুল-বারান্দার কারণে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে।

প্রাসাদের নির্মাণ সৌন্দর্য ছাড়া অলঙ্করণের কাজও প্রচুর। প্রাসাদটিতে ৩৮টি ঝুলবারান্দা আছে এবং প্রতিটিতে ভিন্ন আকারের নক্‌সা খোদিত। প্রাসাদের সামনের বারান্দাগুলোতে এই নক্‌সার কাজ হয়েছে।

বিশেষ করে উপরের তলার অলঙ্করণের কাজ দেখলে মনে হয় নির্মাতার আর্টের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। উপরে আরো দুটি মহল ছিল। রঙমহল এবং কাচমহল। মহল দুটি মহারাওয়াল গজসিং নষ্ট করে দেন।

সেলিম সিং শাসক হিসাবে ছিলেন অত্যাচারি। জয়সলমীর তার রাজত্বকালে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শিল্পকলার প্রতি যার এত অনুরাগ তিনি শাসক হিসাবে জনগণের কাছে অত্যাচারি ও শোষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সেলিম সিং-এর চরিত্রের এই বৈপরীত্যর কারণ, বাল্যকালে স্বচক্ষে দেখা তার পিতৃহত্যা।

সেলিম সিং ছিলেন দেওয়ান স্বরূপ সিং-এর পুত্র। স্বরূপ সিং মহারাওয়াল মূলরাজ দ্বিতীয়র প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। স্বরূপ সিং ছিলেন নির্ভীক এবং সাহসী। তাঁর পিতা ছিলেন খুব ধনবান। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন খুব ক্ষমতাবান এবং জয়সলমীর স্টেটের অর্থনীতি তিনি নিজের আয়ত্ত্বে রেখেছিলেন। এজন্য অনেকের কাছেই তিনি শত্রু হয়ে পড়েছিলেন। সেলিম সিং-এর বয়স যখন বার তখন স্বরূপ সিংকে এক রাজকুমার হত্যা করেন।

পরবর্ত্তীকালে সেলিম সিং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ অনেক সামন্ত এবং রাজপুতকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন। সেলিম সিং অনেককে সরাসরি খুনও করেন। সেলিম সিং যখন বড় হন তখন মূলরাজ দ্বীতিয় তাকে জয়সলমীরের প্রধানমন্ত্রী করেন। অল্প সময়ের মধ্যে সেলিম সিং খুব ক্ষমতাবান হয়ে উঠেন। তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থতার কারণে রাজ্যের ধ্বংস কাজে লিপ্ত হন। তার সময়ে পালিয়ান ব্রাহ্মণগণ ছিলেন প্রসিদ্ধ চাষী। সেলিম সিং এই চাষীদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে জোর পূর্বক কর আদায় করতে থাকেন। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ান ব্রাহ্মণগণ জয়সলমীর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ৮৪টি গ্রাম জনমানব শূন্য হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যে।

সংবাদসূত্র—Golden City (N.K. Sharma).

সেলিম সিং হাভেলি দেখে ফিরে এলাম হনুমান চৌরায়ায়। খোঁজ খবর নিয়ে শু'নলাম ভিলেজ বাস স্ট্যান্ড থেকে দিনে দুটি বাস যায় লোদুর্বায়। একটা দুপুর ১২টায়, আর একটা ছাড়ে বিকেল ৫টায়। বিকেলে ৫টার বাসে আমি এখন লোর্দুবায় যেতে পারি কিন্তু আজ আর ফিরতে পারব না। সুতরাং আগামী দিন যাব লোদুর্বায়। আর সে সঙ্গে বড় বাগ, রামকুন্ড অমর সাগর ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখে নেব।

এখন হাঁটা পথে নাথজীকা হাভেলি এবং পাটোয়ান-কি-হাভেলি দুটি দেখে নেওয়াই ভাল। গান্ধীচক থেকে সাত-আট মিনিটের 'হাঁটা পথে পাওয়া যাচ্ছে এই হাভেলি দুটি। স্থানীয় মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে অলিগলির পথ বেয়ে এলাম নাথমলজীকা হাভেলিতে।

নাথমলজী-কা-হাভেলি

এই বাড়িটি অবশ্য উনিশ শতকে তৈরি। তৈরি করেছিলেন দুই ভাই, হাতী এবং লালু। এরা দুভাই ছিলেন স্থপতি। বাড়িটির কারুকার্য এবং খোদাই কাজ করেন জয়সলমীরের কিছু মুসলমান শিল্পী। এরা খোদাই শিল্পে ছিলেন খুব দক্ষ। পরে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে এই মুসলমান শিল্পীগণ পাকিস্থানে চলে যান।

নাথমলজী ছিলেন মহারাওয়াল বেরিসাল সিং-এর দেওয়ান। মহারাজা নাথমলজীকে এই বাড়িটি উপহার দেন। এই বাড়িটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাড়ির ডান এবং বাম দুইদিকের ভিন্ন ধর্মী নক্সা। এই দুই ভিন্নধর্মী নক্সার মধ্যে এক আশ্চর্য সঙ্গতি গড়ে উঠেছে। হাভেলির বাম দিকের নক্সা এবং খোদাইয়ের কাজ করেন লালু। আর ডানদিকের শিল্পী হাতী। কিন্তু দুই ভাইয়ের দক্ষতাগুণে দেওয়ালের চিত্র শিল্প হয়ে উঠেছে অপরূপ। এ যেন শিল্প জগতের এক আশ্চর্য যুগলবন্দী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখলে দুইজনের নক্সার তফাত বোঝা যায় না। আর পাথর কুঁদে তৈরি হাতীটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। শিল্পীর হাতের যাদুতে পাথরের হাতী যেন জীবন্ত।

নাথমলজীকা হাভেলি দেখে আসি পাটোয়ান-কি-হাভেলির সামনে। এই বাড়িগুলি নাথমলজী-কা-হাভেলির পূর্ব দিকে।

পাটোয়ান-কি-হাভেলি

মহাবীর ভবনের কাছে দেখা যায় ৫টি হাভেলি। হাভেলিগুলি তৈরি হয়েছে ১৮০০-১৮৬০ সালের মধ্যে।

প্রতি হাভেলির চমৎকার খোদাই কাজ। ছাদ পর্যন্ত টানা স্তম্ভের শিল্পকর্ম আপনাকে মুগ্ধ করবেই। বিশেষ করে তারিয়ে তারিয়ে দেখতে হবে সোনালী এবং রূপোলী জরির কাজ। পাথরের উপরে খোদাই কর্ম দেখে ধন্দে পড়তে হয়, শিল্প কর্মটি পাথরের উপরে কিনা!

হাভেলির ভিতরটা আরো বেশি মনোমুগ্ধকর। দেওয়াল চিত্র, সোনালী ছাদ, বারান্দা সমেত সমস্ত ঘরের শিল্পকর্ম দেখে চোখ ফেরানো দায়। এমনকি ঘরের দরজা, জানালা, বাতি জলাধার সবকিছুতে সৌন্দর্যের ছোঁয়া। কাঠের কাজ খুব আকর্ষণীয়। ছাদে সোনালী চিত্র এবং কাচের শিল্প কাজ সবই দেখার মত।

এই বাড়িগুলোর ছাদ থেকে জয়সলমীর শহর এবং দুর্গকে সুন্দরভাবে দেখা যায়। সূর্যোদয়ের সময় এবং জোৎস্না ভরা রাতে চারদিকের দৃশ্য অপরূপ হয়ে উঠে।

পাটোয়ান ভাইদের পাঁচ ভাইয়ের পাঁচটি বাড়ি। বর্তমানে এই বাড়িগুলি জাতীয় সম্পত্তিও । প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হাভেলিগুলি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছে। দর্শন সময় সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল ৫টা।

বাদল নিবাস

মুসলমান শ্রম শিল্পীগণ বিনা পারিশ্রমিকে বাড়িটি তৈরি করেন। তাজিয়ার আকারে গড়া বাড়িটি মুঘল সম্প্রদায়ের এক মূরুব্বিকে দেওয়া হয়। পাঁচতলা বাড়িটির প্রতি ঝুল বারান্দায় মুসলিম সংস্কৃতির প্রতীক চিহ্ন খোদাই করা হয়েছে।

বাদল নিবাস বা তাজিয়া টাওয়ারটি হনুমান চকে অবস্থিত।

ছয়

১১ই সেপ্টেম্বর।

ঘুম থেকে উঠে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হই। ধর্মশালার সামনে অটো দাঁড়িয়ে আছে। একটি অটো রিকশা ঠিক করি। অটোওয়ালার সঙ্গে চুক্তি করি—সে আমাকে দেখাবে তিনটি তালাত, লোদুর্বা এবং উড ফসিল। দুশ টাকায় রফা হল।

অটো এগিয়ে চলেছে লোদুর্বার দিকে। পাকা রাস্তা। গাড়ি হু-হু করে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার ডান দিকে একটি জলাশয় দেখতে পাচ্ছি। জলাশয়টির নাম অমরসাগর।

অমর সাগর

জয়সলমীর থেকে দূরত্ব ৭ কিমি। জলাশয়টি যেন মরুভূমির জীবনপ্রদীপ। এই লেকটি লোদুর্বার পথে পড়ে। এই লেকের তিন দিকে নিচু পাহাড়। আর পশ্চিম পাড়ে শিব মন্দির এবং জৈন মন্দির আছে। এছাড়া জনগণের সুবিধার জন্য ছত্রী এবং পাত-কুয়ো তৈরি করা হয়েছ।

সকাল ছটায় এসে দাঁড়াই অমর সাগর লেকের পাড়ে। রাস্তা চলে গেছে প্রাচীর ঘেরা মন্দির পর্যন্ত। রাস্তা থেকে নেমে হেঁটে চলি। গেট দিয়ে ঢুকেই দেখতে পাই আবাসস্থল এবং ফুলের বাগান। তারপরেই পাকা চাতাল এবং মন্দির।

প্রাচীর ঘেরা সীমানায় রয়েছে একটি মন্দির। এটি শিবমন্দির। ১৭৪০ খৃস্টাব্দে মহারাওয়াল অমর সিং এই শিবমন্দিরটি তৈরি করেন। তিনি জনসাধারণের জন্য একটি পাতকুয়া এবং ছত্রী তৈরি করেন।

আর রয়েছে তিনটি জৈনমন্দির। তার মধ্যে আদেশ্বর নাথ জৈন মন্দিরটি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। এটি তৈরি করেন বাপনা-হিম্মত রাম ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। মন্দিরটির সামনের দিকে বিভিন্ন কারুকার্য খোদাই করা। শ্বেতপাথরের উপর অঙ্কিত অভিক্ষেপণটি (অর্ধ গ্লোভ) সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ফিরে এলাম অটোতে।

লোদুর্বার পথে দেখছি প্রচুর থোর (ফণিমনসা), আকড়া (আকন্দ ফুল) এবং বুঁই জঙ্গুলে গাছ। বাড়মেরের পর থেকে দেখছি মাটির রং হলুদ। এই দিকে ও হলুদে মাটি তবে মাঝে মাঝে কাল ভঙ্গুর ঝামার মত পাথর ছড়িয়ে আছে। গতকাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়েছে। আজও দেখছি সব জায়গায় জল শুকোয়নি। কোথাও জল নেই ঠিক। কিন্তু ভিজে মাটি।

এসে পড়েছি লোদুর্বায়।

লোর্দুবা

জয়সলমীর শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে রয়েছে লোদুর্বা। এটি জয়সলমীর রাজ্যের পুরানো রাজধানী। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে লোদুর্বা বার বার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। শেষ লোর্দুবার শাশক জয়সাল রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ত্রিকুট পাহাড়ে।

এখনও যে তোরণটি পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয় সেটি পুরানো স্বর্ণময় যুগের ফসল। এই তোরণটি মোহাম্মদ ঘুরি ধ্বংস করেন। এখানে আছে একটি জৈন মন্দির। পুরানো মন্দিরটি ১৬ শতকে পুনঃ গঠন করেন থরুশা বংশালী। আর আছে 'কল্পতরু'।

জৈন মন্দিরের সামনে এসে থামল অটো।

জৈন মন্দির

এই মন্দিরটি ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। গেট পেরিয়ে ঢুকি মন্দিরে। মন্দিরের সংস্কার হয়েছিল ষোড়শ শতকে। প্রায় চারশ বছর আগে সংস্কার হয়েছে কিন্তু কোথাও কোন ভাঙ্গন ধরেনি। দেখে মনে হয় কালের ছাপ পড়তে এখনও বহু দেরী আছে। পাথরের তৈরি মন্দির। কিন্তু এত বেশি খাঁজ ভাঁজ আছে বলার নয়। আর এই খোপের মধ্যে বাস করে একটি সাপ। মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে এই সাপের কথা বলা আছে।

বাটিতে দুধ রাখা হয়। পূজোর পর সন্ধ্যাবেলায় সবার অজ্ঞাতসারে সাপটি এক বাটি দুধ খেয়ে নেয়। আর প্রত্যহ এই ঘটনা ঘটে। খুব কম লোকই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। মনে করা হয় পূণ্যবান লোকেরাই সাপটির দুধ খাওয়ার দৃশ্য দেখতে পান।

লোদুর্বাতে কল্পতরুটি খুব জনপ্রিয়।

কল্পতরু

এখানে পূজা দিলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। বহু পুরানো কাল থেকে পরম্পরায় এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়ে আসছে।

১২৫ বছর আগে জৈনরা এটি তৈরি করেন। বিশ্বাসের মূলে যাই থাক, গাছটির গঠন-শৈলি আপনাকে মুগ্ধ করবে। কেননা কারিগরদের হাতে তৈরি কল্পতরুতে ফল ধরেছে। ফলের আকর্ষণে পাখিও এসে জুটেছে। আর গাছকে কেন্দ্র করে হরিণ, সিংহ এবং সাপের সহাবস্থান। ভালবাসা এবং মৈত্রীর প্রতীক।

ফিরে আসি অটোতে।

লোদুর্বা থেকে চলেছি উত্তর দিকে। জয়সলমীর শহরের উত্তর দিকে রামকুণ্ড। পথে পড়ল রূপসী গ্রাম। গ্রামে ঢোকার আগেই দেখেছি একটি জলাশয়। ড্রাইভার বলল এটি খাঁড়ি। যাইহোক প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট এই জলাশয়ে জল আছে। কিছু পাখিও দেখছি উড়ে বেড়াচ্ছে।

অবাক লাগে, মরুভূমির মাঝে কি করে এই জলাশয়ের সৃষ্টি হয়! এ এক আশ্চর্য ব্যাপার মরুভূমিতে, বৃষ্টি হয়, জলও আছে তবে বালি থাকার জন্য জল বালির তলায় চলে যায়।

রূপসী গ্রামে কিছু পাকা বাড়িও দেখা যাচ্ছে। গ্রাম ছাড়িয়ে আসতেই আবার সেই বাবলা কাঁটা আর আকন্দ ফুলের হাতছানি। রূপসীর পর চলেছি পূর্ব দিকে। রুক্ষ মাঠ পেরিয়ে এসে পড়েছি রাম কুণ্ডে।

রামকুণ্ড

কক নদীর তীরে গড়ে উঠেছে রামকুণ্ড। জয়সলমীর শহর থেকে প্রায় ১১ কি. মি. দূরে

রামগড় রোডের উপর এই ছোট্ট জনপদের প্রধান দ্রষ্টব্য রামকুণ্ড মন্দির। মন্দিরটি তৈরী করেন অমর সিং-এর স্ত্রী। তাঁর নাম মনসুখী দেবী। ইনি ছিলেন যোধা বংশজাত কন্যা।

অনন্তরাম ছিলেন মহারাওয়াল অমর সিং-এর গুরু। মনসুখী দেবী গুরুর নামে মন্দিরটি অর্পণ করেন। মন্দির গাত্রের উৎকীর্ণ লিপি থেকে এসব কথা জানা যায়। আর মন্দিরের বাইরে গোবর্ধন স্তম্ভের গাত্রে অনেক কথা লিখিত আছে।

মন্দিরের উপাস্য দেব — শ্রীরাম। এছাড়া চারহাতওয়ালা গনেশ, মহিষাসুরমর্দিনী এবং ভিরু। ১৯৮৮ সালে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার নতুন মূর্তি সংযোজন করা হয়। এই তিনটি মূর্তি শ্বেত পাথরের।

রামকুণ্ডে ধর্মশালা এবং ছত্রী আছে।

মন্দিরটি খুব সাদামাটা। মন্দিরের সামনে ধর্মশালা। মন্দিরে আগত ভক্তদের যাতে থাকার কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রেখেছেন মনসুখী দেবী। সাময়িক আচ্ছাদন।

মন্দির দেখে আসি কক নদীর ধারে। এখানে একটি কুয়ো আছে। পাকা বাঁধানো কুয়ো। স্থানীয় লোকেরা এ কুয়োকে বলেন রামকুণ্ড। রামকুণ্ডের পাশ দিয়ে নদীতে যাই। শুকনো নদী। এখানে ওখানে কিছুটা জল আটকে পড়েছে। এছাড়া নদীতে কিছু বড় বড় পাথর পড়ে আছে। পাথরগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এক সময় এই নদী খরস্রোতা ছিল।

আমার আগ্রহ শুধু কক নদী না। কক নদীর ধারে এক সময় মুমাল প্যালেস ছিল। সে জায়গা কোথায়? স্থানীয় যে যুবকটির সঙ্গে আলাপ হল সে কিছু হদিস দিতে পারল না। ফিরে আসি অটোতে। আমার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করি—

—তুমি রাজকুমারী মুমালের প্রেমের কাহিনী জান?

—জানি।

—মুমাল-কি-মেরী কোথায় জান?

—শুনেছি কক নদীর ধারে।

—এইতো সে কক নদী, তাহলে?

—ঠিক জানিনা বাবু।

বুঝলাম এই প্রজন্মের ছেলেরা মুমালের প্রেমের কাহিনীটা জানলেও মুমালের বাসস্থান নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু মুমাল-কি-মেরীতো লোদুর্বাতেই থাকার কথা। তাহলে কক নদী নিশ্চয় লোদুর্বার মধ্যে দিয়েও গেছে। আগে খেয়াল করিনি।

রামকুণ্ড থেকে জয়সলমীর ফেরার পথে পড়ল বড় বাগ।

বড় বাগ

জয়সলমীর-রামগড় রোডে, শহর থেকে ৫ কি. মি. দূরে অবস্থিত বড় বাগ বা বড় বাগান। এটি জয়সলমীরের মহারাজাদের সমাধি ক্ষেত্র।

পাহাড়ের পাদদেশে, সমাধিক্ষেত্র, জলের ট্যাঙ্ক এবং বাঁধ। এগুলি তৈরী করেন

মহারাওয়াল জৈৎ সিং দ্বিতীয়। তাঁর পুত্র মহারাওয়াল লুন-করন পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেন। গোবর্ধন স্তম্ভের গায়ে লিখিত বক্তব্য অনুসারে জলাশয়টির নাম 'জৈৎসার' এবং বাঁধটির নাম 'জৈৎবাঁধ'।

জৈৎবাঁধটি ১২০০ ফুট লম্বা এবং ৩৫০ ফুট চওড়া। পুরো বাঁধটি বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। আবার জলাধারের জল বের করে দেবার পদ্ধতিও বড় অদ্ভুত। বিভিন্ন উচ্চতার পাঁচটি নালা তৈরি হয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে যায়।

পাহাড়ের উপর তৈরি হয়েছে মহারাজাদের স্মরণার্থে ছত্রী যে ছত্রী যার উদ্দেশ্যে গড়া হয়েছে সে ছত্রীতে রয়েছে সেই মহারাজা বা মহারাণীর খোদিত মর্মর মূর্তি।

জয়সলমীর-রামগড় রোড থেকে অনেকটা নিচে জৈৎবাঁধ। বাঁধের মুখে চৌকি। চৌকিতে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হয়। গাড়ি পিছু প্রবেশ মূল্য দশ টাকা।

বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দেখি জৈৎসারের জল অনেক নিচে পড়ে আছে। দুদিকের পাহাড়ও সামান্য উচু। বর্ষাকালে জৈৎসারের বাড়ন্ত জল আশপাশের গ্রামকে সমৃদ্ধ করে। পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠা ছত্রীগুলো বড় অবহেলায় পড়ে আছে। অথচ ছত্রী, বাঁধ এবং বাগিচা দেখা শুনার জন্য লোক আছে। ভ্রমণার্থীদের থেকে মাশুলও তুলে নিচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

ফিরে এলাম জয়সলমীরে। আমার এখনও উড ফসিল দেখা বাকি। আমার অটোর ড্রাইভার রসিদ আলি বলে, স্যার আপনি জল খাবার খেয়ে নিন। ততক্ষণে আমি গাড়ীর গোলমাল সেরে নিই।

হ্যাঁ, সকালে হনুমান চক থেকে কিছুটা যাওয়ার পর গাড়ির গোলমাল দেখা দেয়। স্টার্ট নেওয়ার জন্য আমাকে অটো ঠেলতে হয়েছে। সুতরাং গাড়ি সারাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তারপর আবার পথ চলা শুরু। শহরের দক্ষিণ দিক দিয়ে বেরিয়ে জয়সলমীর-বাড়মের রোড ধরে অটো এগিয়ে চলেছে। আমি বার বার তাকিয়ে দেখছি বাম দিকের জলের পাইপ লাইন। বাড়মের থেকে আসার পথে দেখেছিলাম ডাবলা গ্রামের কূয়ো থেকে জল সরবরাহ হচ্ছে। ডাবলা গ্রামের আগে ডান দিকে মিলিটারি ব্যারাক এবং ট্রেনিং সেন্টার। মিলিটারি এরিয়া এবং ডাবলা গ্রাম ছাড়িয়ে আরো দু কিলোমিটার এগিয়ে আকল।

উড ফসিল পার্ক (আকল)

জয়সলমীর শহর থেকে ১৭ কিমি দূরে রয়েছে আকল গ্রাম। এই গ্রামেই রয়েছে উড ফসিল পার্ক। এটি বাড়মের-জয়সলমীর রোডের পাশে অবস্থিত। থর মরুভূমির এই আকল গ্রামেই ১৮ কোটি বছরের পুরানো জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

১৪ একর জমির চারদিকে প্রাচীর এবং তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এটিই উড পার্ক। পার্কের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সাইজের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। যেটিকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে সেটিকে সে অবস্থায় লোহার তারজালি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আবার কোনটা কাচের খাঁচা দিয়ে ঢাকা।

বৈজ্ঞানিকদের মতে ১৮০ কোটি বছর আগের জীবাশ্ম এবং এই গাছগুলো ছিল ফলহীন। এই অঞ্চলে তখন বন ছিল। বড় বড় মহীরুহ কোন কারণে মাটি চাপা পড়ে ফসিলে পরিণত হয়।

আমাদের অটো এসে থামল উড ফসিল পার্কের গেটে। অটোর হর্ণ শুনে এক ভদ্রলোক পাশের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলেন। উড ফসিল দর্শন করব শুনে ভদ্রলোক আবার কোয়ার্টারে ফিরে গেলেন। হাতে এক গোছা চাবি এবং অন্য হাতে একটি ব্যাগ।

ভদ্রলোক প্রথমে গেট খুলে দিলেন। তারপর ব্যাগ থেকে রসিদ বই নিয়ে রসিদ কাটলেন। ১৫ টাকার রসিদ। পাঁচ টাকা উড ফসিল পার্কের প্রবেশ মূল্য এবং দশ টাকা গাইড সার্ভিস। টাকা পেমেন্ট করতেই তিনি গেইট বন্ধ করে আমার পাশে এসে বসলেন।

পার্কের মধ্যে পিচ ঢালাই রাস্তা। পিচের রাস্তা ধরে অটো এগিয়ে চলেছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি অনেক দূর বিস্তৃত পার্ক। পার্কের দুদিকে প্রাচীর, অন্য দুদিকে কাঁটা তারের বেড়া। আমার পাশে বসা কেয়ারটেকার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি—

—আপনার নাম জানতে পারি?

—আমার নাম ভগবান সিং, আমি এই উড ফসিলে চাকরি করি।

—কতদিন ধরে এখানে চাকরি করছেন?

—উড ফসিল পার্কের জন্ম থেকেই চাকরি করছি।

—থর মরুভূমির এই উড ফসিল পার্ক ছাড়া রাজস্থানে আর কোথাও উড ফসিল পার্ক আছে কি?

—না।

এইবার তিনি আমার সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, কবে রাজস্থানে এলাম, কোথায় কোথায় ঘুরলাম……এইসব। আমিও ওনার কৌতূহল মেটালাম।

পাকা পথের শেষ সীমানায় গাড়ি এসে থামল। আমরা পায়ে হেঁটে এগোতে থাকি। চারদিকে ছোট বড় শিলা ছড়িয়ে আছে। কাঁকুরে পথ দিয়ে এগোতে এগোতে ভগবান সিং এক জায়গায় এসে থামলেন। সামনে দেখছি লোহার জাল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। উনি বললেন—ঐ দেখুন ফসিল।

আমি উবু হয়ে ফসিলটিকে লক্ষ্য করি। দেখতে পাথরের মত শক্ত। তবে পর্যবেক্ষণ করলে পাথর এবং উড ফসিলের তফাৎ বোঝা যায়।

উড ফসিল লম্বা আঁশটে, অনেক জায়গায় গুঁড়ো হয়ে আছে। আর পাথরের বাঁধন যেমন শক্ত আকারেও বিভিন্ন। কোনটা মসৃণ, কোনটা এবড়ো খেবড়ো। উড ফসিল আকারে লম্বা হলেও মাঝে মাঝে চিড় ধরেছে। কিন্তু পাথরে চিড় ধরে না একেবারে ভেঙ্গে অন্য আকার নেয়।

আমি উঠে দাঁড়াতেই উনি বললেন এটি ১নং ফসিল। দেখছি খাঁচার গায়ে লেখা—

Wood Fossile No 1

Size 2·30 × 1·00 M.

একটু দূরে রয়েছে ২নং ফসিল। আমরা এগিয়ে চলি। হঠাৎ কর্কশ স্বরে কিছু পাখির ডাক শুনি। ভগবান সিং আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন—

ঐ দেখুন আকাশে শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে, এগুলো মরুভূমির শকুন।

শকুন দেখতে গিয়ে আমার হাঁটা শ্লথ হয়ে পড়ে। ততক্ষণে ভগবান সিং অনেকটা এগিয়ে গেলেন। উনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি এগিয়ে গেলাম। ৩নং এবং ৪নং ফসিল।

Wood Fossile No 3 — Size 3·00 × 0·70 M.

Wood Fossile No 4 — Size 5·40 × 1·00 M.

আরো খানিকটা দূরে রয়েছে সবচেয়ে বড় ফসিলটি।

Wood Fossile No 5

Size 9·00 × 1·50 M.

৯ মিটার লম্বা ফসিলটি দেখেই চেনা যায় এটি একটি মোটা গাছের গুড়ি। এই ফসিলটির উপরে টিনের ছাদ। টিনের শেডের নিচে মোটা স্বচ্ছ কাঁচের ঘর। ঝড় জল কিছুই ফসিলটির ক্ষতি করতে পারবে না। সেভাবেই সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উড-ফসিল দেখে ফিরে আসি জয়সলমীরে।

সাত

এখন বেলা ১১টা।

একটু বিশ্রাম দরকার। রুমে ঢুকলাম। হালকা জলযোগও সেরে নিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বের হব দুর্গ দর্শনে।

জয়সলমীর দুর্গ

যোধপুর থেকে বাসে কিংবা ট্রেনে আসার সময় বহুদূর থেকে নজরে পড়ে কাঁচা হলুদ রংয়ের দুর্গ। হলুদ রং শুধু দুর্গের নয়, দুর্গের প্রাচীর, তোরণ, দরবার প্রাসাদ, এমনকি দুর্গের বাইরের আধুনিক শহর সবই যেন হলুদ বরণ। যেন সোনায় মোড়া শহর। এ এক আশ্চর্য বর্ণ সঙ্গতি।

জয়সলমীর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ত্রিকুট পাহাড়ের উপরে গড়ে তোলা হয় তিন ধাপি দুর্গ। খুব মজবুত দুর্গ। শহর থেকে ২৫০ ফুট উচু ত্রিকুট পাহাড়ের চারদিকে ১৫ ফুট চওড়া পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এই পাহাড়টি লম্বায় ৫০০ ফুট এবং চওড়ায় ২৫০ ফুট। পুরো পাহাড় নিয়েই গড়ে উঠেছে দুর্গ।

দুর্গের তিনটি প্রাচীর। প্রথম ধাপ দ্বারা পাহাড়কে ধরে রাখার ব্যবস্থা। এই ধাপকে বলে

পাথা। পঞ্চদশ শতকে জৈন পঞ্চায়েত এই ধাপটি তৈরি করে। সে সময় জয়সলমীরের রাজা ছিলেন মহারাওয়াল লক্ষ্মণ সিং।

দ্বিতীয় ধাপের দেওয়াল ৫ মিটার উঁচু। এই ধাপকে বলা হয় প্রাচীরের ঠেস। পুরো পাহাড়ের চারদিকের এই প্রাচীর তৈরি করেন মহারাওয়াল ভীম। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে। আর তৃতীয় ধাপের দুর্গপ্রাচীর হল দুর্গের মূল প্রাচীর। তিনটি তোরণ এবং চারটি গম্বুজ তৈরি করেছিলেন মহারাওয়াল ভীম এবং মহারাওয়াল মনোহর ষোড়শ শতাব্দীতে। এইসব গম্বুজে থাকত অজস্র বৃত্তাকার পাথর যাতে যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ দুর্গে প্রবেশের সময় নিক্ষেপ করা যায়।

দেওয়ালের ঠেস, দুর্গ প্রাচীর এবং কামান ব্যবহারের গম্বুজ সব মিলিয়ে খুব দুর্ভেদ্য দুর্গ। দুর্গের আলাদা পরিখা নেই। এই দুর্গ থেকে সমগ্র শহর এবং চারদিক খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। সুতরাং সামরিক দিক দিয়ে দুর্গের অবস্থান নিরাপদ। এই নিরাপদ দুর্গটি ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে তৈরি করেছিলেন রাওয়াল জয়সাল।

দুর্গদর্শন

দুপুর সাড়ে এগারোটায় এসে পৌঁছাই অক্ষয় পোলে। অক্ষয় পোল দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতেই কয়েকজন গাইড ছুটে আসে। আমি একজনকে বেছে নিলাম। এর নাম দোয়ারকানাথ। গতকাল গরিসর ট্যাঙ্কে যাবার সময় এর সঙ্গে আলাপ হয়।

দোয়ারকানাথ বলে, এই প্রসিদ্ধ দুর্গটি তিন ধাপি দুর্গ। একেবারে উপরের গোলাকৃতি ধাপকে বলে বুরুজ। সারা কেল্লায় মোট ৯৯টি বুরুজ আছে। এগুলিতে সৈন্যরা পাহারা দিত। আর এই যে অক্ষয় পোলটি দেখছেন এটি দুর্গ তৈরির অনেক পরে অর্থাৎ ১৭০০ অব্দে তৈরি হয়।

এগিয়ে চলি।

দ্বিতীয় তোরণ সুরযপোল। খুব মজবুত তোরণ। দোয়ারকানাথ বলে—বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি এই তোরণ।

সূর্যতোরণও বেশ মজবুত। উপরে বুরুজের দিকে তাকিয়ে দেখি কতকগুলো গোলাকৃতি পাথর সাজানো আছে। এই গোলাকার পাথর শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে সাজানো হয়েছিল। সুরযপোলের পর দেখতে পাচ্ছি প্রাচীরের একটা অংশ ভাঙ্গা এবং কিছুটা ধ্বসে পড়ার অবস্থা হয়ে আছে। জনগণকে দূরে থাকার জন্য সাইনবোর্ডে অনুরোধ করা হয়েছে। ভূতাপোলের পর পথের নতিমাত্রা কমেছে।

হাওয়া পোলে এসে চড়াই পথের শেষ। আর এখান থেকেই শুরু দুর্গশহরের দ্রষ্টব্যগুলো দেখা। দুর্গশহর দর্শনের আগে সতী-পীঠ এবং রাজমহল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

সতীয়ন-কা-পেগোথি বা সতী পীঠ

রাজপুতদের যত রীতি-নীতি ছিল তার মধ্যে জহরব্রত ছিল অত্যন্ত ভীতিজনক। প্রথাটা

যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন বিধর্মীর হাত থেকে ইজ্জত রক্ষার এটাই ছিল মহান ব্রত। রাজপুত যোদ্ধাদের নীতি হল—হয় যুদ্ধে জয়লাভ করবে নয়তো বীরের মত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব যোদ্ধা নিহত হতেন তাদের স্ত্রীগণ স্বামীদের সঙ্গে সহমরণে গিয়ে সতী হতেন। এই প্রথাকে বলে জহরব্রত। আর যে স্থানে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হত সে জায়গাকে বলা হয় সতী-পীঠ।

রাজমহল

দুর্গের মধ্যে পাঁচটি মহল আছে। মহলগুলির খোদাই কাজ খুব প্রসংশনীয়। পাঁচটি মহল যথাক্রমে—রঙ মহল, সর্বোত্তম বিলাস, গজমহল, অক্ষিবিলাস এবং মোতি মহল। রঙ মহলটি তৈরি করেন মূলরাজ দ্বিতীয়। এই মহলটির ভিতর এবং বাইরে কিছু চিত্র এবং ছবি আছে। চিত্রগুলো মুঘল এবং রাজপুত ঘরানার।

গজমহলটি তৈরি করেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহারাওয়াল গজ সিং। এই মহলের ভিতর ও বাইরে সুন্দর খোদাই কাজ করা। বিশেষ করে ঝুল বারান্দার কারুকার্য খুব আকর্ষণীয়।

মহলগুলির সিলিং-এর কারুকার্য অপূর্ব। প্রাসাদের বাইরে খোলা আকাশের নিচে মেঘ দরবার। বসার জন্য পাথরের ঢালে তৈরি আসন। সারি সারি আসন। এর মধ্যে শ্বেত পাথরের আসনটি নির্দিষ্ট ছিল রাজার জন্য। আজ আর রাজা নেই রাজদরবারও বসে না।

হাওয়া পোলের পর অনেকটা খোলা জায়গা। এই খোলা জায়গার ডানদিকে চামুণ্ডা মন্দির। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়ারকানাথ বলে—'ঐ দেখুন রাজমহল।' রাজমহলে উঠার সিঁড়ি পথের দুদিকে বাইরের দেওয়ালে, পাথরে হাতের ছাপ খোদাই করা।

আমার গাইড বলে, 'মন্দিরের সামনের এই প্রশস্ত জায়গার নাম দশেরা চক। আর ঐ যে হাতের ছাপ দেখছেন এগুলি সতীদের হাতের ছাপ। সামনেই জহরব্রত পালন হত। মেঘ দরবার এবং চামুণ্ডা মন্দিরের সামনের এই জায়গাটি দশেরা চক। এখানে দশেরার সময় তিন দিন ধুমধাম সহকারে পূজা হত। প্রথম দিনে পাঁঠা বলি হত। দ্বিতীয় দিনে বলি হত বক্রী(ছাগী)। আর তৃতীয় দিনে হত দশেরা উৎসব।

সামনে দেখছি সাইনবোর্ড।

রাজপ্রাসাদ মিউজিয়াম দেখার জন্য আমন্ত্রণ। হ্যাঁ সমগ্র রাজমহলে মিউজিয়ামের ব্যবস্থা হয়েছে। আমার গাইড বলে—'মিউজিয়ামে আজ আর কিছুই দেখার নেই, তবু যেতে চাইছেন চলুন।'

দশ টাকার টিকিট কেটে মিউজিয়ামে ঢুকলাম। সত্যিই দেখার তেমন কিছুই নেই। যাও কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নোংরা ধুলো বালির মধ্যে পড়ে আছে পুরানো কালের দামী আসবাব। এমনকি রঙ মহল, সর্বোত্তম বিলাস, গজ মহল, অক্ষি বিলাস এবং মোতি মহল সবই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে

বসেছে। মহলগুলোর ভিতর-বাইরের খোদাই কাজ এবং সিলিং-এর সুক্ষ্ম কাজ দেখেই কিছুটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।

রাজপ্রাসাদের বাইরে আসি। আমার গাইড বলে—'জয়সলমীর দুর্গের জৈনমন্দিরগুলো দেখার মত, চলুন জৈন মন্দিরগুলো দেখবেন।'

চলার পথে মেঘদরবারের বামদিকে পড়ল সূর্য মন্দির। হিন্দু রাজাগণ সূর্যের আরাধনা করতেন। ধর্মের সহিষ্ণুতা এবং সহাবস্থান এই জয়সলমীরে যেমন দেখা যাচ্ছে অন্যত্র এমন সচরাচর দেখা যায় না। জয়সলমীর দুর্গে হিন্দুর দেব-দেউল এবং জৈন মন্দির রয়েছে। এমনকি দুর্গের লাগোয়া মুসলমানদের তাজিয়া মিনারও আছে।

আমরা এসে পড়ি জৈন মন্দির কম্পাউণ্ডে। জৈন মন্দির দর্শনের জন্য দশ টাকার টিকিট লাগে। ক্যামেরার জন্য আলাদা চার্জ। টিকিট কেটে মন্দিরের সামনে বসি।

দোয়ারকানাথ বলতে থাকে—এখানে একই কমপ্লেক্স্-এ ৭টি জৈন মন্দির আছে। তার মধ্যে পার্শ্বনাথ মন্দিরটি প্রাচীন।

পার্শ্বনাথ মন্দিরটি ২৩তম তীর্থঙ্করের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। পার্শ্বনাথ মন্দিরের বাম দিকে শম্ভুনাথ মন্দির, এটি তৃতীয় তীর্থঙ্করের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। পার্শ্বনাথের ডানদিকে শীতলনাথ মন্দির, এটি ১০তম তীর্থঙ্করের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

'পার্শ্বনাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার পথে দুটি মন্দির পড়ে। প্রথমটি শান্তিনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, ইনি ১৬তম তীর্থঙ্কর। আর দ্বিতীয়টি কুন্থনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, ইনি ১৭তম তীর্থঙ্কর। এছাড়া আরো দুটি মন্দির যথাক্রমে চন্দ্রপ্রভু তীর্থঙ্কর এবং ঋষভদেব তীর্থঙ্করের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। চন্দ্রপ্রভু হলেন ৮তম তীর্থঙ্কর এবং ঋষভদেব ১ম তীর্থঙ্কর। এই সব মন্দিরের গায়ে ৬৬৬৬টি দেব-দেবী ও তীর্থঙ্করদের মূর্তি আছে।'

আমরা প্রথমে চিন্তামণি পার্শ্বনাথ মন্দিরে প্রবেশ করি। এই মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রথম মন্দির। এটি সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

মন্দিরে ঢোকার মুখে পড়ে একটি তোরণ। তোরণে চিত্র খোদাই করা। এখানে জুতো মোজা এবং ব্যাগ রেখে ঢুকি, মন্দিরের সামনে দেখছি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করা। দেব-দেবীগণ যথাক্রমে—বিষ্ণু অবতার, কালী. শিব-পার্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা। এছাড়া প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ও ভালবাসার চিত্রাদি খোদাই করা। প্রাচীরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্যরত নর্তকী ছাড়া জীব-জন্তু ও বাদ্যযন্ত্র খোদাই করা।

পার্শ্বনাথ মন্দিরের প্রবেশ তোরণের পর আর একটি অলঙ্কৃত তোরণ। এই তোরণের নাম লক্ষণ বিহার। গর্ভ মন্দিরে পার্শ্বনাথজী পদ্মাসনে বসে আছেন। শ্বেত পাথরের মূর্তি। গর্ভমন্দিরের বাইরে মণ্ডপ। মণ্ডপের সিলিং-এ পাঁচটি মানুষের একটি মাত্র মাথা। অদ্ভুত এবং আশ্চর্য চিত্র। পাথরে খোদাই করা চিত্র। অনেকক্ষণ ধরে নিরিক্ষণ করলে তবে নির্মাণ কৌশল বোঝা যায়। মজার বিষয় হল, যে দিক থেকে দেখা যাক মনে হবে একটি পরিপূর্ণ মানুষের অবয়ব।

পাঁচ মূর্তির নিচে পাটা। পাটাগুলোতে বিভিন্ন মূর্তি।

সামনে রঙ্গ মণ্ডপ। মণ্ডপের সিলিং-এ পাথরের ফুল। ফুলের চারদিকে গম্বুজে ১১টি আলম্ব। প্রতি আলম্বে উপরের সারিতে নর্তকী এবং নিচের সারিতে বাদ্যবাদক। বাদ্যবাদকগণ পুরুষ। প্রতিটি মূর্তির ভঙ্গিমা নিখুঁত।

মণ্ডপের স্তম্ভগুলোতে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। এসব খোদিত মূর্তিগুলো কত ধৈর্য সহকারে কুঁদে কুঁদে তৈরি করা হয়েছে তা বলার নয়। শিল্পীদের যত্ন, ধৈর্য এবং তাদের শিল্প মাধুর্যতা যে কোন মানুষের কাছে প্রশংসনীয়। প্রতি দুটি স্তম্ভের মধ্যে আর্চ করা তোরণ। আর্চগুলো শঙ্খ আকৃতির খোদাই পাথরে গড়া, দেখলে প্রাণ জুড়ায়। সোনায় পালিশ করা সব চিত্র।

কি প্রখর ভাবনা চিন্তা!

সমগ্র সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে মূর্তির মধ্যে। কোথাও দেখা যাচ্ছে তরুণী আয়নার দিকে তাকিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। একজন অন্যজনকে চুমু খাচ্ছে। কোথাও বা বিবস্ত্র অঙ্গ। গান এবং নৃত্যরত মহিলাদের চিত্র সবই প্রশংসার দাবী রাখে। মন্দিরের স্তম্ভ এবং তোরণ গাত্রে জৈন তীর্থস্থান সমূহ চিত্রিত।

শম্ভুনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে শম্ভুনাথজীর মূর্তি ছাড়া আরো কিছু মূর্তি আছে। গর্ভমন্দিরের সামনে মন্ডপ। মন্ডপের সিলিং-এ পাথরের তৈরি ফুল। ফুলের চারিদিকে ১১টি আলম্ব। প্রতি আলম্বের উপরের সারিতে নর্তকী। নিচের সারিতে বাদ্য বাজক। এ ক্ষেত্রে বাদ্য বাজকগণ রমণী।

মন্ডপে ছয়টি স্তম্ভ। স্তম্ভগুলোতে রয়েছে চারটি তোরণ। সুন্দর আর্চ করা তোরণ। মন্দির গাত্রে তীর্থঙ্করদের মূর্তি খোদাই করা। প্রতিটি চিত্র নিখুঁত।

একটু দূরে রয়েছে শীতলনাথ মন্দির। শীতলনাথ মন্দিরের কাছে হলুদ পাথরে খোদাই করা আছে পাণ্ডব পরিবার পরিজন। শীতলনাথজীর মূর্তিটি পঞ্চ ধাতুতে তৈরি। শান্তিনাথজীর মূর্তিও পঞ্চধাতুর তৈরি। আর কুন্থনাথজীর শ্বেত পাথরের মূর্তি।

জৈন মন্দির দেখে আসি জিনভদ্রসূরি জ্ঞান ভান্ডারে।

জিনভদ্রসূরি জ্ঞান ভান্ডার

মন্দিরের একটি সম্প্রসারিত অংশে গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগার, বা জ্ঞান ভান্ডার। এখানে সংরক্ষিত আছে ভারতের প্রাচীনতম পুঁথিগুলোর কয়েকটি।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারটি তৈরি করেন আচার্য মহারাজ জিনভদ্রসূরি। ১১২৬টি তালপাতার এবং ২২৫৭টি কাগজের পুঁথির কোন কোনটি ৮০০ বছরেরও পুরানো। এই পুঁথিগুলোতে জৈন এবং রাজপুতদের চিত্রকলা, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয় বর্ণিত আছে। জৈন ধর্মের পুঁথি ছাড়া ভারতীয় দর্শন, কাব্য, নাটক এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের নানা পুঁথি আছে। বিভিন্ন ভাষায় লেখা পুঁথি যেমন মগধ, পালি, গুজরাটি, সংস্কৃত, মালভি এবং রাজস্থানি।

আর সাড়ে তেত্রিশ ইঞ্চির একটি পুঁথি যা সবার নজর কাড়ে।

দুর্গ শহর দর্শন শেষ।

দুর্গ শহরে অবশ্য ৪টি বিষ্ণু মন্দির এবং ৪টি শক্তি মন্দির আছে। এগুলিও দেখার বিষয়।

আমি ফিরে আসি মহীশূর সেবাসদনে। ১৯৯৫ সালেও আমি জয়সলমীর এসেছিলাম। তখন উঠেছিলাম হোটেল প্রিয়াতে। সেবার ঝটিকাসফরে জয়সলমীর দুর্গশহর এবং সম স্যান্ড ডিউনস দেখেছিলাম। সে দিনের সম স্যান্ড-ডিউনস ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেই জয়সলমীরের কথা শেষ করব।

সে দিন ছিল ১৯৯৫ সালের ১২ই অক্টোবর। সে দিনের জীপ সাফারীর সব সদস্যই ছিলেন হোটেল প্রিয়ার আবাসিক। সুতরাং হোটেল প্রিয়ার সামনে থেকেই আমাদের চলার শুরু হয়।

শহর ছাড়িয়ে আমরা এসে পড়ি দিগন্ত বিস্তৃত খোলা আকাশের তলে। পথের দুদিকে জমি। কোথাও আবাদ হয়েছে, কোথাও অনাবাদি জমি। তবে এ অঞ্চলে বাবলা কাঁটা, আকন্দ ফুলের গাছ এবং সাদা গুল্মই বেশি দেখছি। অন্য অজানা গাছও কিছু আছে তাছাড়া রাশিকৃত বালি। কোথাও বালির ঢিপি।

ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। যতদূর চোখ যায় কোথাও জনবসতি নেই। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর জীপ এসে থামল দামোদ্রী গ্রামে। সম স্যান্ড ডিউনস-এর পথে প্রথম গ্রাম। গ্রামের মানুষ আমাদের দেখে উচ্ছ্বসিত। আর আমরা তাদের দেখে কৌতুহলি। জীপ থেকে নেমেই আমি সবার আগে চলেছি। আমার ভীষণ কৌতুহল মরুভূমির বুকে মানুষ কেমন করে বেঁচে আছে তা জানার'

চলতে চলতে দেখি এক জায়গায় কয়েক জন মহিলা জটলা করছে। এরা সব এই গ্রামের কুমারী কন্যা এবং গৃহবধূ। ওরা আমাকে দেখে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল। আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি হাতের ইশারা করতে একটি বালিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে এগিয়ে আসে।

—চলিয়ে ভাইসাব হমারা ঘর দেখো।

—চলিয়ে।

(মনে মনে বলি আমিও তো এই চাই।)

কয়েকটি বাড়ি পেরিয়ে এসে থামলাম মাটির দেওয়াল ঘেরা একটি বাড়ির সামনে। সাদামাটা বাড়ি। এখানে দেখছি প্রতি বাড়ির চারদিকে মাটির দেওয়াল। দেওয়ালের রং হলদে-বাদামী। বাড়ির সামনে সদর দরজা।

সদর দরজা দিয়ে আমরা ওদের বাড়িতে ঢুকি। বাড়িতে ঢুকেই দেখি সল্প পরিসরের উঠান। উঠানে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছি। দরজার বিপরীতে অর্থাৎ আমার সামনে এবং

ডানদিকে ঘর। ডানদিকে মাটির দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো এক চালা ঘর। খোলা বারান্দা। উপরে মকাই ডাটার ছাউনি। তারই একদিকে রান্নার উনুন। খোলা বারান্দায় একজন মহিলা চাট্টুতে কি একটা পিষছে।

উচ্ছ্বসিত বালিকা কোন ভণিতা না করে আমায় বলল, 'মেরি মাতাজি চাট্টুসে গেঁও পিষতা হ্যায়।'

রান্নাঘরে দেখছি মাটি খুঁড়ে উনান তৈরি হয়েছে। বুঝতে পারছি মরুভূমির জঙ্গল, বাবলা-কাঁটা এবং আকন্দের ছাল জ্বালানো হয়। এক চালা ঘরের উপরে এসব জ্বালানি মজুত করা। ঘরে সামান্য কয়েকটি বাসন কোসন এবং হাঁড়ি কলসি। উচ্ছ্বাস ভরা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি—

— তুমহারা নাম ক্যায়া?

— তারা…… ঐ আসমানকা তারা।

তারার রসিকতায় আনন্দ পাই। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি তারার মাও মেয়ের কথায় চাট্টু চালাতে চালাতে হাসছে।

সামনের ঘরের দরজা বন্ধ। ওদিকে নজর যেতেই তারা বলে— চলিয়ে ভাইসাব অন্দরমে……। ঘরে ঢুকি। থাকার ঘর। চারদিকে দারিদ্রের ছাপ। তেমন কিছু নেই। অতি সাধারণ পরিবার। ঘরে বিছানা। আর কিছু কাপড় দড়িতে ঝোলানো। তারা বলে—

— হমারা শোনেওয়ালা ঘর।

ঘর দেখে বাইরে এলাম। ততক্ষণে ওর সাথীরা এসে পড়েছে। তাদের মধ্যে একজন যুবতী বধূ। আমি জিজ্ঞেস করি।

— ইয়ে কোন্ হ্যায়?

— মেরা ভাভী।

বধূর পায়ে এবং মাথায় অলঙ্কার। কপালে টিকলি। ফিতে দিয়ে মাথার চারদিকে বেড় দেওয়া। ওরা বেড়কে বলল—বরিয়া। গলায় পুতলির মালার মত। ওরা বলল—কণ্ঠি। মহিলার হাতে অনেকগুলো ধাতুর বেড়। ওরা বলল—চুদাস। বিয়ের পরে মেয়েরা পরে। হাতে চুড়িকে বলল—প্যাসাল। গায়ের ব্লাউজ—কুর্তি এবং সায়া —ল্যাণ্ডে। কানে ঝুলছে ধন্দরিয়া।

কুমারী মেয়ের পরনে ওড়না। — ওরা বলল—শাড়ি। বধুটির ছেলের গলায় ঝুলছে মাদুলি। ওরা বলল—রাখলি।

আরো কিছু কথার পর ওদের একটা ফটো তুললাম। ওরা খুব খুশি। তারা সুন্দরী এবং তার ভাভীকে দুটো করে টাকা দিলাম। তারার বৌদি বলে—ফটো লে লিয়া আওর রূপায়া দো। আরো দুটি করে টাকা দিয়ে তারাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি।

আমার সাথীরা হাত ইশারা করে ডাকছে। ছুটে যাই। জীপে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জীপ

এগোতে থাকল। সামনে পড়ল কানোই গ্রাম। কানোই গ্রামও এ ট্যুরের দ্রষ্টব্য বিষয়। আমার সাথীরা নামতে চাইল না। সুতরাং জীপ একটানা চলতে থাকে। আরো কিছুটা চলার পর পড়ল ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক। এটিও এই ট্যুরের দ্রষ্টব্য বিষয়।

ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক

১৯৮০ সালে এই ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্কটি গড়ে তোলা হয়। জয়সলমীর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৩২ কিমি দূরে কানোই এবং সমগ্রামের কাছে গড়ে উঠেছে পার্কটি। ৩১৬২ বর্গ কিমি এর পরিধি।

এই পার্কের লাগোয়া সমগ্রামের শেষ সীমানায় রয়েছে স্যান্ড ডিউনস। সুতরাং এই পার্কেও মাঝে মাঝে ছোটখাট বালির পাহাড় দেখা যায়। সারা পার্কে এক রকমের লতানো গাছ আছে। এই গাছে হলুদ ফুল ধরে। সম গ্রামের কাছে সিঙ্কারা এবং ব্ল্যাক বর্কি নামক পাখি দেখা যায়। বৈষ্ণবগণ এই পাখির রক্ষাকর্তা। আর সমগ্রামে বৈষ্ণবদের বাস বেশি।

থর মরুভূমির এই পার্কে সিঙ্কারা এবং ব্ল্যাক বার্ক ছাড়া ভাল্লুক, মরু খেঁকশিয়াল, খরগোস, মরু বেড়াল দেখা যায়। আর বিভিন্ন প্রজাতির শকুন এবং বাস্টার্ড পাখি পার্কের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। এক একটি বাস্টার্ডের ওজন ১৪ কেজি পর্যন্ত হয়। এদের লম্বা লম্বা পা এবং গলা। ১৬ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু হয়। সাধারণতঃ এগুলির গায়ের রং ধূসর হয়। কালো দাগ গলায়। এক হাজারের উপর বাস্টার্ড রয়েছে ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্কে।

কানোই গ্রাম ছাড়িয়ে ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে চলেছি। আকাশে কিছু পাখি দেখা গেলেও নিচে কোন জীবজন্তুর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। হয়তো গাড়িঘোড়ার চলাচলের কারণে জীবজন্তুগুলো দূরের লতা-পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে। হয়তো রাত হলে সব বেরিয়ে আসবে।

বিকেল সাড়ে ৫টায় আমরা এসে পৌঁছালাম সম-এ। এটাই বিখ্যাত সান সেট পয়েন্ট।

সম স্যান্ড ডিউনস

সান সেট পয়েন্ট এবং সম স্যান্ড ডিউনস একই। জয়সলমীর শহর থেকে ৪৫ কিমি দূরে রয়েছে সম গ্রাম। বালির পাহাড়। ঝড়ে বা প্রচন্ড হাওয়ায় এক দিকের বালি অন্য দিকে জমা হচ্ছে। সমুদ্রের জল ঝড়ে বা প্রচন্ড হাওয়ায় ফেঁপে ফুলে উঠে। আর ঝড় থেমে গেলে আবার সমুদ্রের জল একই সমতায় এসে যায়। কারণ জল তরল। এটাই জলের ধর্ম।

মরুভূমির বালির সমুদ্রে বালি ঝড়ের ধাক্কায় এক জায়গায় জড়ো হয়, এবং ঝড় থেমে গেলে সেই বালি নিজের ভারের জন্য সেখানেই পড়ে থাকে। এই ভাবেই সৃষ্টি হয় মরুভূমিতে বালির পাহাড়। এই সব বালির পাহাড় ৩ কিমি লম্বা ২ কিমি চওড়া। আর আধ কিমি অবধি উঁচু হতে পারে। পাহাড় পর্বতের মত দু-তিনটি বালির পাহাড়ের মাঝখানে খাদ। সমগ্রামে এরকম প্রচুর বালির পাহাড় দেখা যায়।

এসব বালির পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আর সূর্যাস্তের বিরল শ্য দেখা জীবনের মস্ত বড় অভিজ্ঞতা। সীজন সময়ে প্রতিদিন প্রায় একশ উট ট্যুরিস্টদের নিয়ে স্যান্ড ডিউনস-এ ঘুরে বেড়ায়। ভাড়া নেয় কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা জন প্রতি। সম গ্রামে একটি হোটেল এবং R.T.D.C. পরিচালিত একটি মদের দোকানও আছে।

সমগ্রামে এসে দেখি রাস্তার পাশে নিচু জমিতে প্রায় দু-তিনশ উট জড় হয়েছে। উটের মালিকগণ উট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের ঘিরে ভ্রমণার্থী যারা উটে চড়ে, সম স্যান্ড ডিউনস-এ ঘুরে বেড়াবেন তাদের জটলা। আর বিরাট সমাবেশের কারণে দোকানিরা বিভিন্ন খাবারের দোকান খুলে বসেছে। সব মিলিয়ে যেন মেলা বসেছে।

এখানে উটওয়ালাদের ইউনিয়ন আছে। সান সেট পয়েন্ট পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনবে মাথা পিছু ভাড়া ২৫ টাকা। প্রতি উটে দুজন করে সওয়ারি উঠতে পারে। ২৫ টাকা করে টিকিট কেটে আমরা দুজন একটা উটের পিঠে চড়ি। উটওয়ালা আমাদের পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। আমরা চলেছি সান সেট পয়েন্টের দিকে। চলতে চলতে উটের মালিককে জিজ্ঞেস করি।

— আচ্ছা ভাই, এখানে কতগুলো উট আছে?

— তিনশ।

— ব্যস, যারা সওয়ারি পেল না তাদের কি করে চলবে?

— আমাদের তিনশ উট মালিকের ইউনিয়ন আছে। আজ যে টাকা আয় হবে তা আমাদের তিনশ জনের মধ্যে ভাগ হবে।

— কেউ যদি বকশিষ দেয়?

— বকশিসের টাকা উটওয়ালার নিজের।

সুন্দর ব্যবস্থা।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি বালির সমুদ্রে যেন কেউ বিভিন্ন ছবি এবং আলপনা এঁকে রেখেছে। মসৃণ আলপনার মাঝখানে মানবের পদচিহ্ন বড় বেমানান লাগছে। প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি। প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট এসব আলপনা এবং ছবি।

সূর্যের আলো বালির সমুদ্রে বিচ্ছুরিত হয়ে অপূর্ব রঙের সৃষ্টি করেছে। দিগন্তে নীল বিচ্ছুরণ। রঙের কারসাজি সারা মরুভূমির বুকে। অস্তগামী সূর্যের আলো যত নিস্তেজ হয়ে আসছে সূর্যের চারদিকে আকাশ জুড়ে ততই যেন রং-এর খেলা বসেছে। যেন দুটি সূর্য হঠাৎই অন্ধকারের মধ্যে ডোবার আয়োজন করছে।

দিগন্তে অন্ধকার নেমে আসার আগেই আমরা ফিরে এলাম সমগ্রামে। তারপর অন্ধকারের বুক চিরেই ফিরে এলাম জয়সলমীরে।

জয়সলমীর দর্শন শেষ।

জয়সলমীরে দুবার আসার পরেও কিছু জায়গা অদেখা রয়ে গেছে। তার মধ্যে একটি

ভাল জায়গা হল— খুরি। খুরি গ্রামটি রয়েছে জয়সলমীর থেকে ৪০ কিমি দূরে। এই গ্রামে পাথরের মাঝখানে বৃক্ষ শাখা দেখা যায়। এই গ্রাম থেকে এক কিমি দূরে স্যান্ড ডিউনস দেখার বিষয়। এই গ্রামে ভগবান সিং সোধা নামে একজন গাইডও আছে। খুরি যাওয়ার স্থানীয় বাস পাওয়া যায় সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে।

যাই হোক, আমি আজ রাতে চলে যাব বিকানীর। জয়সলমীর দুর্গের দক্ষিণ দিকে ইণ্টার- স্টেট বাস স্ট্যান্ড থেকে গভর্নমেন্ট বাস যায়। আর হনুমান চক থেকে প্রাইভেট কোম্পানীর বাস যায় বিকানীর। আমি প্রাইভেট কোম্পানীর বাসেই যাব।

'স্বাগত'

ডেইলি সুপার ডিল্যুক্স কোচ সার্ভিস। এই সার্ভিস এর একটি বাস ছাড়ল রাত সাড়ে ৯টায়। ভাড়া ১০০্টাকা। আমি এ বাসেই যাব বিকানীর। হনুমান সার্কল থেকে আরো কয়েকটি বাস রাজ্যের অন্যান্য শহর এবং দিল্লীর সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে।

রাত সাড়ে তিনটায় এসে পৌঁছাই বিকানীর। বাসস্ট্যান্ড থেকে রেল স্টেশান আরো দূরে। রাত ৪টায় রেল স্টেশানের কাছে মেহতা ধরম-শালায় পৌঁছাই সকাল পাঁচটার মধ্যে ধরম-শালায় ঘর পাই এবং ঘুমিয়ে পড়ি।

আট

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

সকাল ৮টায় ঘুম ভাঙল। বিকানীর। ঘোরার আগে বিকানীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

বিকানীর

রাজস্থানের উত্তর দিকে থর মরুভূমির পাক-ভারত সীমান্তবর্ত্তী জেলা। বিকানীর রাজস্থানের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা যোধা সিং-এর ষষ্ঠপুত্র বিকা থর মরুভূমির বুকে ১৪৮৩ থেকে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শহরটি গড়ে তোলেন। বিকার নামানুসারে শহরটির নাম হয় বিকানীর। অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই এক সময় প্রবাহিত হত। বিকানীর শহরটি ৭ কিমি দুর্গ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ৫টি তোরণ এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

গ্রীষ্মকালে এখানে ধুলোর ঝড় উঠে। তখন প্রচন্ড জলাভাব দেখা দেয় এখানে। ৩৮.১০ বর্গ পরিমিত শহরের গাম্ভীর্যতা সবার সমীহ আদায় করে চলেছে। এখানকার দুর্গটি যেমন এক আশ্চর্য সৃষ্টি, তেমনি লালগড় প্যালেস এবং গঙ্গা গোল্ডেন জুবিলি মরুভূমির সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সংগে পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। আর শহর থেকে ১০ কিমি দূরের ক্যামেল ব্রিডিং তো মরুজাহাজ সৃষ্টি করে চলেছে।

হিন্দু মুসলমান এবং জৈন সম্প্রদায়ের ধর্মস্থলগুলো মনে শান্তি আনয়ন করে। আর ৩২ কিমি দূরের গজনের প্রাসাদ এবং সেখানকার অভয়ারণ্য না দেখলে অনেক ভাল কিছু দেখার আত্মতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন।

যাতায়াত ব্যবস্থা

থাকার জায়গারও অভাব নেই। দামী হোটেল —লালগড় প্যালেস (ফোঃ ৩২৬৩) গজনের প্যালেস (ফোঃ ৩২৬৩, ৩২৩৯), এটি শহর থেকে ৩২ কিমি দূরে গজনেরে অবস্থিত। মধ্যবিত্ত হোটেল,—আর-টি-ডি-সির হোটেল, ধোলামরু ট্যুরিস্ট বাংলো (ফোঃ ৫০০২), এটি পুনম সিং গেটে। ডাকবাংলোটি রয়েছে স্টেশানের কাছে। রেল স্টেশানের কাছে মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ হোটেলও আছে অনেক। যেমন শ্রীপারেক হোটেল, রূপম হোটেল, আনন্দ হোটেল, লক্ষ্মী হোটেল, হোটেল যোশী, গ্রীণ হোটেল....ইত্যাদি। তাছাড়া ধর্মশালা আছে। মেহ্‌তা ধর্মশালা রেল স্টেশানের কাছে এবং বিশাল ধর্মশালা পাবলিক পার্কের কাছে।

সাধারণতঃ শহরে চলাচলের জন্য অটো রিকশা। বিকানীরের আয়তন ২৭২৪৪ বর্গকিমি। গ্রামের সংখ্যা ৬৫০ এবং ৪টি তহশীল-এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে বজরা, পালসেঁস, তুলো এবং তৈলবীজের চাষ হয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে জীপসাম, লাইম ষ্টোন, মার্বেল, চায়না ক্লে এবং হোয়াইট ক্লে পাওয়া যায়।

আজকের ভ্রমণ শুরু করি।

বাসে গজনেরে আসি। বিকানীর শহর থেকে ৩২ কিমি দূরে রয়েছে। গজনের প্রাসাদ। এটি বিকানীর মহারাজাদের গ্রীষ্মাবাস। বর্তমানে প্রাসাদটি পরিণত হয়েছে হোটেলে। এখানকার আসবাব, ছবি কার্পেট দেখার মত। প্রাসাদের ম্যানেজারের ফোন নং ৩২৬৩। আর সব থেকে আনন্দ পাওয়া যায় প্যালেসের লাগোয়া অভয়ারণ্য দেখে। সাজানো বাগান, ফুলের বাগিচা, নীলগাই আর নানান জাতের পাখি। মনো-মুগ্ধকর পরিবেশ।

ফিরে আসি বিকানীরে। তারপর ঢুকি গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামে। দর্শনী লাগে ৩্।

গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম

মিউজিয়ামে ঢোকার মুখেই পড়ল সংগ্রাহালয়। এখানে বাঘ, সিংহের মৃতদেহ ঔষধ দিয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে। এই জন্তুগুলো মহারাজা গঙ্গা সিং শিকার করেছিলেন। গঙ্গা সিং দ্বিতীয় ১৯৩৮ সালের ৭ই এপ্রিল বাঘ শিকার করেছেন তারই চিত্র।

এছাড়া গঙ্গা সিং-এর মিলিটারি পোষাক পরিহিত দন্ডায়মান পেইণ্টিং। ১৯৩৭ সালের গোল্ডেন জুবিলি দরবার। স্টাডি রুমে গঙ্গাসিং, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে সমর বিদদের সংগে গঙ্গা, দরবারের সাজে সজ্জিত দন্ডায়মান গঙ্গা সিং। এমন অনেক ছবি এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

কলাবিভাগ

পিতলের জগ, কসমেটিক বাক্স, পিতলের তৈরি হাতি, ঘোড়া, উট। বাদ্য যন্ত্র—ঘুঙ্গুর, বাঁশি, করতাল, ফুগী, তুরী, একতারা, ডুগডুগি, ডমরু, ঢোলক, ঢোল....ইত্যাদি। পাত্র—পুরানো এবং আধুনিক কালের মৃৎপাত্র। এছাড়া কাঁচের হরেক রকম পাত্র। আবার অনেক পাত্র পেইন্টিং করা।

লালগড় লক্ষ্মীবিলাস এবং গজনেরের ডুঙ্গর নিবাস মহলের মডেল। এতদ্‌ভিন্ন মহারাজাদের পোষাক শোভা পাচ্ছে।

ঐতিহাসিক বিভাগ

এই বিভাগে আকবর এবং করন সিং-এর সাক্ষাতের একটি দৃশ্য। বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা। বিকানীর রাজা গুজরাতের মির্জা মহম্মদকে বধ করতে উদ্যত এমন অনেক তৈল চিত্র।

অস্ত্র বিভাগ

সমরাস্ত্র যেমন বন্দুক, তরবারি, যুদ্ধের পোষাক, তীর ধনুক, কুড়ুল, বল্লম, সড়কি ইত্যাদি। এ বিভাগে সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি বড় তোপ। তোপটি বসানো আছে গ্যালারির পিছনের দিকে।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ

গুপ্তযুগে পাওয়া পাথরের মূর্তি যেমন গণেশ, শিবলিঙ্গ, উমা-মহেশ্বর....ইত্যাদি। এমনকি পশুর মূর্তি যেমন রাম ছাগলের মুন্ড. সিংহ······ ইত্যাদি। সব থেকে ভাল লাগে শ্বেত পাথরের সরস্বতী মূর্তিটি দেখে।

১২শ শতাব্দীর নর্তকীর পাথরে খোদাই মূর্তি, পাল যুগের উমা-মহেশ্বর, ষোড়শ শতাব্দীর লক্ষ্মী নারায়ণ এমনকি বিংশ শতাব্দীর খোদাই চিত্রও দেখার বিষয়। এই গ্যালারির মাঝখানে উমা-মহেশ্বর, ব্রহ্মা এবং দেবী-মূর্তিগুলো বেশ বড় আকারের।

মিউজিয়ামের উল্টোদিকে রয়েছে গ্রন্থাগার। বহু পুরানো বই যেমন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং রাজস্থান ঘরানার পুঁথি আছে। লাইব্রেরীতে বসে পড়া যায়। বহু ছাত্রকে দেখলাম বসে পড়াশুনা করতে।

গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়াম দেখে আসি লালগড় প্যালেসে। প্যালেসের সামনে একটি পার্ক। তাতে বিকানীর স্টেট রেলওয়ের একটি বগি প্রদর্শিত হচ্ছে। লালগড়ে প্যালেসের সামনের দিকে প্যালেস হোটেল এবং পিছনের দিকে মিউজিয়ামের প্রবেশ পথ।

সাদুল মিউজিয়াম (SADUL MUSEUM)

মিউজিয়ামে প্রবেশ মূল্য ৫্। ১৯৭৬ সালে এই মিউজিয়ামটি গড়ে উঠে। মহারাজা করণ সিং এই বিল্ডিংটি দান করেন। তিনি ১৯৫২-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতের লোকসভা সদস্য ছিলেন।

এই মিউজিয়াম সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

The Museum was created to Extricate Bikaner history, art and literature from romance, fiction, eulogy and exaggeration and place it within the Ambit of Modern Research to which their highnesses, Maharaja Shri Sadul Singhji and other Members of the Royal Family of Bikaner have contributed is no small Measure.

সুতরাং অনেক কিছুই জানবার আছে এই মিউজিয়াম থেকে। মিউজিয়ামটি দোতলায়। নিচের তলায় হোটেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি দোতলায়। সিঁড়ির ডান দিকে মহারাজা সাদুলের ছোটবেলা থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত, জীবনের বিভিন্ন সময়ের ছবি। এমন কি তার জেনারেল জীবনের ঘটনাপঞ্জীর ছবি ধারাবাহিক ভাবে সাজানো আছে।

মহারাজা সাদুল সিংজীর জীবন.পঞ্জীতে বলা হয়েছে— LT General His Highness Maharaja Sadul Singhji Born on 7th Sept 1902 A.D. and Died 25th Sept. 1950 A.D.

রয়াল ফ্যামিলির সদস্যদের ফটো এবং পরিচিতি সাজানো রয়েছে। মহারাণী সুদর্শন কুমারী, মহারাজা দুঙ্গর সিং, প্রিন্সেস জয়শ্রী, কুমারজি এবং আরো অনেকের ছবি।

টিকিট কাটি। আমার পাশাপাশি ৫/৬ জনের একটি পরিবার উঠে এসেছেন। মিউজিয়ামের নিজস্ব গাইড এক-এক করে গ্যালারিগুলোর প্রদর্শনী সম্বন্ধে বলতে লাগলেন।

লম্বা বারান্দা। বারান্দায় দেখি একটি বিরাটাকার হাঁড়ি। হাঁড়ির বাম দিকের বারান্দায় উপরে ত্রিমাত্রিক ছবি। তাতে দেবী বিকাজীকে আশীর্বাদ করছেন তারই ছবি।

প্রথম থেকে ২৩তম মহারাজাদের বংশ পঞ্জিকা রয়েছে এখানে। ছবি আর ছবি। এক জায়গায় দেখছি কয়েকটি নৌকা। কেউ একজন হাতের কুড়াল নৌকা ভাঙ্গছেন, আর হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ সবিস্ময়ে সেই দৃশ্য দেখছেন। কেউ কেউ ভীত এবং ত্রস্ত। এ দৃশ্য আমি গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়ামেও দেখেছি।

গাইড বললেন আওরঙ্গজেবের সময় এসব নৌকা করে হিন্দু প্রজাদের সিন্ধুনদের ওপারে জোর করে নিয়ে যেত এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করত। মহারাজা করণ সিং এ ঘটনায় বিচলিত হয়ে উঠেন এবং সমস্ত নৌকা তছনছ করে এই অন্যায় অত্যাচার থেকে হিন্দুদের রক্ষা করেন। এ তারই ছবি।

বারান্দার দু'পাশে ছবি এবং তার বিবরণ। ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম এবং মহারাজা করণ সিং-এর আঁকার রং। বিদেশ থেকে আনা এসব রং। গ্যালারির শেষ মাথায় একটি পাল্কী। পাল্কীতে পর্দা লাগানো।

ফিরে আসি সেই পিতলের হাঁড়ির কাছে। এবার ডান দিকে এগিয়ে চলি। মহারাজা গঙ্গা সিং-এর সময়ের দলিল, ব্যবহৃত স্ট্যাম্প ও অন্যান্য সরকারি নিয়ম কানুনের বই। দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে বড় বড় কার্পেট।

এর পর FILM LIBRARY

ছবির অসংখ্য সংগ্রহ। মেঝেতে শোরুমে গঙ্গা সিংজীর সময়কার আইন কানুনের বই। এক জায়গায় দেখছি একটি লাঙ্গল। প্রদর্শনীর নাম —PLOUGH

গঙ্গা সিংজীর সময়ে একটি ক্যানেল খনন করা হয়। আর সে ক্যানেলের জলে চাষীদের প্রভূত উপকার হয়। এই উপলক্ষ্যে জমি চাষের উদ্বোধন করেন মহারাজা গঙ্গা সিং। সেই ঘটনার ছবি যেমন টাঙ্গানো আছে তেমনি সেই লাঙ্গলটাও প্রদর্শিত হচ্ছে।

গঙ্গা সিংজী বিভিন্ন সময়ে যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সেই সব মুহূর্তের ছবি। সারা গ্যালারিতে ছবির ছয়লাপ।

কাপড়ের উপর সোনার জলে অলঙ্করণ এমন কাপড়ের অলঙ্কারকে রাজস্থানীরা বলে মোড় বা সেহারা। মহারাজাদের বিবাহ বাসরে এসব সোনার বুটি দেওয়া মোড় ব্যবহার হত।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সংগ্রহ। প্রোজেকটর মেসিন। রয়াল ফ্যামিলির সদস্যগণ রাজপ্রাসাদে থেকেই সিনেমা দেখতেন। তারই প্রয়োজনীয় মেসিন। তার পরেই দেখছি ঘোড়াব অলঙ্কার ও কোচোয়ানদের ড্রেস। এছাড়া ঘোড়ার প্রয়োজনিয় যাবতীয় চামড়ার দ্রব্যাদি। এই গ্যালারির শেষ মাথায় মহারাণী ভিক্টোরিযা গঙ্গাসিংকে যে ঘোড়ার গাড়ি দিয়েছেন তাও প্রদর্শীত হচ্ছে।

এখান থেকে ডানদিকে চলে গেছে বিভিন্ন গ্যালারি। মহারাজাদের সময়ে বিদেশী মদ পান করা হত, তার ব্যবহৃত বোতল। রেমিংটন টাইপ মেশিন, ইস্ত্রি —যেহেতু তখনকার দিনে কারেন্ট ছিল না, ইস্ত্রিতে গবম জল দিয়ে ইস্ত্রি গরম করা হত তারপর কাপড় ইস্ত্রি করা হত। পুরানো স্টাইলের মাইক। মাইক্রোফোন, ঘড়ি, গ্লোব······ইত্যাদি। এই সবই মহারাজাদের ব্যবহারের জিনিস।

ভারতের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মহারাজাদের ভোজনের চিত্র। মহারাজা গঙ্গা সিং এবং সাদুল সিং-এর সময়ের এ্যালবাম। এছাড়া টাইপ মেশিন, বিদেশ থেকে আনা ওজন এবং উচ্চতা মাপার যন্ত্র। স্কেটিং-এর সরঞ্জাম।

গঙ্গা-সিংজীর বিদেশ ভ্রমণকালীন ফটোর অ্যালবাম। এমনকি তিনি যখন লেফটেন্যান্ট হন সে সময়কার সৈনিকদের ফটো। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় সৈন্যদের প্যারেডের ফটো এবং অ্যালবাম। ইংরেজগণ মহারাজ গঙ্গা সিংকে খুব খাতির করতেন। কেননা তিনি লেফটেন্যান্ট হিসাবে ছিলেন খুব দক্ষ।

গঙ্গা সিংজী চাষী ও জনসাধারণের সঙ্গে গ্রাম পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। বক্তৃতা দিয়েছেন সে সব ছবি। লেপ্টেনান্ট জীবনের ড্রেস। কি নেই! বহু ছবি। গঙ্গা সিংজীর ব্যবহৃত ফোন। এই ফোনের মাধ্যমে তিনি মন্ত্রি এবং আমলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

পুরানো দিনের গ্রামোফোন। গঙ্গা সিংজীর ব্যবহৃত ব্যাগ। তাঁর পাওয়া বিভিন্ন সময়ের

মেডেল। ২৩তম মহারাজা করণ সিং-এর ফৌজি পোষাক। তিনি যে গলফ খেলতেন তার স্টিক ও অন্যান্য সরঞ্জাম। ব্যাডমিনটন খেলার র‍্যাকেট এবং পোষাক।

প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু, প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে করণ সিং-এর ছবি। বিদেশী রেডিও। মহারাজা সাদুল সিং (১৯০২-১৯৫০) সময়কার বিভিন্ন ছবি। সাদুল সিংজী খুব শিকার করতেন। তার শিকারের সাজ সরঞ্জাম এবং মৃত পশুদের নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী। এই গ্যালারির নাম — Hunting Gallery.

সাদুল সিংজী কাঠের তৈরি হাঁস ছেড়ে দিতেন জলাশয়ে। তার আকর্ষণে অন্য পাখিরা কাছে আসত। তিনি সেই পাখি শিকার করতেন। সেই সব কাঠের হাঁস রয়েছে শিকার গ্যালারিতে। এছাড়া সাদুলজীর শিকার করা বাঘ, হরিণ, সিংহ প্রভৃতির মৃতদেহ ঔষধ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

Gallery of Indian Princes

এই গ্যালারিতে সারা ভারতের মহারাজাদের ছবি রয়েছে। পরের গ্যালারিতে মহারাজা করণ সিংহের তোলা চিত্র সংগ্রহ। মহারাজাদের ব্যবহৃত সিংহাসন এবং সবশেষে সামিয়ানা এবং চাঁদোয়া। দুটোই সোনার জরিতে কাজ করা। মহারাজা করণ সিং প্রচুর ছবি তুলেছেন। সত্যি বলতে তাঁর তোলা ছবি ও লেখার মধ্যে বিকানীর স্টেটের অনেক কথাই জানা যায়। তার সঙ্গে কর্ম জীবনের কথাও।

মহারাজা করণ সিং-এর রাজত্বকাল ১৯৩৮ সাল থেকে। তিনি এখনও জীবিত আছেন। ১৯৬২ সালে করণ সিংজী কায়রোতে অনুষ্ঠিত সুটিং-এ বিশ্ব প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। 38th World Shooting Championship. Cairo–1962.

বিকানীর মহারাজাদের সবচেয়ে বড় অবদান বই-এর সংগ্রহ। বিভিন্ন শাখার প্রচুর বই, দেশ বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই। এই বইগুলো রিসার্চের ছাত্রদের প্রযোজন মেটাতে পারে।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

সকাল ৮টায় ধর্মশালার সামনে এসে দাঁড়াই। দেখি একদল বঙ্গবাসী লোক অটো রিকশা ধরতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাদের জিজ্ঞেস করি আপনারা কোথায় যাবেন?

— দুর্গ দেখতে।

— চলুন এক সঙ্গে যাই।

পথে আলাপ পরিচয় হল। উনারা এসেছেন কোলকাতা শহর এবং শহরতলীর বিভিন্ন জায়গা থেকে। উনারা দলে কুড়ি জন। প্রত্যেকে অনুকুল ঠাকুরের শিষ্য। সুতরাং সব ব্যাপারে একমন এক প্রাণ।

যাইহোক আমরা এসে নামলাম পাবলিক পার্কের সামনে।

পাবলিক পার্ক

জুনাগড় দুর্গের পূর্ব দিকে এই পার্ক। পার্কে রাও বিকাজীর মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

পাবলিক পার্কে গড়ে তোলা হয়েছে কীর্তি স্তম্ভ। স্থানীয় লোকেরা বলে বামনপেড়ী। বামন পেড়ীর চার দিকে বাগিচা। বাগিচায় ফুলের চাষ হয়েছে। পাকা রাস্তার দুদিকে হরেক রকম বৃক্ষ। একটি বাগিচায় পরীর মূর্তি এবং হাঁসের পীঠে বালক। খুব সুন্দর মূর্তি। হাঁস যেন বালকটিকে নিয়ে উড়ে যাবার প্রতীক্ষায় রয়েছে। খন্ড মুহূর্তের চিত্র। খুব সুন্দর বাগিচা। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ি চিড়িয়াখানায়।

জন্তু আলয়

চিড়িয়াখানার পোষাকী নাম জন্তু আলয়। চিড়িয়াখানাটি দু'ভাগে গড়া হয়েছে। পার্কের উত্তর দিকে রয়েছে বড় বড় জন্তু। আর এখানেই খোলা হয়েছে টিকিট কাউন্টার। প্রাচীরে ঘেরা কম্পাউন্ডে আলাদা আলাদা খাঁচায় রয়েছে বাঘ, সিংহ, খেঁকশিয়াল, ভালু (ভল্লুক), ভোঁদড়, হায়না, সজারু, বাঁদর- ইত্যাদি।

আর দক্ষিণ দিকে আর একটি কম্পাউন্ডে রয়েছে পাখি এবং হরিণ।

পাখির গ্যালারিতে ময়ূর, রাজহাঁস, পাতি হাঁস, খরগোস, পরিয়া, কচ্ছুয়া (কচ্ছপ) এবং আরো অনেক ছোট ছোট পাখি। বিভিন্ন রংয়ের পায়রা এবং বজরীগর (বিভিন্ন প্রজাতির) সারস, কবুতর, হরেক রকমের পাখি।

হরিণ রাখা হয়েছে খোলা জায়গায়। চারদিকে লোহার তারের বেড়া। বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ। হরিণের গায়ের রং সোনালী, আবার কিছু হরিণের সোণালী রংয়ের মাঝখানে সাদা ছোপ। কোন হরিণের সিং দুটো বেজায় বড়। আবার কোন হরিণের গাছের শাখার মত আঁকা বাঁকা সিং। হরিণের সঙ্গে রয়েছে মার্কহোর। দেখতে রামছাগলের মত। সিং দুটো মহিষের মত এবং সারা গায়ে লোমে ঢাকা। ভেড়ার লোমের মত বড় বড় লোম।

একই টিকিটে দুদিকের জন্তু এবং পাখি দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণ দু-অংশের মাঝখানে কৃত্রিম জলাশয়। জলাশয়ে ফোয়ারার ব্যবস্থা আছে। এখন অবশ্য জলাশয়ে জল নেই। ফোয়ারাগুলিও নষ্ট হবার মুখে। সব মিলিয়ে পাবলিক পার্কটিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে।

পার্ক এবং জন্তু আলয় দেখে আসি জুনাগড় দুর্গের প্রবেশ তোরণের উল্টো দিকে। এখানে রাজপথের ধারে রয়েছে ছোট ছোট তিনটি মন্দির—হনুমান মন্দির, সন্তোষী মাতা মন্দির এবং অঞ্জনী মাতা মন্দির। মন্দির দেখে আসি জুনাগড় দুর্গে।

জুনাগড় দুর্গ

রাজা রায় সিং ছিলেন সম্রাট আকবরের সৈন্য বাহিনীর একজন জেনারেল। ১৫৮৮ থেকে ১৫৯৩সালের মধ্যে তিনি এই সুন্দর দুর্গটি তৈরি করেন। বেলে পাথরে তৈরি চার কোণাকার দুর্গ। দুর্গটিতে ৩৭টি গম্বুজ আছে। আর দুর্গের ৯ মিটার (৩০ ফুট) চওড়া গভীর পরিখা দেখে অবাক হতে হয়।

দুর্গপ্রাসাদে অনেকগুলো মহল আছে। অনুপমহল এবং করণ মহলটি তৈরি করেন

মহারাজা অনুপ সিং। মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে গড়া এই মহল দুটির সিলিং-এ সতের এবং আঠার শতাব্দীর পেইন্টিং উল্লেখযোগ্য। মহারাজা গজ সিং বিজয়মহল, ডুঙ্গরনিবাস, গঙ্গানিবাস এবং রঙমহল তৈরি করেন। চন্দ্রমহল এবং ফুলমহলের কাচের কাজ প্রসংসার দাবী রাখে।

দুর্গদর্শন ঃ

জুনাগড় দুর্গের প্রবেশ তোরণ করণ পোলে পুলিশ পাহারা রয়েছে। এখানে দেখা হল কুলদীপক সিং এর সঙ্গে। উনি একজন প্রফেশনাল গাইড। আমি জানি দুর্গের মধ্যে দুর্গের নিজস্ব গাইড আছে। ১৯৭৫ সালে ও দুর্গ দেখেছিলাম। দুর্গের গাইডগণ এক সঙ্গে অনেক দর্শককে গাইড করেন ফলে সুষ্ঠুভাবে সব জানা যায়না। আমি ধীরে সুস্থে দেখতে চাই। এজন্য কুলদীপক সিংকে সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

কুলদীপক দ্বিতীয় তোরণ দৌলত পোলে এসে বলতে শুরু করেন—

'রাজস্থানের অন্যান্য নগরের মত এখানেও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এখানে দেখছেন তোরণ গাত্রে হাতের চিহ্ন খোদাই করা আছে। এসব মহামূল্যবান চিহ্নগুলি সতীদের হস্তচিহ্ন। এখানে মোট ৪৭টি হস্ত চিহ্ন আছে। এখান থেকে ১ কিমি দূরে শশ্মান ভূমিতে জহরব্রত পালন হত।'

মহাসতীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে এগোতে থাকি। দৌলত পোলটিও দেখছি যথেষ্ট মজবুত। লোহা এবং কাঠের তৈরি মজবুত তোরণ। দরজার গায়ে লোহার গজাল মারা।

এগিয়ে চলি।

তৃতীয় পোল ফতে পোল। তারপর রতন পোল। এদুটিও মজবুত তোরণ। রতন পোল দিয়ে পিছনের অফিস কাছারিতে যাওয়া যায়। ওদিকে আমরা যাব না। আমরা এসে দাঁড়ালাম পঞ্চম তোরণ সুরয পোলে।

সুরয পোলের দুদিকে দুটি প্রমাণ সাইজের হাতি। দুর্গের দুর্ভেদ্যতা রক্ষার জন্য এতগুলো দরজা করা হয়েছিল। সুরযপোলের বাম দিকে গণেশ মন্দির। ডানদিকে করণীমাতা মন্দির। করণীমাতা বিকানীর মহারাজাদের গৃহদেবী।

সুরয পোলের পর ফাঁকা ময়দান। বামদিকে রাজপ্রাসাদ। সুরয পোলের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্গের পশ্চিম এবং উত্তর প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। কুলদীপক সিং দুর্গের সীমানার প্রাচীর এবং গম্বুজের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন।

—ঐ দেখুন পশ্চিম দিকে ঐ যে প্রাচীর আর গম্বুজ। ঐ সব গম্বুজে এক সময় সৈন্যরা পাহারা দিত। আর দেখুন ঐ উত্তর দিকের প্রাচীর।

না আমরা ওদিকে যাব না। বাম দিকে প্রাসাদের নিচে আর একটি খোলা প্রবেশ পথ। এখানেও দেখছি পুলিশ পোস্টিং। প্রবেশ পথের ডানদিকে অফিস ঘর। এখান থেকে টিকিট কাটলাম। দুর্গের প্রবেশ মূল্য ১০ টাকা।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি বহুতল প্রাসাদ। এখানে অফিস ঘরে ব্যাগ জমা রাখতে হয়। ক্যামেরার জন্য আলাদা চার্জ। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দুর্গে প্রবেশ করি। প্রথমে মন্দির মহল চত্বরে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি কারুকার্যময় বহুতল। নিচে বামদিকে হরমন্দির। এখানে রাজকীয় বিয়ে এবং জাতক সংস্কার হত। চারদিকের প্রাসাদ গাত্রে ইন্দো-মুঘল স্টাইলে তৈরি বিভিন্ন নক্সা। বিশেষ করে ডান দিকের বিক্রম বিলাস-এর নক্সাগুলো এবং গঠন শৈলি নজর কাড়ে।

মন্দির মহল চত্বর ছাড়িয়ে মিনা ডোড়ী দিয়ে ঢুকলাম করণ সিং চত্বরে। সব জায়গাতেই পাহারাদার আছে। থাকবেই তো। প্রাসাদের চাকচিক্যতা এখনও প্রথম দিনের মত উজ্জ্বল। আর এরই আকর্ষণে ট্যুরিস্টদের আগমন। সুতরাং প্রয়োজনেই এত রাজকীয় আয়োজন।

করণসিং মহলকে দেওয়ান-ই-খাস বলে। এখানে রাজাদের আমলে সভা বসত। এখানে শোভা পাচ্ছে রাজ সিংহাসন। সামনে হোলি খেলার জায়গা। এক সময় এখানে হোলি খেলা হত।

বামদিকের চাঁদনী গেট দিয়ে আর একটি চত্বরে আসি। এখানে গান বাজনা হত। সামনে রাজ্যাভিষেক মহল। এখানে রাজাদের অভিষেক হত। রাজ্যাভিষেক মহলের দেওয়ালের রং ঝলমল করছে। এখান থেকে আসি অনুপ মহলে। এই মহলটি ১৭ শতকে তৈরি। এই মহলের কারুকার্যগুলো সোনায় পালিশ করা। দরজাগুলো আখরোট কাঠের তৈরি। মেঝেতে দামী কার্পেট। শ্বেত পাথরের থামে নক্সা করা। বিভিন্ন ডিজাইন। এই মহলে অনুপ সিং-এর ব্যবহৃত রাজসিংহাসন শোভা পাচ্ছে। সিংহাসনে সোনার পাত লাগানো।

আর আছে বাদল মহল। এই মহলের দেওয়ালে নীল আর সাদা মেঘের সমারোহ। এই গ্যালারিকে ত্রিমাত্রিক গ্যালারিও বলে। এখানে একটি ট্যাঙ্কে জল রাখা হত। সেই জলে চাপ দিলে ট্যাঙ্কের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে পিচকারির আকারে জল ছড়িয়ে পড়ত। সেই জল আবার হাতটানা পাখার বাতাসে ঘুরে বেড়াত এবং ঘরের তাপমাত্রা কমে যেত। এইভাবে কৃত্রিম সৃষ্ট ঠান্ডার জন্য বাদল মহলকে ঠান্ডি ঘরও বলা হয়। স্বাভাবিক কারণে বাদল মহলের সিলিং-এ মেঘের চিত্র আঁকা।

এখান থেকে আসি ফুল মহলে। ফুলমহলে কাচের কাজের কারসাজি। কাচে আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে ঝিকমিক করে উঠে।

দ্বিতলে উঠার সিঁড়ি খুব সরু। কারণ রাজপ্রাসাদে শত্রু ঢুকে পড়লে উপরের মহল গুলোতে যাতে না উঠতে পারে তার ব্যবস্থা। উপরের দিকে উঠতে গেলে এক জন করে উঠতে হবে। আর সেই মুহূর্তে শত্রুকে হত্যা করা যাবে।

এসে দাঁড়াই গজমহল চত্বরে। গজমহলটি তৈরি হয় ১৯১২ সালে। এখান থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রশস্ত জায়গা। ঘাস এবং গুল্ম জন্মেছে প্রাসাদের বাইরের এই লনে। এই লনে এক সময় নাচ গান এবং জলসা হত।

এমন কি মহারাণীর দাসিগণও এই নাচ গানে অংশ গ্রহণ করত। বিকানীরের ১৪তম মহারাজ গজ সিং এই মহলটি তৈরি করেন। মহারাজ শক্তি পূজা করতেন। সোনার দোলনায় দেখছি শ্রীকৃষ্ণের ফটো। এখানে সিলিং এবং দেওয়ালে সোনার কাজ। মেঝেতে দামী কার্পেট।

মহারাণীর মহলটি যেহেতু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক কারণে এই মহলে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে। দেখা যাচ্ছে ইউরোপিয়ান ধাঁচের একটি নারী মূর্তি। মহারাণীর ঘরের খাটটি খুব নিচু।

তৃতীয় তলের প্রিন্টিং-এর কাজ এখনও উজ্জ্বল। হাতির দাঁতের কাজ এসব মহলকে আরো মহার্ঘ করেছে। তৃতীয় চতুর্থ তল ছাড়িয়ে এলাম পঞ্চম তলাতে। এখানে আছে হাওয়া মহল। ১৮৭২ সালে এই মহলটি তৈরি হয়। মহলের ছাদ থেকে ঝাড়বাতি ঝুলছে। আর আয়না এমনভাবে ফিট করা আছে যে, মহলের বিছানায় শুয়ে মহারাজ আশেপাশের সব কিছু দেখতে পেতেন। কেননা আয়নায় প্রতিবিম্বিত হত আগন্তুকের ছবি। আর প্রাকৃতিক হাওয়া খেলে এই মহলে।

হাওয়া মহলের সামনে দুটো গম্বুজ। পাহারারত সিপাহিগণ বহুদূর থেকে আগত শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারতেন। কেননা খোলা প্রশস্ত পথ দিয়ে কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে কিংবা বহুলোক এক সঙ্গে হাঁটার সময় যে ধুলি উড়ত তা থেকে শত্রুর গতিবিধি অনায়াসে বোঝা যেত।

এখান থেকে নেমে এলাম ডুঙ্গর মহলে। এই মহলটি ১৯৮৮ সালে তৈরি হয়। মহলের চারদিকে বেলজিয়াম আয়না লাগানো হয়েছে। এই মহল থেকেও নিচের হোলি খেলা দেখা যেত। পাশেই লালনিবাস বা লালমহল। ডুঙ্গর সিং-এর পিতা লাল সিং এই মহলটি তৈরি করেন। কারুকার্য করা। এই মহলের দরজা জানালা এমনকি ঘরের আসবাবও লাল রং করা।

এখান থেকে আসি গঙ্গানিবাস চত্বরে। এই মহলকে দরবার মহলও বলে, যার নাম সূর্যনিবাস। আসলে রাজাদের আমলে ছিল দেওয়ান-ই-খাস। চারদিকে চোখ ধাঁধানো রঙিন ফ্রেসকো। ছাতে রঙিন আলপনা। এমনকি থামগুলোর গায়ে রঙ্গিন লতাপাতা অলঙ্কৃত। পায়ের নিচে কারুকার্য করা কার্পেট।

এখানেই আছে অস্ত্রাগার। প্রদর্শিত হচ্ছে বহু অস্ত্র। বিশাল আর ভারী ঢাল, ছোটবড় নানা সাইজের তরোয়াল, বল্লম, কুড়াল, বন্দুক, পুরানো মডেলের প্রচুর বন্দুক এমনকি দোমড়ানো মোচড়ানো একটি তরবারি। উপরের সিলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি। প্রচুর অস্ত্র। আছে সৈনিকদের লোহার জালের বর্ম। একটি লোহার জালের বর্মের ওজন ৫৬ কেজি। আরো অনেক অস্ত্র যেমন কৃপান, ছুরি, সড়কি....ইত্যাদি।

বিরাট হল ঘর। এখানে আছে রাজসিংহাসন। ৮০০ বছরের পুরানো সিংহাসনটি

কনৌজ থেকে নিয়ে আসা হয় যোধপুরে। তারপর সেখান থেকে বিকানীরে। মহারাজদের বিশাল বিশাল ছবি। প্রচুর ছবি। তার মধ্যে গঙ্গা সিং-এর বিখ্যাত গোঁফ। রাজকীয় গোঁফ বলে কথা। গঙ্গা সিং-এর অফিস ঘরের সামনে এসব বড় বড় রাজাদের ছবি যেমন আছে তেমনি বিভিন্ন ঘটনার ছবিও আছে। তার মধ্যে গঙ্গা সিং-এর জুবিলি প্রশেসনের ছবি এবং তিনি যে সব জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন সেসব ছবিও আছে। গঙ্গা সিং ১৯৩০-৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন সেই ছবি সবাই আগ্রহ সহকারে দেখছে।

এখান থেকে আসি দেওয়ান-ই-আম হলে। বিরাট হল ঘর। এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে একটি প্লেন। প্লেনটি এই হলের মধ্যমণি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজগণ গঙ্গাসিংকে প্লেনটি উপহার দেন। এই প্লেনকে ঘিরে দেওয়াল ঘেঁষা অনেক গ্যালারি। এর মধ্যে একটিতে রয়েছে পালকি। পালকির হাতল সোনার তৈরি। অন্য একটিতে ঘোড়ার গাড়ি। রাজপুত বীর ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। অন্য একটি গ্যালারিতে দেবীমূর্তি। এখানেও সতীদের হস্তচিহ্ন প্রদর্শিত হচ্ছে।

জুনাগড় দুর্গ দর্শন শেষ।

ফিরে আসি মেহতা ধরমশালায়। খাওয়া এবং বিশ্রাম। বিকেল বেলা আবার বেরিয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য করণীমাতা মন্দির দর্শন। গোগা গেইট থেকে করণী মাতার বাস ছাড়ে। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বাস। এছাড়া শেয়ার ট্যাক্সিও যাতায়াত করে। বিকেল চারটায় এসে পৌঁছাই করণীমাতা মন্দিরের গেটে।

করণীমাতা মন্দির

করণীমাতা, মা দুর্গার একটি রূপ। ইনি বিকানীর মহারাজাদের কুলদেবী। করণীমাতা মন্দির ৬-শ বছরের প্রাচীন মন্দির। মন্দিরে পুরানো কাঠের দরজার সামনে একটি নতুন তোরণ গড়ে তোলা হয়েছে। তোরণের দুদিকে শ্বেত পাথরের দুটি সিংহ। শ্বেত পাথরে তৈরি তোরণে ফুল লতাপাতা আঁকা। দু'পাশে সরস্বতী মূর্তি। বীণা হস্তে সরস্বতী। তাঁর পায়ের তলায় আরো চারটি মূর্তি। প্রবেশ পথের দুদিকে তিনটি করে ৬টি হস্তী। হস্তীগুলো কাল পাথরে তৈরি। দুদিকে রূপোর জানালা। তোরণের উপরের সারিতে হস্তী। তার নিচে সিংহ এবং সরস্বতী মূর্তি। সুন্দর তোরণ। দরজা রূপোর পাতে মোড়া। আর পুরানো কাঠের দরজা লোহার পাতে মোড়া।

বাইরের তোরণ পেরিয়ে আসি মন্দির চত্বরে। চারদিক প্রাচীরে ঘেরা। মাঝখানে করণীমাতা মন্দির। বিকানীর স্রষ্টা মহারাজা বিকাজী মন্দিরটি তৈরি করেন। মন্দিরের গম্বুজটি সোনার।

করণীমাতা মন্দিরের দরজা রূপার তৈরি। গুহা মন্দিরে করণীমাতার সোনার সিংহাসন। সিংহাসনে করণীমাতার শ্বেত পাথরের মূর্তি। সিংহাসনের বামদিকে ত্রিশূল। সিংহাসনের সামনে তৈজস বাতি এবং প্রাসাদের থালা সাজানো আছে। তারই মধ্যে অসংখ্য ইন্দুর ঘুরে

বেড়াচ্ছে। ইন্দুরগুলো পূজার প্রসাদ দুধ মিষ্টি নারকেল সবই খাচ্ছে। তাছাড়া গম ছড়ানো আছে সারা মন্দিরে। —ইন্দুর খাবে ব'লে।

ইন্দুর প্রসাদের থালায় বসে প্রসাদ খাচ্ছে। সেই প্রসাদ খাচ্ছে ভক্তগণ। মন্দিরের পূজারী বললেন—এই ইন্দুরকে বলা হয় কাবা। করণীমাতার ভক্তগণ কাবাকে দেবজ্ঞানে ভক্তি করে। কাবার খাওয়া প্রসাদ খেলে কারুর কোন ক্ষতি হয় না। পূজারি নিজের কথার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ইন্দুরের খাওয়া প্রসাদ নিজে খেয়ে আমাকে বল্লেন আপনি খান কোন ক্ষতি হবে না।'

মাকে প্রণাম জানিয়ে দশটাকা প্রণামী দিলাম। পূজারি খুশি হলেন। তারপর ইন্দুর সহ করণীমাতার ছবি তুললাম। এবার মন্দিরের বাইরে আসি এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করি। সর্বত্র ইন্দুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও ইন্দুর মরে আছে। আশ্চর্য, এর পরেও কারও কোন অসুখ হচ্ছে না!

করণীমাতা মন্দিরের বাম দিকে করণীমাতার সাত বোনের মন্দির। এই মন্দিরে পাহারাদারের মূর্তি আছে। মন্দির দেখে আসি করণীমন্দিরের সামনে। মন্দিরের সেবাইতকে জিজ্ঞেস করি—এখানে বড় উৎসব কখন হয়? 'দুর্গাপূজার পর এখানে জাকজমক সহকারে দশেরা উৎসব হয়। তখন নবরাত্রির দিন থেকে মেলা বসে।'

মন্দির দর্শন শেষ। ফিরে আসি বিকানীরে। জুনাগড় দুর্গ থেকে অটো রিক্সা নিয়ে চলতে থাকি। আমি যাব ক্যামেল ব্রিডিং সেন্টারে।

ক্যামেল ব্রিডিং ফার্ম

এটি এশিয়ার অদ্বিতীয় ক্যামেল ব্রিডিং ফার্ম। এখানে উটের লালন পালন এবং চিকিৎসা ও গবেষণার পরীক্ষা করা হয়। বিকানীর শহর থেকে ১০ কিমি দূরে মরু প্রান্তরে গড়ে উঠেছে এই ফার্ম।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এসে পৌঁছাই ফার্মে। বাইরে থেকে দেখি সারি সারি উট বাধা আছে ফার্মের মধ্যে। ফার্মের গেটে এসে জানলাম রবিবার এবং জাতীয় ছুটির দিন ক্যামেল ব্রিডিং ফার্ম বন্ধ থাকে। আজ রবিবার সুতরাং ফার্মের কাজকর্ম দেখা হল না।

ফিরে আসি মেহতা ধরমশালায়। আজকের মত ভ্রমণ শেষ। দুবার আসার পরেও বিকানীরের সব দেখা হল না। যেমন শহর থেকে ১ কিমি দূরে রয়েছে বিকানীর মহারাজাদের শ্মশান ক্ষেত্র। সেখানে আছে দেবী কুন্ড। আর দেখা হল না ভান্ড সাগর, জৈন মন্দির এবং সোমনাথ মন্দির।

আজ রাতেই আমি চলে যাব আলোয়ার। বিকানীর জেলাটি রাজস্থানের উত্তরে অবস্থিত। আমি এখন রাজস্থানের উত্তর থেকে পূর্ব দিকে যাব। গোছগাছ করে তৈরি হই এবং সন্ধ্যা ৬টায় রুম ছেড়ে দিই।

বিকানীর ইন্টার-স্টেট বাস স্ট্যান্ডটি রেলস্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে অবস্থিত। বাস

স্ট্যান্ডে এসে জানতে পারি প্রতিদিন দুটি বাস বিকানীর থেকে আলোয়ার যায়। একটি ছাড়ে সকাল ৭.১৫ মি. অন্যটি ছাড়ে সন্ধ্যা ৭.১৫ মি.। আমি যাব সান্ধ্য বাসে।

যথা সময়ে বাস ছাড়ল। বাস ডুঙ্গর রতনগড়—চুরু-ঝুনঝুনু হয়ে পরদিন সকাল ছটায় আলোয়ার পৌঁছাল। এ পথের দৃশ্যও আকর্ষণীয়। বাস ছাড়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত সোয়া এগারটায় বাস এসে থামল চুরুতে। যাত্রী উঠা নামার জন্য ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখনই লক্ষ্য করি আলোয় উদ্ভাসিত চুরু শহরকে। জেলা সদর চুরু এক সময় শেখাবতী রাজ্যের রাজধানী ছিল। স্বাভাবিক কারণে চুরুর দুর্গ এবং এখানকার হাভেলীগুলো যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

চুরুর পর জেগেই ছিলাম। রাতের অন্ধকারে চরাচর দেখা না গেলেও বাসের আলোয় যতটুকু দেখলাম বুঝতে পারি পথের পরিবর্তন হচ্ছে। মরুপ্রান্তরের মত একেবারে সমভূমির পথ নয় চড়াই উৎরাই পথ। সামান্য উঁচু-নিচু পাহাড়িয়া পথ। আবহাওয়াও অনেকটা ঠান্ডা। হয়তো কোথাও বৃষ্টি হয়েছে কিংবা বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাষ।

চুরু জেলার আয়তন ১৬৮৩০ বর্গকিমি। লোক সংখ্যা ১৫,৪৩,২১১ জন। গ্রামের সংখ্যা ৯৬৫। ৭টি তহশীলের মধ্যে ডুঙ্গরগড় এবং রতনগড়ও রয়েছে। আসার পথে এ দুই তহশীলের উপর দিয়ে এসেছিলাম। বাকি তহশীলগুলি হল সরদারশ্বর, তারানগড়, রাজগড়, চুরু এবং সুজনগড়।

রাত ১২.৪০ মিঃ-এ ঝুন ঝুন এসে পৌঁছাই। ঝুন ঝুন এক সময় দেশীয় রাজ্য ছিল। এটিও শেখাবতী রাজ্যের অধীনস্থ শহর। যেহেতু শেখাবতী রাজাদের নতুন রাজধানী ছিল ঝুন ঝুন, এর গরিমা এখনও অম্লান।

বর্তমানে ঝুনঝুন রাজস্থানের একটি জেলা। আয়তন ৫৯২৮ বর্গকিমি। লোকসংখ্যা ১৫,৮২,৪২১ জন। গ্রামের সংখ্যা ৮২৭ এবং ৫টি তহশীল এর অর্ন্তভুক্ত যেমন ঝুনঝুন, চিরাব, ক্ষেত্রী, নলগড় এবং উদয়পুরবতী।

শহর এবং তার আশপাশটি যেন সৌন্দর্যের আকর। হাভেলী ছাড়া বাদলগড়, জোরাবগড়, মেড়তানি বাওড়ি, কামরুদ্দিন শাহকি দরগা, অজিত সাগর এবং জৈন মন্দির দেখার বিষয়। শুধু কি ঝুনঝুন শহরের সৌন্দর্য! এর বাইরেও অনেকগুলো চিত্তাকর্ষীক জায়গা রয়েছে যেমন বাগ্গর, চিরাব, পিলানী, সুরযগড়, কাজরা, আলশিশর, মালশিশর, মান্ডব, মুকুন্দগড়, নলগড়, লোহাগড় এবং ক্ষেত্রী।

এসব জায়গার দুর্গ, হাভেলী এবং মন্দির দেখার বিষয়। বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি এ্যান্ড সায়েন্স পিলানী গ্রামে গড়ে উঠেছে। আবার এখানেই বিড়লাদের বাড়ি। না আমার এসব দেখা হবে না। আমি এগিয়ে চলেছি। আমি যাব আলোয়ার। ঝুনঝুন আমার কাছে স্বপ্নপুরী হয়েই রইল। এই সব ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

নয়

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গল। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে আলোয়ার এসে পৌঁছালাম। সকাল ৬টায় আলোয়ার ইন্টার স্টেট বাস স্ট্যান্ডে বাস এসে থামল।

আলোয়ার ঃ

আলোয়ার জেলার আয়তন ৮৩০০ বর্গকিমি।

জনসংখ্যা ২২,৯৬,৫৮০ জন। গ্রামের সংখ্যা ১৯৯১ টি এবং ১০টি তহশীল এই জেলার অন্তর্গত। শিক্ষিতের হার শতকরা ৪৩.৯ জন।

.প্রধান খাদ্যশস্য গেঁও, পালসেস এবং তৈলবীজ। খনিজ পদার্থে ভরা আলোয়ারের ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে তাঁত, পাগড়ি রং করা, মার্বেল পাথর এবং মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য বিখ্যাত।

আলোয়ার রাজস্থানের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। রাজপুতানার একটি দেশীয় রাজ্য। বর্তমানে রাজস্থানের একটি জেলা। বরসিং এর বংশধর প্রতাপ সিং এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন কাছাওয়া রাজপুত। এক সময় এ রাজ্যের নাম ছিল মেওয়াট। রাজপুতরাই ছিল এর শাসক। দিল্লী সাম্রাজ্যের খুব কাছের রাজ্য মেওয়াট। মেওয়াটের অধিবাসীগণ বিদেশী হস্তক্ষেপ পছন্দ করতনা ব'লে নিজেরাই সৈন্যদল গঠন করে বহুকাল বিদেশীদের ঠেকিয়ে রাখে। এমনকি মেওয়াটের সৈন্যদল দিল্লী আক্রমণ করে কিন্তু শক্তিশালি সুলতান বলবনের কাছে পরাস্ত হয়। সেই থেকে আলোয়ার মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ সিং মুঘলদের কাছ থেকে এই রাজ্যটি পুনরুদ্ধার করেন। প্রতাপ সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র বখতয়ার সিং রাজা হন। বখতয়ার সিং ১৮০৩ খৃস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই দত্তকপুত্র বান্নি সিং 'বান্নিবিলাস' বা বিনয় বিলাস তৈরি করেন।

আলোয়ারের মহারাজা ১৫ তোপের সম্মানের অধিকারি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে এই রাজ্য স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

আলোয়ারের কাছাকাছি বিমান ক্ষেত্র জয়পুর। ট্রেন পথে আলোয়ার রেল স্টেশান দিল্লী, আমেদাবাদ, আজমীর, জয়পুর এবং ভরতপুরের সঙ্গে যুক্ত। সড়কপথে ৮নং হাইওয়ে জয়পুর ও দিল্লীকে যুক্ত করেছে। আর দিল্লী জয়পুরের মাঝখানে আলোয়ারের অবস্থান। সুতরাং দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর ও রাজস্থানের অন্যান্য শহরের সঙ্গে নিয়মিত বাস যোগযোগ আছে।

থাকার ব্যবস্থা ঃ

হোটেল আকল, হোটেল অশোকা, হোটেল অলঙ্কার, ডাকবাংলো, পি-ডবল্যু-ডি, রেস্ট হাউস। এছাড়া ধরমশালা—বাস স্ট্যান্ডের কাছে খাণ্ডেলওয়াল, স্টেশান রোডে, সুগনা-বাঈ-কি ধরমশালা এবং হোপ সার্কাসের কাছে আগরওয়াল ধরমশালা।

দেখার বিষয় ঃ

শহর ও শহরের কাছাকাছি—দুর্গ, সিটি প্যালেস (বিনয় বিলাস), যাদুঘর, মোতি ডুংরি প্রাসাদ, পম্পীবাগ ও পূজন বিহার, সিলিসেড লেক, জয়সামান্দ লেক, বিজয় মন্দির প্যালেস এবং দীপ।

শহর থেকে দূরে— সরিসকা অভয়ারণ্য, ভতৃহরি, পান্ডুপোল, নীলকণ্ঠ মন্দির, তালব্রকস ও ভৈরথ, গড়রাজোর এবং মঙ্গলসাগর বাঁধ।

আলোয়ারের সাধারণ যানবাহন রিক্‌শা, অটোরিক্‌শা এবং টেম্পো।

পথের কথায় আসি।

আলোয়ার ইন্টার-স্টেট বাস স্ট্যান্ড থেকে রিক্‌শা করে আসি খাণ্ডেলওয়াল ধরমশালায়। ঘর পেয়ে গেলাম। রুম নং ৩৬। সকাল ৯টায় তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি পথে। রিকশা এবং হেঁটে এসে পৌঁছাই শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত রাজপ্রাসাদে।

শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের পাদদেশে একটি সুন্দর পুস্করিণী আছে। চারদিকে শান বাঁধানো। এই পুস্করিণীকে বলে সাগর। সাগরের পিছনে অর্থাৎ উত্তরদিকে পাহাড়। দক্ষিণ দিকে আলোয়ার রাজাদের শ্মশানভূমি। শ্মশানভূমিতে রয়েছে একটি ছত্রী। এটি রাজা বখতওয়ার সিং এর স্মৃতি সৌধ। ছত্রীটি লাল বেলেপাথর এবং শ্বেত পাথরে তৈরি।

শ্মশান ভূমির উত্তরে শিব মন্দির। মন্দিরটি মহারাজাদের আমলে তৈরি। এখনও মন্দিরে নিত্য-পূজা হয়। মন্দিরের সেবাইত বললেন ভক্তদের দানে তার সংসার চলছে।

এসব দেখে আসি রাজপ্রাসাদে।

সিটি প্যালেস বা বিনয় বিলাস ঃ

এই বিশাল প্রাসাদটি তৈরি করেন বিন্নি সিং। প্রাসাদের বিভিন্ন মহলে এখন অফিস খোলা হয়েছে। প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে বসেছে কোর্ট। আর মূল প্রাসাদের বৃহৎ অংশে খোলা হয়েছে যাদুঘর। যাদুঘরটি পর্যটকদের দেখার বিষয়। সকাল দশটায় যাদুঘরের গেটে আসি। যাদুঘরের দর্শনী তিন টাকা। সোমবার ফ্রি।

যাদুঘর ঃ

পুরাতত্ত্ব বিভাগ, চিত্রকলা এবং অস্ত্রবিভাগ। এই তিন বিভাগের প্রচুর সংগ্রহ নিয়ে যাদুঘর।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ। এখানে আছে বাদ্যযন্ত্র যেমন দিলরুবা, সেতার, ঢোল, বীণা.....ইত্যাদি। কাচের পাত্র, হরেক রকম পাত্র। সবই মীনা করা অর্থাৎ পাত্রের গায়ে নক্‌সা আঁকা।

পিতলের তৈরি পাখি। পশু এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম। ইন্দ্রবিলাসের মডেল, ঘোড়া এবং গরুর গাড়ির মডেল, এটি চিতোর থেকে আনা। কাশ্মীরের বোটের মডেল।

জন্তু-জানোয়ারের দেহ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব জন্তুর মধ্যে আছে বুচ—এটি আলোয়ার থেকে সংগৃহীত। দেখতে অনেকটা ভোঁদড়ের মত। এছাড়া হরিণ এবং আরো কিছু জন্তু।

হাতির দাঁতের খড়ম ও হাতির দাঁতের তৈরি গরুর গাড়ি। এছাড়া কসমেটিক বাক্স, কলমদানি, আরো কত কি। মারাঠি দরবার এবং রাজস্থানের দৈনিক জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে পুতুলের মাধ্যমে। মার্বেল পাথরের শিল্পকর্ম। এই সব শিল্পকর্মের দ্রব্য জয়পুর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশের গ্যালারিতে রয়েছে মূর্তি। ১১ শতকের গণেশ, ১১-১২ শতকের বিষ্ণু, ১০ম শতকের শিব-পার্বতী সবার নজর কাড়ে।

সৌখিন এবং সাজিয়ে রাখার জিনিস যেমন আছে তেমনি ব্যবহারের জিনিসও আছে। এসব জিনিসগুলো কাঠের তৈরি, তার উপর হাতির দাঁতের কাজ করা। দামি জিনিস যেমন আছে তেমন সাধারণ জিনিসও যেমন কলমদানি, বইয়ের কভার, লেটার বক্স, কারুকার্য করা বাক্স, চৌবে বন্ধন ইত্যাদি। আর আছে আবলুস কাঠের তৈরি অনেক আসবাব।

পোষাক পরিচ্ছদ—মাথার পাগড়ী, ছড়ি, কোমরের বেল্ট, নারী-পুরুষ উভয়ের পোষাক। হলের চারদিকে এসব সাজানো রয়েছে। হলের মাঝখানে রয়েছে বড় বড় জন্তু, এবং ছোট বড় পাখির সংগ্রহ। বড় জন্তুর মধ্যে আছে একটি বাঘ। এটি সরিসকা ফরেস্ট থেকে আনা। এছাড়া স্কটিশ এবং ছোটবড় অনেক পাখি।

এ ছাড়া আছে কিছু মডেল যেমন হোপ সার্কাস, কোটার জয়বিলাস এবং আলোয়ার রাজপ্রাসাদ।

চিত্রকলা বিভাগ

এখানে যেমন মুঘল ঐতিহ্যের চিত্র আছে তেমনি রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা চিত্রিত আছে।

বীরবল, মির্জা আব্দুল রহিম খান, জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, বাবর, হুমায়ূন, আকবর, সাজাহান, মমতাজ বেগম, লায়লা মজনু কে নেই! এইসব কুশীলবগণ যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছেন যাদুঘরের আঙ্গিনায়।

মহাভারতীয় যুগের কাহিনী যেন অভিনীত হয়ে চলেছে চিত্রের মধ্যে। রাগ-রাগিনী চিত্র কি নেই! আর আছে পাণ্ডুলিপি। প্রায় ৭ হাজার পুঁথির সংগ্রহ। হিন্দি, সংস্কৃত এবং ফার্সী ভাষায় লেখা এইসব পুঁথি। ৪০ ফুট দীর্ঘ ভাগবতের একটি সুচিত্রিত গোটানো পুঁথি। লাল অক্ষরে লেখা আরবি ভাষায় কোরাণ। ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এই পুঁথি। এছাড়া মিনিয়েচার পেইন্টিং-এ চিত্রিত শেখ সাদীর পুঁথি। রাজা বিন্নি সিং-এর সহায়তায় ১৫ বছরে লেখা শেষ হয়েছিল। আর আছে রাজস্থান ঘরানার প্রচুর চিত্র।

অস্ত্র বিভাগ

অস্ত্র বিভাগে আছে বন্দুক, তীর-ধনুক, সড়কি, ঢাল, তলোয়ার। যুদ্ধের অস্ত্র। যোদ্ধাদের ড্রেস, বর্ম এছাড়া আরও অনেক কিছুর সংগ্রহ। ঐতিহাসিক তরবারির হাতল রূপো এবং সোনায় মোড়া। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান, দারাসিকো, নাদির শাহ্‌ এবং ঔরঙ্গজেবের তরবারিগুলো পরপর সাজানো আছে।

যাদুঘর দেখে আসি পাম্পিবাগে।

পম্পিবাগ ঃ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই সুদৃশ্য বাগিচাটি গড়ে তোলা হয়। শহরের বুকে সুন্দর বাগিচা। বাগিচার মাঝখানে একটি জলাশয় আছে। এই জলাশয়ে এক সময় জল ছিল। এখন আর নেই। খালি ট্যাঙ্কের চারদিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নামলে ট্যাঙ্কের মাঝখানে পাওয়া যাবে একটি মন্ডপ। মন্ডপে ফুল এবং বাহারি গাছ লাগানো রয়েছে, সুন্দর মন্ডপ। এই মন্ডপকে বলে সিমলা। আর পম্পী-বাগের পোষাকী নাম পূর্জন বিহার। মহারাজ মঙ্গল সিং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সিমলা সংযোজন করেন।

পম্পিবাগের কাছেই রয়েছে মোতি ডুংরি।

মোতি ডুংরি ঃ

মোতি ডুংরিতে একসময় আলোয়ার রাজাদের প্রাসাদ ছিল। ছোট একটি পাহাড়। পথ ঘুরে ঘুরে উঠেছে পাহাড় চূড়ায়। পাহাড় চূড়ায় উঠে দেখি শুনশান। প্রাসাদ নেই। শ্মশান ভূমির মত পড়ে আছে মোতি ডুংরি। তবে সৈয়দ বাবা এবং তার গুরুর সমাধি দুটিতে ভক্তগণ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। মোতি ডুংরিতে সমাধি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অজানাই থেকে গেল।

মোতি ডুংরি দেখে আসি বিজয় মন্দির প্যালেসে। বাঘা সিং চৌরায়া থেকে টেম্পো যাচ্ছে। শহর থেকে দূরত্ব ১০ কিমি। টেম্পো ভাড়া তিন টাকা। দুপুর বেলা এসে পৌঁছাই বিজয় মন্দির প্যালেসের গেটে। গেট থেকে প্যালেস পর্যন্ত পাকা রাস্তা। পথের দুদিকে গাছগাছালি এবং জঙ্গল। ময়ূর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিজয় মন্দির প্যালেস ঃ

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজা জয়সিং এই প্রাসাদটি তৈরি করেন। তাঁরই বংশধর তেজসিং এখন ও জীবিত আছেন। তেজসিং এখন দিল্লীতে থাকেন। তাঁর পুত্রবধূ মহেন্দ্রকুমারি আলোয়ারে থাকেন। মহারাজ তেজসিং-এর দৌহিত্র জিতেন্দ্রপ্রসাদ সিং আলোয়ারে বাস করেন।

বর্তমানে প্রাসাদটি দেখাশুনার অভাবে নষ্ট হতে বসেছে। প্রাসাদের বাইরে মহারাজাদের গৃহদেবতার মন্দির আছে।

প্রাসাদের সামনে এসে দেখি প্রাসাদে প্রবেশ পথের গেটে তালা ঝুলছে। গেটের সামনে তিনজন পুরুষ এবং একটি ছেলে বসে আছে। এদের মধ্যে একজন এই প্রাসাদের কেয়ারটেকার। কেয়ারটেকার বললেন প্রাসাদ দেখতে হলে মহারাজাদের অনুমতির দরকার। — অনেক অনুরোধের পর কেয়ারটেকার রাজি হলেন মহারাজাদের মন্দিরটি দেখানোর জন্য। আর বাইরে থেকে প্রাসাদ যতটা দেখা যায়। মন্দিরটিতে এখনও নিত্যপূজা হয়। প্রতিদিন আলোয়ার থেকে সকাল ৮টার সময় পূজারি এসে পূজা দেন। পাশের গেট দিয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকি। সীতা-রাম মন্দিরে রাম এবং সীতা পূজা পাচ্ছেন। অষ্টধাতুর তৈরি মন্দির। বেদীর উপর রামসীতার মূর্তি। সামনে হনুমানজীর সাদা মার্বেল পাথরের মূর্তি। মন্দির দর্শন করে ফেরার পথে দেখি একটি ঘরে পরিত্যক্ত বয়লার এবং আরো কিছু সরঞ্জাম। এ বয়লারে শীতকালে জল গরম করা হত এবং সারা প্রাসাদে পাইপ লাইনের সাহায্যে গরম জল সরবরাহ করা হত। প্রাসাদের ঝুল বারান্দা, দরজা, জানালা যতটা বাইরে থেকে দেখা যায় দেখছি। সুন্দর স্থাপত্য অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হতে বসেছে।

প্রাসাদের পশ্চিমদিকে রয়েছে একটি ঝিল। বিরাট জলাশয়। এই জলাশয়ের মাঝখানে রয়েছে একটি ছোট দ্বীপ। দ্বীপে আছে একটি মহল। এই মহলকে বলা হয় জলমহল। তেজ সিং এই মহলে আমোদ ফূর্তি করতেন। নৌকা বিহার এবং জলমহলে আনন্দ ফূর্তি করার পক্ষে সুন্দর পরিবেশ।

এই সুন্দর জায়গা অনায়াসে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় মন্দির প্যালেসে মিউজিয়াম খুলে আর ঝিলে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা করে।

আমি ফিরে আসি আলোয়ারে। আবার এক পসলা বৃষ্টি হল। ভেবেছিলাম আজই আলোয়ার দুর্গটি দেখব। না, দেখা হল না। কেননা দুর্গদর্শন করতে হলে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট আলোয়ার-এর অনুমতি প্রয়োজন। আসলে আর্কিটেকচারাল ডিপার্টমেন্ট থেকে দুর্গ দর্শনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

অথচ এই দুর্গটি বহু প্রাচীন দুর্গ। অনেকগুলো তোরণ আছে। তার মধ্যে জয়পোল, সুরযপোল, লক্ষণ পোল, চাঁদপোল এবং আন্দেরী পোল উল্লেখযোগ্য। দুর্গের মধ্যে জলমহল, নিকুম্ভ মহল, সেলিম সাগর, সুরয কুন্ড এবং কয়েকটি মন্দির অবশ্য দর্শনীয়।

বিশাল দুর্গটি মুঘল যুগের আগে তৈরি। দুর্গটি দৈর্ঘ্যে ৫ কিমি এবং প্রস্থে ১.৬ কিমি। এর অবস্থান শহর থেকে ৩০৪ মিটার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫৯৫ মিটার উঁচুতে। মুঘল সম্রাট বাবরও নাকি এখানে একরাত কাটিয়ে গিয়েছেন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরও কিছুদিন এই দুর্গে ছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর যথেষ্ট মূল্য আছে। দুর্গের মধ্যে ১৫টি বড় ৫১টি ছোট স্তম্ভ আছে। বন্দুক চালাবার ফোকর রয়েছে ৪৪৬টি। সুতরাং সামরিক দিক দিয়ে দুর্গের সুরক্ষা ছিল বিস্ময়কর। বর্তমানে দুর্গে হোটেল-এর ব্যবস্থা হচ্ছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এই দুর্গ।

১৫ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

আজ, সকাল থেকেই দেখছি আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এই আবহাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো যায় না। টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। আবার ধরে যাচ্ছে। এরকম অবস্থায় বেরিয়ে পড়ি। যাব আলোয়ার রেল স্টেশানে। ওখানে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর বেড়ানোর প্রোগ্রাম ঠিক করব।

সকাল ৮টায় আলোয়ার স্টেশানে আসি। তারপর শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। কি আর করা যাবে? বসে বসে রেলের টাইম টেবিল দেখছি। আপ এবং ডাউনের প্রচুর ট্রেন আছে। ট্রেনগুলের নাম, ব্র্যাকেটে ট্রেনের নাম্বার, শুরু ও শেষ স্টেশানের নাম এবং আলোয়ার স্টেশানে আসার সময় উল্লেখ করলাম।

আপ ঃ

আহমেদাবাদ মেল (৯০০৬), দিল্লী-আহমেদাবাদ, ১.৩০ মিঃ। প্যাসেঞ্জার (১৮২), রিওয়ারি-জয়পুর, ৪.৩০, মিঃ। এক্সপ্রেস (৯৭৭২), অমৃতসর-জয়পুর, ৫.৫৫ মিঃ। সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস (২৪১৩), জম্মু-তাওয়াই-জয়পুর, ৭.৪৩ মিঃ। শতাব্দী এক্সপ্রেস (২০১৫), নিউদিল্লী আজমীর, ৮.৩২ মিঃ। প্যাসেঞ্জার (১৮৪), রিওয়ারি-আলোয়ার, ৭.৫৫ মিঃ। মরুদ্বার এক্সপ্রেস (৪৮৬৩), বেনারস যোধপুর, ৭.২০ মিঃ। পোরবান্দ্রা এক্সপ্রেস (৯২৬৪), দিল্লী-এস-আর পোরবান্দ্রার, ১১.৩৩মিঃ। বেরিলী এক্সপ্রেস (৪৩১১), বেরিলী-সিটি-আজমীর, ১৪.৩১ মিঃ। প্যাসেঞ্জার (১৮৬), হিসার জয়পুর, ১৯.০০। ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (৯৭৫৯), দিল্লী-জয়পুর, ১৯.৪০ মিঃ। রাজধানী (২৯৫৮), নিউদিল্লী-আহমেদাবাদ (থ্রু), ১৭.১১মিঃ। মান্ডোর এক্সপ্রেস (২৪৬১), দিল্লী-যোধপুর, ২৩.৫২মিঃ।

ডাউন ঃ

আহমেদাবাদ মেল (৯০০৫), আহমেদাবাদ-দিল্লী, ২.২১ মিঃ। মান্ডোর এক্সপ্রেস (২৪৬২), যোধপুর-দিল্লী, ৩.১৭ মিঃ। প্যাসেঞ্জার (১৮৭), জয়পুর-হিসার, ৬.৫০ মিঃ। আশ্রম এক্সপ্রেস (২৯১৫), ৭.০২মিঃ। ইন্টার সিটি (৯৭৬০), জয়পুর-দিল্লী, ৮.৩০ মিঃ। প্যাসেঞ্জার (১৮৫), আলোয়ার-মথুরা, ১০.২০ মিঃ। বেরিলী এক্সপ্রেস (৩৩১২), আজমীর—বেরিলী-সিটি, ১১.১১মিঃ। পোরবান্দ্রার এক্সপ্রেস (৯২৬৩), পোরবান্দ্রার—দিল্লী-এস-আর, ১৬.২০ মিঃ। প্যাসেঞ্জার (১৮৩), আলোয়ার-রিওয়ারি, ১৭.২০ মিঃ। মরুদ্বার এক্সপ্রেস (৪৮৬৪/৪৮৫৪), যোধপুর-বারাণসী, ১৭.৫৫ মিঃ। সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস (২৪১৪), জয়পুর-জম্মু-তাওয়াই, ১৯.০০। শতাব্দী এক্সপ্রেস (২০১৬), আজমীর-নিউদিল্লী, ১৯.৫১ মিঃ। প্যাসেঞ্জার (১৮১), জয়পুর-রিওয়ারি, ২২.০৮ মিঃ। এক্সপ্রেস (৯৭৭১), জয়পুর-অমৃতসর, ২২.২৫মিঃ। রাজধানী (২৯৫৭), আহমেদাবাদ-নিউদিল্লী (থ্রু), ৪.৫৬ মিঃ।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বসতে হল। বৃষ্টি কমতেই বেরিয়ে পড়ি। রেল স্টেশান থেকেই অটো রিক্‌শা ঠিক করি। শিলিশেড় প্যালেস ও লেক, আর জয়সামান্দ লেক দেখাবে। তিনশ টাকায় রফা হল।

শিলিশেড় লেক এবং শিলিশেড় প্যালেস-এর দূরত্ব ১৪ কিমি। এই সুন্দর লেকটি দিল্লী-জয়পুর সড়ক পথে পড়ে। বৃষ্টির মধ্যেই এগিয়ে চলেছি। আলোয়ার থেকে জয়পুর রোডের ডানদিকে শিলিসেড় লেক আর বাম দিকে জয়সামান্দ বাঁধ ও লেক। পথের ডানদিকে পাহাড় এবং অরণ্য। বামদিকে ঝিল। ওমরান গ্রামে আসতেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বামদিকের বিরাট ঝিল। আমার অটোর চালক বললেন বামদিকের যে ঝিল দেখছেন তারও অনেক পরে জয়সামান্দ লেক। ফেরার পথে আমরা ওখানে যাব।

আরো কিছুটা এগোবার পর দিল্লী-জয়পুর সড়ক পথে চলা শেষ। এই সড়ক থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে সিলিসেড়ের দিকে। অরণ্য পথ। পথে দেখতে পাচ্ছি কিছু বানর জবুথবু হয়ে বসে আছে। উপত্যকার নিচু জমিতে ফসল ফলেছে। গেঁও আর বজরার চাষ হয়েছে।

এসে পড়েছি অরণ্যে ঘেরা সিলিশেড় লেকে।

শিলিশেড় লেক ঃ

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আলোয়ারের মহারাজা বিনয় সিং শিলিশেড় লেকের ধারে একটি প্যালেস তৈরি করেন। এই লেকে মহারাজা পাখি শিকার করতেন। প্রায় ১০.৫ কিমি আয়তনের এই পাহাড়ী লেকের জল এক সময় আলোয়ারের খাবার জল হিসাবে ব্যবহার হত।

ছত্রীতে বসে চারদিকের সৌন্দর্য উপভোগ করা এক দারুন অভিজ্ঞতা । বিশেষ করে চাঁদনী রাতের দৃশ্য। লেকের একদিকে গড়ে উঠেছে ছত্রী। অন্য দিকে পাহাড়ের সবুজের হাতছানি। মাঝখানের বিশাল লেকের জলে অরণ্যের ছায়া যেন লেককে রহস্যময় করে তুলেছে।

রাণীর জন্য তৈরি করা প্রাসাদটিতে এখন হোটেল হয়েছে। হোটেল থেকেই লেকে আগত পাখির ডানা সঞ্চালন ও লেকের অপার্থিব সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। শীতের সময়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আরো বেশি মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে।

প্রাসাদের নিচে বোটিং এর জন্য সিঁড়ি পথ করা হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বোটিং-এর ব্যবস্থা আছে। বোটের ভাড়া নিম্নরূপ।

(১) মোটর বোট— প্রতি ৮ জনের জন্য পনের মিনিটে ৩০্ টাকা।

(২) প্যাডল বোট— প্রতি ৪ জন্যে জন্য ৩০ মিনিট -এ ৬০্ টাকা।

আর শিলিশেড় প্যালেস হোটেলের ভাড়া নিম্নরূপ—

সুপার ডিল্যুক্স, ডবল বেড—৮৫০ টাকা, সিঙ্গল বেড—৭৫০্ টাকা এবং বাড়তি প্রতি বেডে ১২৫্ টাকা। ডিল্যুক্স ডবল বেড—৬০০্ টাকা, সিঙ্গল বেড— ৪৫০্ টাকা এবং বাড়তি প্রতি বেডে ১০০্ টাকা। ডর্মিটরি ব্যবস্থাও আছে। হোটেলের চেক আউট টাইম দুপুর বারটা।

শিলিশেড় লেক ও প্যালেস দেখে ফিরে চলেছি। বৃষ্টি এখনও থামেনি। ওমরান গ্রামের অনেকটা আগে দিল্লী-জয়পুর রোড থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে জয়সামান্দ গ্রামের দিকে। পথের দুদিকে বজরা, গেঁও, জোয়ার এবং সবজী ফলেছে। এসে পড়েছি জয়সামান্দ বাঁধে।

জয়সামান্দ বাঁধ ও লেক ঃ

১৯১০ সালে মহারাজা জয় সিং এই কৃত্রিম লেকটি তৈরি করেন। পাহাড়ের পাদদেশে নিম্ন ভূমিতে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা বৃষ্টির জলকে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে। বৃষ্টির জলে টইটুম্বুর হচ্ছে লেক। জয়সামান্দ গ্রামের এই বাঁধকে বলে জয়সামান্দ বাঁধ আর জলাভূমিকে বলে জয়সামান্দ লেক।

বাঁধের গায়ে গড়ে তোলা হয়েছে একটি পার্ক। পার্কের সাইনবোর্ডে দেখছি বাঁধের উচ্চতা ৩৩ ফুট এবং দৈর্ঘে ৪৫৮১ ফুট। জলের সর্বাধিক গভীরতা খুব একটা বেশি নয়। ফলে ট্যাঙ্কের চারদিকের জমিতে চাষ হয়। চাষযোগ্য জমি ১১.৯৭৬ একর এবং সেচ জমি ৯৩৪০ একর। মোট ১৩৪৭৯ একর জমি বাঁধের আওতায় এসেছে।

বাঁধের উপর অনেকগুলো ছত্রী গড়ে তোলা হয়েছে।

ফিরে চলেছি আলোয়ারের পথে। পথের দুপাশে পীপল (বট), নিম, ইউক্যালিপটাস, আম এবং অন্যান্য গাছ-গাছালি দেখা যাচ্ছে। পথের পাশে পড়ল একটি মন্দির—হনুমান মন্দির। মন্দিরে পূজা পাচ্ছেন ভেরু দেবী, সন্তোষী মাতা, দুর্গামাতা এবং গণেশজী।

ফিরে আসি আলোয়ারে। গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়ি। এখন যাব সরিসকা। বিকেল বেলা এসে পৌছাই সরিসকায়। আলোয়ার থেকে সরিসকার দূরত্ব ৩৬ কিমি। দিল্লী-জয়পুর হাইওয়ে ধরে আসতে হয় সরিসকায়।

দশ

সরিসকা ঃ

আরাবল্লী পর্বত মালার উপত্যকায় গড়ে উঠেছে সরিসকা অভয়ারণ্য। ৮৬০ একর বনভূমি জুড়ে এর বিস্তার। অভয়ারণ্যটি দুই ভাগে ভাগ করা। ৪৯০ একর ঘন অরণ্য যা বাঘ ও বড় জন্তুদের জন্য সংরক্ষিত। এই অঞ্চলকে বলে কোর এরিয়া। আর ৩৭০ একর জমি যেখানে ছোট-খাট জন্তুগুলো বাস করে, এই অঞ্চলকে বলে বাফার এরিয়া।

রাজস্থানের ঘন অরণ্য বেষ্টিত এই অঞ্চলটি এক সময় আলোয়ারের রাজার প্রিয় শিকার ক্ষেত্র ছিল। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সরিসকাকে অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আর ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে এই অভয়ারণ্যটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই অভয়ারণ্যের বনভূমিতেই এক সময় ককনওয়ারি দুর্গ ছিল। আর এই দুর্গে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তার বড় ভাই দারাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। পরে তাকে হত্যা করা হয়।

ধোক, খয়ের, টেন্দু, বের প্রভৃতি গাছে ভরা এ অরণ্যে বাঘ, ভল্লুক, লেপার্ড, খেঁকশেয়াল, বুনো কুকুর, নীল গাই, বন্যশুয়োর, চৌশিংগা, চিংকারা,-চিতল হরিণ, সজারু, কারাকাল, হায়না, জংলী বেড়াল এবং নানান জাতের পাখি দেখা যায়।

অভয়ারণ্যের মধ্যে কৃত্রিম সৃষ্ট জলাশয়ে বন্যপ্রাণী জল পান করতে আসে। আর সেখানেই ১৫ মিটার উঁচু ওয়াচ টাওয়ার গড়ে তোলা হয়েছে। সরিসকায় রাত্রিতে বাস করলে রাতের ঘন অন্ধকারে সার্চ লাইটের সাহায্যে টাওয়ার দুটো থেকে বন্যপ্রাণী দেখা যায়। টাওয়ার দুটির একটি বাঁদীপুল অন্যটি কালীঘাটিতে রয়েছে। জুন থেকে নভেম্বর, এর মধ্যে সরিসকা অভয়ারণ্য দেখার শ্রেষ্ঠ সময়। আলোয়ারে এলে প্রথমেই Field Director Po–Sariska Dist– Alwar Rajasthan-এর কাছ থেকে Tiger Den Tourist Bunglow অথবা Tourist Rest House-এ থাকার ব্যবস্থা করে নিন।

সরিসকায় দর্শনীয় বিষয়—সরিসকা অভয়ারণ্য, ভতৃ, তালব্রক্ষ, পান্ডুপোল, কঙ্কাওয়ারি দুর্গ, নীলকণ্ঠ মন্দির, গড়-বাজোর এবং মঙ্গল সাগর বাঁধ। আর এসব দেখতে হলে আলোয়ার থেকে গাড়ি রির্জাভ করে আসাই ভাল।

এবার আমার সরিসকা দর্শনের কথাই বলি। আমি সরিসকায় এসেছি ১৫ই সেপ্টেম্বর। বিকেল ৪টায় সরিসকা বাস-স্ট্যান্ডে নেমেই দেখি বন বিভাগের ইনচার্জের অফিস ঘর।

অফিসে ঢুকতেই একটা মেটাডোর কিছু যাত্রী নিয়ে বনবিভাগের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। অফিসের ইনচার্জ রসিদ কেটে দিলেন। পেমেন্ট মিটিয়ে মেটাডোর চলে গেল। ইনচার্জ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম সরিসকা অভয়ারণ্য দর্শনের জন্য বনবিভাগের নিজস্ব কোন ব্যবস্থা নেই। কেউ গাড়ি নিয়ে এলে বনবিভাগের অনুমতি নিয়ে অভয়ারণ্য দেখতে পারেন।

সরিসকা বনবিভাগের এ ব্যবস্থা আমার জানা ছিল না। আমি এর আগে রণথম্ভোর অভয়ারণ্য দেখেছি।

(মৎ লিখিত রাজপুতানা রাজস্থান ১ম খণ্ড দেখুন)। সে অভিজ্ঞতার নিরিখে সরিসকা অভয়ারণ্য দর্শন করতে এসেছি। রণথম্ভোরে যে কেউ টিকিট কেটে বনবিভাগের গাড়িতে অভয়ারণ্য দর্শন করতে পারেন। এখানে তা নয়।

বনবিভাগের ইনচার্জ মিঃ দিলীপ যাদবকে অনুরোধ করলাম এর পর কোন গাড়ি এলে সে গাড়িতে যেন আমায় তুলে দেন। মিষ্টার যাদব বললেন আজ আর সময় নেই। পাঁচটার মধ্যে অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। তার পরামর্শ এবং সক্রিয় সহযোগিতায় আজ রাতে বনবিভাগের Rest House–এ থাকব। আগামী দিন তিনি যে কোন গাড়িতে আমায় তুলে দেবেন।

রাতের আশ্রয় বাবদ মিস্টার যাদবকে একশ টাকা দিতে হবে। আমি রাজি হলাম। রেষ্ট হাউসে ড্রাইভারের থাকার ঘর, আমার জন্য ছেড়ে দিল। রুমে লাগেজ রেখে বাইরে আসি। এখানে আলাপ হল বনবিভাগের গাইড সীতারাম শর্মার সঙ্গে। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা।

মিঃ শর্মার মোটর বাইক আছে। তাকে অনুরোধ করলাম তার বাইকে চড়ে দুজনে বন ঘুরে বেড়াব, এবং পেট্রলের খরচ আমি দেব। শর্মা রাজি হলেন। শর্মা বললেন—মিঃ দাস আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন, আমি ততক্ষণে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

— ঠিক আছে আপনি বাড়ি থেকে ঘুরে আসুন। আচ্ছা, এখানে কখন আসবেন?

— ঠিক পাঁচটার সময় আপনাকে তুলে নেব, তৈরি থাকবেন।

এখন হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ততক্ষণে কাছাকাছি কিছুটা ঘুরে আসি। দিল্লী-জয়পুর হাইওয়ে ধরে এগোতে থাকি। রাস্তার পাশে তেরাস্তার মোড়। এখানে সাইন বোর্ডে হোটেল টাইগার ডেন সরিসকা এবং হোটেল সরিসকা প্যালেস-এর দিক নির্দেশ করা আছে। এগোতে থাকি হোটেল টাইগার ডেন-এর দিকে।

টাইগার ডেন-এর লনে ম্যানেজার এবং কয়েকজন আবাসিক বসে গল্প করছেন। আমার আসার উদ্দেশ্য জেনে ম্যানেজার বললেন চলুন আমার অফিস ঘরে। অফিসে রেন্ট চার্টে দেখছি নিম্নরূপ ভাড়া—

HOTEL TIGER DEN, SARISKA (R.T.D.C.)

সুইট রুম সিঙ্গল—৯৫০ ডাবল ১২০০ এক্সট্রা ১২৫, অতিরিক্ত ৬% ট্যাক্স। সুপার ডিল্যাক্স এয়ার কন্ডিশন, সিঙ্গল ৭০০ ডবল ৮২০ এক্সট্রা ১২৫ ডিল্যুক্স, সিঙ্গল ৫৫০ ডবল ৬০০ এক্সট্রা ৬০। ডর্মিটরি ৫০ প্রতি বিছানা।

সাইট সীন প্রতি দু থেকে আড়াই ঘণ্টায় পাঁচ জনের জন্য ৬৩০ বনবিভাগের ফি ছাড়া। গাড়ির এন্ট্রি ফি ১২৫ এবং জন প্রতি ২০। বিদেশীদের জন্য এন্ট্রি ফি ১০০ জন প্রতি। রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট ৯৪। লাঞ্চ এবং ডীনার ১৩২ আমিষ ১৮৯, এছাড়া সেল ট্যাক্স ৬% এবং সারচার্জ ১২%। বার এর ব্যবস্থাও আছে।

টাইগার ডেন ছেড়ে এগিয়ে চলি। সামনে ন্যাশনাল পার্কের মুখে পুলিশ চৌকি। চৌকিতেও দেখছি ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশ ফি লেখা আছে।

সরিসকা ব্যাঘ্র প্রকল্পের এন্ট্রি ফি—

ভারতীয় জন প্রতি ২০, বিদেশী ১০০, ছাত্র স্কুল সার্টিফিকেট সঙ্গে থাকলে ৫ জন প্রতি। গাড়ির ফি—বাস ২০০ মিনিবাস ১২৫ জীপ কার, গুপচি ১২৫। ক্যামেরা ফি, সাধারণ ক্যামেরার দরকার নেই। মুভি ক্যামেরা এবং ভি-ডি-ও ফি ২০০।

ফিরে আসি ফরেস্ট রেস্ট হাউসে। এসেই শুনি মিঃ যাদব খবর পাঠিয়েছেন, আমি যেন হোটেল টাইগার ডেন-এ থাকার ব্যবস্থা করি কেননা আলোয়ার থেকে বনবিভাগের একজন অফিসার আসার কথা আছে। বুঝতে পারছি মিঃ যাদব বিপদে পড়েই এই ব্যবস্থার কথা বলেছেন। সুতরাং লাগেজ নিয়ে চলে এলাম টাইগার ডেন-এ। টাইগার ডেন-এর ম্যানেজার আমার থাকার কথা শুনে চমকে উঠলেন। ম্যানেজার বললেন—ডরমিটরির ব্যবস্থা আছে ঠিকই কিন্তু এ হল ঘরে এখন কাজ হচ্ছে। দেখবেন চলুন।

ডর্মিটরি হল ঘরে এসে দেখি যথার্থই কাজ হচ্ছে। সামনে সীজন সময়ের জন্য এ প্রস্তুতী। আবার ফিরে আসি ফরেস্ট রেস্ট হাউসে। এবার বনবিভাগের চৌকিদার বললেন— আপনি আমার ঘরে থাকুন, সকাল হলেই রুম ছেড়ে দেবেন তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না। আর ঘর ভাড়ার টাকাটা আমাকেই দেবেন।

তথাস্তু।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে তালা দিয়ে বাইরে আসি। এমন সময় সীতারাম শর্মাও এসে পড়েছেন। তার বাইকের পিছনে বসে পড়ি। বাইক এগিয়ে চলেছে বনের পথ ধরে। পথে দেখছি প্রচুর বানর। মিঃ শর্মা বললেন 'আমরা এখন বাফার জোনে আছি। মঙ্গলবার এবং শনিবার বাফার জোনে বাইক নিয়ে ঘুরতে কোন বাধা নেই। মঙ্গলবার, শনিবার ছাড়া কালেক্টর, আলোয়ার-এর অনুমতি নিতে হয়। আজ মঙ্গলবার সুতরাং আমাদের বাফার জোনে ঘুরতে কোন অসুবিধা নেই।

পথে পুলিশের জীপ এবং বনবিভাগের অন্য কর্মীদের সঙ্গে দেখা হয়। শর্মা হাত বাড়িয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। মিনিট দশেক চলার পর আমরা একটা পেট্রল পাম্পে এসে পৌঁছাই। তিন লিটার পেট্রল নেওয়া হল। আমি পুরো দামটা মিটিয়ে দিতে চাই। শর্মা বললে না আপনি দুলিটার তেলের দাম দিন। দাম মিটিয়ে উল্টো দিকে চলতে থাকি।•

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বনে অন্ধকার নেমে এসেছে। তার উপর দেখছি আকাশে মেঘ জমেছে। মটর বাইক এগিয়ে চলেছে খুব দ্রুত গতিতে। যত এগোচ্ছি মেঘ যেন আমাদের তাড়া করে আসছে। উপত্যকার পথ ধরে এগোচ্ছি। আশে পাশে কোথাও বাড়ি ঘর নেই।

সামনে পড়ল একটা নদী। নদী ঠিক বলা যায় না। পাহাড়ি ঝোরার জল পাকা রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু স্রোতের খুব বেগ। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি বৃষ্টি ধেয়ে আসছে। বাইকের গতিও বাড়ান হল—বৃষ্টিতে ভেজার আগেই যদি কোন শেলটার পেয়ে যাই। না তার আগেই বৃষ্টি আমাদের ধরেছে। আমরা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ি। বৃষ্টি থামতেই —সীতারাম শর্মা বললেন ভিজিয়ে দিল।

— মিঃ দাস আমি দুঃখিত, তালব্রক্ষতে আজ আর যাওয়া হবে না।

— বৃষ্টিতো থেমে গেছে, এখন তালব্রক্ষ-এ যেতে কোন অসুবিধা আছে কি?

— এই যে বৃষ্টিটা হল এর জন্যই সব গোলমাল হয়ে গেল। পথে আসার সময় যে নদীটা দেখলেন পাহাড়ের জল কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ নদীতে এসে পড়বে। তখন আর আমরা ফিরতে পারব না।

— কি আর করা যাবে। চলুন ফিরে যাই।

ফিরে চলেছি। আলো অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়ি ঐ নদীতে। যাবার সময় হাঁটুর নিচে জল ছিল। এখন উঠেছে হাঁটুর উপরে। স্রোতের বেগও আগের থেকে অনেক বেশি। কোন রকমে দুজনে ঠেলে বাইকটাকে নিয়ে নদী পার হই। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এসে পৌঁছাই ভতৃতে।

পুরানো দিনের কথা। ভতৃ ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা। রাজা হয়েও তাঁর মনে নেই সুখ। কেননা রাজার কোন সন্তানাদি হল না। ভাগ্যক্রমে ভতৃ রাজা একজন ঋষির সন্ধান পান। রাজন ঋষিকে মনের দুঃখের কথা জানালেন এবং প্রার্থনা করলেন যেন ঋষির আশীর্বাদে রাজার সন্তানাদি হয়।

ঋষি রাজাকে একটি আপেল দিয়ে বল্লেন, রাজমহিষী যেন ভক্তিভাবে আপেলটি খায় তাহলেই রাজার পুত্র সন্তান জন্মাবে। রাজা মহা আনন্দে আপেলটি রাজমহিষী পিংলাকে খেতে দিলেন। পিংলার কিন্তু বিশ্বাস হল না। সে আপেলটি তার দাসীকে দিয়ে দিল। দাসীর পুত্র সন্তান জন্মাল। রাজা মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে এই ভতৃতে এসে তপস্যা করা শুরু করলেন। ভতৃ রাজা হলেন ভতৃ ঋষি। এক সময় ভতৃ ঋষি মহাপ্রয়াণ করেন। ভতৃতেই ঋষি সমাধিস্থ হন। সমাধি ক্ষেত্রের উপর মন্ডপ তৈরি হয়েছে। মন্ডপের সামনে ভতৃ ঋষির মূর্তি।

ভতৃ মন্দিরের সামনে শিব মন্দির। ভতৃতে প্রত্যহ ভক্তগণ দূর-দূরান্ত থেকে আসেন। পূজা দেন। লোক সমাগম হয় বলে এখানে অনেকগুলো মণিহারি দোকান আছে। দোকানে ভতৃ ঋষি এবং শিবের ফটো এবং নানা খেলনা ও সাজের জিনিস বিক্রি হয়। এমনকি ভক্তদের থাকার জন্য ধরমশালাও আছে। আর আছে খাবারের দোকান।

ফিরে আসি ফরেস্ট রেস্ট হাউসে।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই চৌকিদার হনুমান প্রসাদ বললেন—স্যার ঘর ভাড়ার টাকাটা আমায় দিন, আর মিঃ যাদবের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন আপনি গত রাতে হোটেলে ছিলেন।

আশ্চর্য।

এই ঘর ভাড়ার টাকা নিয়েই যথা সম্ভব এদের মধ্যে মত পার্থক্য হয়। আর এজন্যই আমাকে হোটেল টাইগার ডেন-এ থাকার কথা বলা হয়েছিল। যাই হোক মনের কথা গোপন রেখে চৌকিদারকে বলি প্রসাদজি আমার লাগেজটা আপনার রুমে রাখতে চাই। বিকেল বেলা আমি নিয়ে নেব।

— না, না, আপনার লাগেজ সঙ্গে নিয়ে যান। আমার আজ ছুটি, আমি দেশের বাড়ি চলে যাব।

বুঝলাম লাগেজ সঙ্গে নিয়েই ঘুরতে হবে। ফরেস্ট রেস্ট হাউসের বাইরে আসতেই দেখা হল একজন পুলিশের সঙ্গে। ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি অভয়ারণ্য দর্শন করব কিনা। এই ভদ্রলোককে আমি গতকাল বিকেলে পুলিস চৌকিতে ডিউটি দিতে দেখেছিলাম। তাকে বলি আমি ব্যাঘ্র প্রকল্প দেখবো বলেই এখানে এসেছি। কিন্তু আমি একা। আর তখনই একটি মিনিবাস এসে দাঁড়াল আমাদের পাশে। এই মিনিবাসের ড্রাইভারের সঙ্গে কাল রাতে ভতৃতে পরিচয় হয়েছিল। মিঃ শর্মা এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দিয়ে বলেছিলেন আপনি ওকে পাঁচশ টাকা দেবেন। তাহলে ও আপনাকে অভয়ারণ্য ঘুরিয়ে দেখাবে।

বুঝলাম ওদের মধ্যে একটা বোঝা পড়া আছে। আমি বললাম আমি একা, আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারা আরও দু-একজন সওয়ার যোগাড় করুন। তখন ড্রাইভার বল্লে চলুন টাইগার ডেন-এ যদি কাউকে পাই।

না, টাইগার ডেন-এ কাউকে পাওয়া গেল না। যে কয়েকজন আবাসিককে গত কাল দেখেছি এরা নিজেরা গাড়ি নিয়ে এসেছেন বনের দৃশ্যগুলো ভিডি-ও ক্যামেরায় তুলবে বলে।

ফিরে আসি ফরেস্ট রেস্ট হাউসের সামনে। কোন সওয়ার পেলাম না দেখে পুলিশ ভদ্রলোক বললেন—আপনি শুধু গাড়ির পেট্রল খরচ এবং বনের এন্ট্রি ফি বাবদ তিনশ টাকা দিন। ঘুরে দেখে আসুন অভয়ারণ্য, মিস্টার শর্মার বন্ধু বলে বলছি।

দেখলাম এদের আন্তরিকতায় খাদ নেই। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশ কালো হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামবে। এই বৃষ্টির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে কিছু দেখা যাবে না। সুতরাং মনস্থির করি, না, আর সরিসকায় নয়। ফিরে যাব আলোয়ার। বাস স্ট্যান্ডে আসতেই নামল বৃষ্টি—মুসলধারে বৃষ্টি।

বাস স্ট্যান্ডে মাত্র একটি অস্থায়ী দোকান। ত্রিপলের ছাউনি। আমরা অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছি বাসের অপেক্ষায়। অনেকক্ষণ পর আলোয়ার গামী একটি বাস এল। বাসে উঠে বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। বসে বসে ভাবছি এত কাছে এসেও সরিসকার কিছুই দেখয না! কুশাল গড়ে আমি নেমে পড়ি। এই কুশালগড় থেকে রাস্তা চলে গেছে তালব্রক্স-এ। যাবার আগে তালব্রক্সটা দেখে যাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাস পেয়ে গেলাম। কুশালগড় থেকে তালব্রক্স এর দূরত্ব ১৪ কিমি।

তালব্রক্স মুন্ডারি ঃ

এখানে মান্ডব ঋষির আশ্রম আছে। কথিত আছে মান্ডব ঋষি এখানে তপস্যা করতেন। তিনি প্রতিদিন গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রীতে স্নান করে তপস্যায় বসতেন। এই কষ্ট দেখে গঙ্গোত্রী স্বপ্নে বললেন তালব্রক্স-এ আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।

পাহাড়ের কোলে গঙ্গাজীর মন্দির। পাহাড় থেকে উষ্ণ জলের ধারা বেরিয়ে আসছে। সেই ধারার সঙ্গে যুক্ত কুয়ো। কুয়োর উপরে গঙ্গাজীর মন্দির। গঙ্গাজীর চরণ ধোয়া জল নিচে নেমে আসছে, মান্ডব ঋষির আশ্রমের নিচের কুয়োতে। উষ্ণ জলে স্নান করে চর্মরোগর নিরাময় হয়। সর্বসাধারণের বিশ্বাস এই রকম।

গঙ্গা মন্দিরের উল্টো দিকে শিব মন্দির। গঙ্গা মন্দির পরিক্রমা করে আমি আসি শিব মন্দিরে। পাথরের শিবলিঙ্গ। পাশে হনুমান মন্দির। একই কম্পাউণ্ডে দুটি মন্দির। শিব মন্দিরের একটু দূরে দেবী দুর্গার শ্বেত পাথরের তৈরি মন্দির।

এখানে অনেকগুলো ছত্রী আছে। ভক্তগণের থাকা খাওয়ার জন্য একটি ধর্মশালাও আছে। তবে সাময়িক বিশ্রামাগার।

তালব্রক্ষ-এ পেয়ে গেলাম আলোয়ারের বাস। সরিসকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিন্তু মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে সরিসকার অভয়ারণ্য না দেখতে পারার জন্য। আজই আলোয়ার থেকে বাস বদল করে চলে যাব ভরতপুর।

বিকেলবেলায় এসে পৌঁছাই ভরতপুর। ভরতপুর রেল স্টেশানের কাছে আগরওয়ালা ধরমশালায় উঠি।

এগার

ভরতপুর ঃ

ভরতপুর জেলাটি রাজস্থানের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। এর উত্তরে হরিয়ানা, দক্ষিণে সোয়াই মাধোপুর এবং দৌলতপুর। পূর্বে উত্তর প্রদেশ আর পশ্চিমে আলোয়ার এবং দোসা জেলা।

ভরতপুর এক সময় পূর্বতন রাজপুতানার করদ রাজ্য ছিল। ভরতপুরের আয়তন ৫১১১ বর্গ কিমি। লোক সংখ্যা ১৬,১৫,৫৮৪ জন। শিক্ষিতের হার ৪২.৯৬%, ১০টি তহশীল নিয়ে ভরতপুর জেলা। গ্রামের সংখ্যা ১৪৫৪টি।

এখানকার প্রধান শস্য গম, বার্লি, পালসেস, তৈলবীজ এবং আখ। আর খনিজ পদার্থ— জিপসাম, সোপস্টোন, প্লেট স্টোন, কপার ওর, আয়রন ওর, সীসা এবং পারদ।

গ্রীষ্মকালে এখানকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ২১.৯ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড। যমুনা এবং চম্বল নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছে বলে কোথাও, কোথায়ও এর মাটির রঙ কালো দেখায়।

স্বাধীন ভরতপুর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন রাজা বদন সিং। তার দত্তক পুত্র সুরজমলের রাজত্বে এই জাঠ রাজ্যটির চরম উন্নতি ঘটে। সুরজমলের পুত্র জওহর সিংয়ের সময়ে রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন ইংরেজগণ রাজ্যটি দখল করে নেন। ভরতপুরের দুর্গটি খুব প্রসিদ্ধ। আর বর্তমানে দুর্গের থেকেও প্রসিদ্ধ এখানকার পক্ষীনিবাস। পক্ষীনিবাসের নাম কেওলাদেও ঘনা পক্ষীনিবাস।

আগ্রা থেকে এর দূরত্ব ৫৫ কিমি। এখানে আসতে হলে কাছাকাছি বিমান বন্দর আগ্রা, দিল্লী কিংবা জয়পুর। আর রেলপথে ভরতপুর একটি বড় জংসন। সুতরাং বিভিন্ন শহরের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। আর সড়কপথে আগ্রা, মথুরা, জয়পুর, দিল্লী এবং রাজস্থানের বড় শহরের সঙ্গে বাসে নিয়মিত যোগাযোগ আছে।

থাকার জায়গারও অভাব নেই। যেমন—R.T.D.C.-র সরস ট্যুরিস্ট বাংলো ফোনঃ ২৩৭০০। এটি পক্ষী নিবাসে ঢোকার মুখে পড়ে। হোটেল প্রতাপ প্যালেস ফোঃ ২৪২৪৫, লক্ষণ নিবাস প্যালেস ফোঃ ২৩৫২৩, সার্কিট হাউস ফোঃ ২৩৭৬৬, ভরতপুর ফরেস্ট লজ ফোঃ ২২৭৬০, ২২৭২২, ১৯৯৮ সালে ফরেস্ট লজের ঘরভাড়া—সিঙ্গল বেড

১৭০০ ডবল বেড—২৫০০। অতিরিক্ত প্রতি বিছানা ৩০০। এই লজটি রয়েছে পক্ষী-নিবাসের মধ্যে। F.R.H. শান্তি কুটির ফোঃ ২২৭৭৭ এটিও পক্ষীনিবাসের মধ্যে। এছাড়া গোলবাগ প্যালেস হোটেল, সৈনিক বিশ্রাম গৃহ, ট্যুরিস্ট লজ, ট্যুরিস্ট রসী হোটেল এবং বাসস্ট্যান্ডে হোটেল নন্দ ট্যুরিস্ট। আর ধরমশালা আছে—কামসেন ধরমশালা, কোতোয়ালির কাছে, আগরওয়াল ভবন, ব্রাহ্মণ ধরমশালা, খাণ্ডেলওয়ালা ধরমশালা, বাসন ঘাটের কাছে এবং পরশুরাম অগ্রবাল ধরমশালা রেল স্টেশানে।

যানবাহন ঃ

ভরতপুরের সাধারণ যানবাহন রিক্‌শা এবং টাঙ্গা। এখানকার রিক্‌শাগুলো দেখছি আকারে ছোট। তাতেই তিন-চারজন যাত্রী উঠছে। পিছনের দিকে মুখ করে রডের উপর পা রেখে বসছে ২ জন আর সামনে ২জন।

রিক্‌শা এবং টাঙ্গা ছাড়া টেম্পো, অটো রিক্সা জীপ, বাস এবং মিনি বাস।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

আজ যাব কেওলাদেও ঘনা পক্ষীনিবাসে। ওখান থেকে ফেরার পথে দেখব ভরতপুর কেল্লা। ভরতপুর রেলষ্টেশন থেকে পক্ষীনিবাসের দূরত্ব চার কিমি। এর মধ্যে আড়াই কিমি যাওয়া যায় টেম্পোতে, পুরানো বিজলী ঘর পর্যন্ত। ভাড়া নেয় দুটাকা। বাকি পথ রিকশায়। ভাড়া নেয় পাঁচ টাকা।

সকাল সাতটায় এসে পৌঁছাই পক্ষীনিবাসে। সারা দিনের যে-কোন সময় প্রবেশ করা যায়। পক্ষীনিবাসের প্রবেশ পথ শহরের দক্ষিণ দিকে, পার্কের মধ্য স্থলে রয়েছে, কেওলাদিও মন্দির। কেওলাদিও অর্থাৎ শিব। এই শিব মন্দিরের নাম থেকেই পক্ষীনিবাসের নাম।

কেওলাদিও ন্যাশনাল পার্ক ভরতপুর ঃ

২৯ বর্গকিমি জলাভূমিতে গড়ে উঠেছে পার্ক। এক সময় ভরতপুর রাজ্যের মহারাজা এখানে পাতি-হাঁস শিকার করতেন। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন প্রথম এখানে পাখি শিকার করেন। ১৯৫৬ সালে এই ভূখণ্ডটি পক্ষীনিবাসের তালিকায় স্থান পায়। ১৯৮২ সালে জাতীয় পক্ষী-নিবাসে পরিণত হয়।'

পক্ষী-নিবাসের গেটের সামনে আসতেই কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রত্যেকেই সাইকেল এগিয়ে দেয়, তার সাইকেলটা যেন ভাড়া নিই।

— কী ব্যাপার ?

— সাইকেল না হলে এতখানি জায়গা কি করে দেখবেন?

— ভাল, ভাড়া কত?

— সারা দিনের জন্য কুড়ি টাকা।

পার্কে প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা। টিকিট কেটে একটা সাইকেল নিই। আবার সাইকেলের জন্য প্রবেশ মূল্য তিনটাকা। তাও দিলাম। সাইকেলের ভাড়া ঘুরে এসে দিতে হবে।'

এগিয়ে চলি।

পার্কের মাঝ বরাবর পাকা রাস্তা আছে। আবার সে রাস্তা থেকে দুদিকে পাকা এবং ইট বিছানো রাস্তা চলে গেছে পার্কের বিভিন্ন দিকে। যেখানে পাখিদের আস্তানা সেখানে কাঠের নির্দেশক রয়েছে। এক এক জায়গায় এক এক ধরনের পাখি থাকে। কর্তৃপক্ষ থেকে পাখিদের নাম লিখে রাখা হয়েছে।

রাস্তার দুদিকে বাবলা কাঁটা। বাবলা কাঁটার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট পাখি। যে দিকে যাই শুনি পাখির কূজন।

ছোট ছোট পাখি।

আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে ছোট ছোট পাখি
ডালে ডালে লাফা লাফি করে
আর যেন বলে-কাকলির স্বরে
ও পথিক, দেখ আমরা থাকি কাঁটা বনে
তবু দেখ আমরা স্বাধীন, নাচি গাই
আনন্দে ভরা আমাদের এ-দু আঁখি
আর তোমরা মানুষ জন
আমাদের মত কি স্বাধীন?
শুনেছ কি আমাদের কূজন
ঐ কূজনে আমরা পক্ষীকুল
বিশ্ব স্রষ্টার বন্দনা করে থাকি
আর এই যে সবুজ! আমাদের বড় আপন।

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীবন, হে মানুষ!
তোমরা ঐ সবুজ কেটে কর সাফ
তাইতো তোমাদের
অন্তিমক্ষণ এগিয়ে আসছে
নিঃশ্বাস নেবার রসদও যাবে ফুরে,
ভাবছ কি সে দিনের কথা? কবে হবে হুঁশ।

সত্যি ভাবনা হয়। মানুষ কেন এভাবে সবুজ ধ্বংস করছে? কবে হবে মানুষের চৈতন্য! সবুজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না। এ বোধোদয় না হলে মানুষ নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবে।

এসব ভাবছি আর এগোচ্ছি। যত এগোচ্ছি দেখছি ডাঙ্গার পরিমাণ কমে আসছে। জলাভূমির পরিমাণ বাড়ছে। এখন রাস্তার দুদিকে জল। জলে ঘাস জঙ্গল, শেওলা, কচুরিপানা, এমন কি শাপলাও দেখা যাচ্ছে। কোথাও পরিষ্কার জলা জমি, কোথাও গভীর জল।

জলে রয়েছে মাছ, শামুক, আর জঙ্গলে পোকা মাকড়। এসবই পাখির খাদ্য। হরেক রকম মাছ। ডুব সাঁতারে পাখিগুলো দেখছি ডুবে ডুবে মাছ ধরছে আর খাচ্ছে। করমোরান্টি স্টর্ক, স্পুনবিল, কম্বডাক, বক ইত্যাদি মাছ খেয়ে বেঁচে থাকা পাখি যেমন আছে তেমনি কীটপতঙ্গ খাওয়া ছোট ছোট দেশী পাখিও আছে।

বিভিন্ন জায়গায় দেখছি বাবলা গাছের ঝোপে হরেক রকমের পাখি। পাখিদের কূজন আর পাখার সঞ্চালণে এক অনন্য অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মুভি ক্যাম্মেরা নিয়ে বসে আছেন কয়েকজন। এখানে সব চলছে ছায়াছবির মত। কারো মুখে কোন কথা নেই। ক্যামেরায় যেমন পাখিদের আচার-আচরণের ছবি বাক্স বন্দি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কূজন, তাদের পাখনার ঝাপটা ঝাপটির শব্দ, শব্দগ্রহণ যন্ত্রে ধরা পড়ছে।

যত এগোচ্ছি বিভিন্ন জাতের পাখি দেখছি। পাখির সংখ্যাতো কম নয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এ পর্যন্ত ৩৭৪ ধরনের পাখি দেখা গেছে এ পাখিরালয়ে। তবে সব পাখি এ পাখিরালয়ে সারা বছর থাকে না। বাইরে থেকে সীজন সময়ে অর্থাৎ শীতকালে আসে। তখন স্থানীয় এবং বহিরাগত সব পাখির সমাবেশে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠে কেওলাদিও ঘনা ন্যাশনাল পার্ক। আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, সাইবেরিয়া থেকে আসে হরেক রকমের পাখি। সাইবেরিয়া থেকে সারস আর ছাই রঙ্গের হাঁস এবং চীন থেকে মাথা লম্বা হাঁস সীজন সময়ে অর্থাৎ জুলাই আগস্ট থেকে অক্টোবর-নভেম্বরের মধ্যে আসে।

এই পার্কে বাবলা গাছ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের গাছ আছে। তার মধ্যে বেশি পরিমাণে দেখছি কদম গাছ। বাবলা গাছের পরে এ গাছের স্থান। এই কদম গাছ কিন্তু আমাদের পরিচিত কদম গাছ নয়। আমাদের পরিচিত কদম গাছ যেমন সোজা হয়ে অনেকটা উঠে এবং সোজা ডাল ছড়ায়, পাতাগুলো বড় এবং গোল হয় আর গোল থোকা থোকা ফুল ধরে, এগুলি তা নয়। এই কদম গাছগুলো অনেকটা ঝাকড়া গাছ। পাতাও ছোট।

বাবলা, কদম ছাড়া এ্যাকাসিয়া, বের, ফিকুস....ইত্যাদি গাছ জল এবং ডাঙ্গায় দেখা যাচ্ছে। তবে সব গাছকে হার মানায় বাবলা কাঁটা গাছ। বাবলা গাছতো সারা রাজস্থানের একটা সাধারণ গাছ।

প্রত্যেক বছর গাম্ভেরি এবং বান গঙ্গার জল উচ্ছ্বসিত হয়ে ঢুকে পড়ে কেওলাদিও ঘনা পার্কে। আর আজান বাঁধের সাহায্যে এই জল ধরে রাখা হয়। বৃষ্টির জলতো আছেই। এইভাবে ২৯ বর্গ কিমি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সারা বছর সমান জল থাকে না। শীতের পর থেকে শুকনো মরশুমে অনেকটা জায়গায় জল থাকে না। জলে এবং ডাঙ্গায় ঘাস, জঙ্গলের অভাব নেই। আর এসব ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে জন্তুগুলো। কেওলাদিও ঘনা পার্কে শুধু পাখি নয় সম্বর, স্পটেড ডিয়ার, নীলগাই ব্ল্যাকবাক ইত্যাদি জন্তু আছে। জানোয়ারও আছে। যেমন শেয়াল, মাছ খেকো বিড়াল, জংলী বিড়াল, খরগোস, ভোঁদড়, বেজি, গিরগিটি ইত্যাদি।

আঃ! কি উদাস করা হাওয়া! ছায়াছবির দৃশ্যকে হার মানায় কেওলাদিও ঘনা পক্ষী নিবাসের বাসিন্দাদের আচার আচরণ। হাওয়ার তালে উড়ে বেড়ায় পাখিগুলো। এ যেন পক্ষীদের স্বর্গরাজ্য।

আওয়াজ তোলে শন্ শন্।

এখানে আছে উদাস করা হাওয়া
হাওয়ায় দোলে গাছের শাখা
তারই সাথে দোলে, কখনো চুপ,
ধ্যান মগ্ন সারস পাখি;
হয়তো হঠাৎ করে ডানার
বাহার দেখাবে ব'লে উড়ে আসে খানিক।

চেয়ে চেয়ে দেখি, পেলিকানের সুদৃশ্য ডানা
হাওয়ার মাতলামির সাথে
তাল মেলাবে ব'লে হঠাৎ শূন্যে ভাসে;
বাবুই পাখি বাবলার ডালে বাসা বাঁধে
আর আকাশ পানে চেয়ে বলে
'ঐ দেখ! সাইবেরিয়ান ক্রেন আসে।'
এক পায়ে দাঁড়ানো এস আকারের গলা নিয়ে
ফ্লেমিংগো যখন মাছ শিকারের জন্যে দাঁড়ায়
তখনও হাওয়া জ্বালাতন করে,
এরই মধ্যে ফ্লেমিংগো ঠিক শিকার ধরে
এত ধরণের পাখির সঞ্চরন
আকাশে আওয়াজ তোলে—শন্ শন্।

আমি যেদিকে পাখি বেশি দেখছি সে দিকে ছুটে যাচ্ছি। এটা ঠিক নিয়ম নয়। পাখিরালয় দেখার নির্দিষ্ট ছক আছে। চারটি ট্রায়ালে ভাগ করা হয়েছে পার্ককে। মেইন গেট দিয়ে ঢুকে যে পাকা রাস্তা পশ্চিমদিকে কেওলাদিও মন্দিরের দিকে গেছে, সে রাস্তা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আজান বাঁধ পর্যন্ত যাওয়া যায়। ঐ দিকের জিপ রাস্তা বন্ধ থাকে যাতে পাখিদের বিরক্ত করা না হয়। সে ক্ষেত্রে শান্তি কুটীর থেকে শান্তি কুটীর বেরিয়ারের বক দেখা উচিত।

তারপর সোজা দক্ষিণ দিকে মন্দির পর্যন্ত সাইকেল রিক্সা কিংবা মিনিবাসে যাওয়া যায়। ওখান থেকে ১নং ট্রায়াল দর্শন করতে হয়।

১নং ট্রায়াল—রামবাঁধ ওয়াক ট্রায়াল। এই শান্তি কুটীর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বোট জেটি এবং বকের আস্তানা দেখা যায়। এখান থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে থাকলে ঈগল, চিতল হরিণ, কাল-ডাক, বন্য শুয়োর, নীলগাই দেখা যায়। এ ট্রায়ালের শেষ ফরেস্ট লজ পর্যন্ত। ২.৫ কিমি এর পরিধি।

২নং ট্রায়াল—ব্রজেন্দ্র বাঁধ ওয়াক ট্রায়াল। এটি শুরু হয় কেওলাদিও মন্দির থেকে ব্রজেন্দ্র বাঁধের দিকে। এ ট্রায়ালে বহিরাগত এবং স্থানীয় পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়। প্রথমে কেওলাদিও থেকে পাইথন পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে হয়। ওখান থেকে পাকা রাস্তা ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে কেওলাদিও পর্যন্ত। এ ট্রায়ালে পাইথন, সম্বর, নীলগাই চিতল হরিণ এবং জংলী বেড়াল দেখা যায়। এ ট্রায়ালের পরিধি ৬ কিমি।

৩ নং ট্রায়াল স্বপন মৌরি ওয়াক ট্রায়াল। শান্তিকুটীর থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বোট জেটি পর্যন্ত, আবার পশ্চিম দিকে টি জংশন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১ কিমি গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জীপ রাস্তা পর্যন্ত। স্বপন মৌরির পশ্চিমে আড়াই কিমি অর্থাৎ শান্তিকুটীর পর্যন্ত। মোট ৮কিমি এই ট্রায়ালের পরিধি।

পাখিরালয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কাটালাম। কোন রকম ক্লান্তি আসেনি। কেননা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন চমক ক্লান্তিকে হার মানিয়েছে। বাইরে এসে সাইকেলের ভাড়া মিটিয়ে এগজিবিশান হলে ঢুকি। মেইন গেটে টিকিট কাউন্টারের সঙ্গে রয়েছে এই প্রদর্শনী হলটি।

এখানে পাখিদের ছবি বাঁধানো আছে। ছবির পাশে পাখির নাম এবং সেই জাতের পাখির আচার-আচরণ, কোথা থেকে কখন আসে এইসব তথ্য জানা যায়। তাছাড়া পাখিরালয়ের পাখিদের পরিসংখ্যান এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য খবর জানা যায়।

পাখিরালয় দেখে আসি লোহাগড় দুর্গে।

লোহাগড় দুর্গ ঃ

নামের মধ্যেই যাদু। লোহার মত শক্ত দুর্গ। আসলে এর কৃত কৌশলের কারণে এত দুর্ভেদ্যতা সৃষ্টি হয়েছে যে ইংরেজগণ চারবার আক্রমণ করেও দুর্গের দখল নিতে পারেনি। এজন্যই ভরতপুর দুর্গের নাম লোহাগড় দুর্গ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইংরেজগণ ১৮২৬ সালে এই দুর্গটি নিজেদের দখলে আনতে পারেন।

ভরতপুরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা সুরযমলের বহু চিন্তা ভাবনার ফসল এই দুর্ভেদ্য দুর্গ। দুর্গের চারদিকে মাটির দেওয়াল। মাটির দেওয়ালের পরে ৬০ মিটার প্রশস্ত পরিখা। এই পরিখা আরও দুর্ভেদ্যতা বাড়িয়েছে। আর দেওয়ালের পরিধি ছিল ১২ কিমি। মাটির দেওয়াল হলেও কামানের গোলায় ভাঙ্গা যায়নি।

দুর্গের দুটি প্রবেশ পথ। উত্তরে অষ্টধাতী এবং দক্ষিণে লোহিয়া গেট। আর এই গেট দুটি জওহর সিং দিল্লী থেকে নিয়ে আসেন। দুর্গে ৮টি বুরুজ আছে। তার মধ্যে জওহর বুরুজটি তৈরি হয়েছিল মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধজয়ের প্রতীকস্বরূপ। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের

সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ তৈরি হয় ফতেপুর বুরুজ। এই বুরুজ দুটি দর্শনীয় বিষয়। জওহর জয়স্তম্ভের উপর থেকে সারা শহর সুন্দরভাবে দেখা যায়। ভরতপুরের জাঠরাজবংশের অভিষেক সম্পন্ন হত এই জওহররুজে।

দুর্গের মধ্যে আছে তিনটি প্রাসাদ। কিশোরী মহল, মহল খাস এবং কোটি খাস। রাজপ্রাসাদেই গড়ে উঠেছে মিউজিয়াম। এটি সরকারি সংগ্রহালয় নামে পরিচিত।

দুপুর সাড়ে বারটায় এসে পৌঁছাই ভরতপুর দুর্গে। জয়স্তম্ভ দেখে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছাই নগর উদ্যানে।

নগর উদ্যান ঃ

উদ্যানে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর একটি সুন্দর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। জলের ফোয়ারা গাছ-গাছালি এবং লতানো ফুলের গাছে সাজানো হয়েছে উদ্যান। উদ্যানে বেড়াতে আসা মানুষদের প্রয়োজনে খাবার স্টলও আছে।

উদ্যানের পরে মাটির বাঁধ এবং পরিখা। উদ্যানে কিছু সময় কাটিয়ে আসি মিউজিয়ামে। গভর্ণমেন্ট মিউজিয়াম, ভরতপুর, সকাল ১০টা থেকে ৪.৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে। সাত বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের টিকিট লাগে না। এছাড়া প্রত্যেকের জন্য প্রবেশ মূল্য ৩, শুক্রবার এবং সরকারি ছুটির দিনগুলোতে বন্ধ থাকে।

রাজকীয় সংগ্রহালয় ঃ

প্রথমে প্রবেশ করি ভাস্কর্য গ্যালারিতে। এই হলটিতে মহারাজাদের সময়ে আমদরবার বসত। হ'লে নেমীনাথজী, শান্তিনাথ, চকরেশভারি, পার্শ্বনাথজী আরো অনেক জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি শোভা পাচ্ছে। নেমিনাথজীর একটি মূর্তি ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের, এটি আনা হয়েছে কাটারা থেকে অন্যটি দশম শতাব্দীর মূর্তি। শান্তিনাথজীর মূর্তিটিও দশম শতাব্দীর। অবশ্য চকরেশভারির মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর মূর্তি। আর পার্শ্বনাথজীর কয়েকটি মূর্তি আছে। তার মধ্যে ১০২০ খৃষ্টাব্দে রায়ানা থেকে সংগৃহীত মূর্তিটি আকারে বড়।

জৈন ভাস্কর্যের পরের গ্যালারিতে রয়েছে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। বলরাম এবং বিষ্ণুর মূর্তি দুটি দ্বাদশ শতাব্দীর। এই মূর্তি দুটি পাওয়া গেছে বারাউলিতে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মূর্তি ভারুল। এটি দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্তি। একটি অখণ্ড পাথরে খোদাই করা হয়েছে। সপ্তমাতৃকা মূর্তি। অনুমান করা হচ্ছে ৭-১০ম শতাব্দীর মূর্তি। অবশ্য এর মাঝখানের অংশটি নেই। ফলে পাঁচটি নারীমূর্তি দেখা যাচ্ছে।

৯ম শতাব্দীর নবগ্রহ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এটি মলাদ থেকে সংগৃহীত ত্রয়োদশ শতাব্দীর খোদিত একটি স্তম্ভের একাংশ। এটি সংগৃহীত হয়েছে হিন্দোল থেকে। স্তম্ভের নিম্নাংশটিতে বিভিন্ন ভঙ্গীতে দন্ডায়মান নারী-মূর্তি। এছাড়া আরো অনেক ভাস্কর্য সংগ্রহালয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

ব্রহ্মা ৮ম শতাব্দীর মূর্তি, রায়ানা থেকে সংগৃহীত। শুর-সুন্দরী ১১-১২ শতাব্দীর মূর্তি।

দন্ডায়মান নারী দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্তি, রায়ানা থেকে সংগৃহীত। অম্বিকা এটিও দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য, তিমানগড় থেকে সংগৃহীত। এমন আরো অনেক মূর্তি শোভা পাচ্ছে সংগ্রহশালা।

আম দরবারের পিছনে রয়েছে হামাম মহল। হামাম মহল অর্থাৎ স্নান ঘর। মহারাণীর স্নান ঘরে রয়েছে পার্শীয়ান বাথ। দুটি আলাদা পাত্রে ঠান্ডা এবং গরম জলের ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজন মত গরম এবং ঠান্ডা জল মিশিয়ে রাণী স্নান করতেন।

স্নানের পরে রাণী একটা ঘরে সাজতেন। এটি ছিল সাজঘর। সেজে গুজে আর একটা ঘরে বিশ্রাম নিতেন। এরকম কয়েকটি ঘর নিয়ে হামাম মহল। হামাম মহলের উপরের গম্বুজ দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশের ব্যবস্থা ছিল। এই আলো সারা ঘরে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ত। এভাবে দিনের বেলা প্রকৃতির আলোয় আলোকিত থাকত হামাম মহল। এই ব্যবস্থা ছিল স্বাভাবিক কারণে। কেননা ৩০০ বছর আগে বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা ছিল না। হামাম মহলের দুষ্প্রাপ্য টালি এখন জ্বল জ্বল করছে।

হামাম ঘরের উল্টোদিকে ছিল হাতিশালা। এখন বন্ধ। আম দরবারের উল্টোদিকের, বিল্ডিং-এ মিউজিয়ামের বাকি অংশ। এই বিল্ডিং-এর দ্বিতলের মিউজিয়ামে ঢোকার মুখে দুদিকে দুটি তোপ বসানো আছে।

প্রিন্টিং সেকশান ঃ

এখানে হাতে আঁকা এবং ফটোগ্রাফিক ছবিতে দেব-দেবী এবং রাজস্থানের সাংস্কৃতিক, সামাজিক জীবনযাত্রার কথা, এমনকি রাজপুতদের কথা জানা যায়। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হোলি, লঙ্কাকান্ড, রাধাকৃষ্ণ বহু ছবি। আবার মাইকা পেপারে হাতে আঁকা ছবি। যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলা, বিষ্ণু অবতার এবং দশাবতারের অনবদ্য ছবি।

আবার রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের পুরুষানুক্রমিক বাঁধাই ছবি।

আর্টগ্যালারি

এই গ্যালারিতে কাচের পাত্র, মহারাজাদের ছবি, কসমেটিক বাক্স, পাথরের তৈরি আসবাবপত্র, কত কি! বেশ বড় সাইজের তামার তৈরি একটি গামলা এবং একটি জগ। পিতলের তৈরি কলসি, মাটির তৈরি ফল, গিরিরাজ মন্দিরের মডেল। তামার তৈরি হাতি, ঘোড়া, হরিণ, বক এবং বাসন। কত কি প্রদর্শিত হচ্ছে।

পাশের গ্যালারিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে এক বড় আকারের কুমীর। এখান থেকে আসি শিলেখানা।

শিলেখানা—মহারাজাদের সময়কার অস্ত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। ঢাল তলোয়ার, বন্দুক, মিনিয়েচার ক্যানন, ডেগার, তীর ধনুক, সড়কি, রিভলবার—বিভিন্ন মডেলের রিভলবার। এছাড়া যোদ্ধাদের অবয়ব। বড় ছোট মাঝারি হরেক রকম বন্দুক। পুরানো দিনের এসব অস্ত্রের মধ্যে দু'মানুষ সমান লম্বা বন্দুক দেখে অবাক হতে হয়। কি করে এসব বন্দুক ব্যবহার হত! প্রহরীগন বললেন—এই যে লম্বা ব্যারেলের বন্দুকটি দেখছেন এর নাম রামচন্দ্রীবন্দুক। এই বন্দুক মাটিতে গেড়ে ব্যবহার করা হত।

মিউজিয়াম দেখে ফিরে আসি ধরমশালায়। সন্ধ্যার সময় ভরতপুর রেল স্টেশানে আসি। ব্রড গেজ এবং মিটার গেজ লাইনের অনেক ট্রেন চলাচল করে ভরতপুরের উপর দিয়ে। যেমন—

ব্রডগেজ ঃ

আপ। ব্র্যাকেটে ট্রেন ছাড়ার সময়।

১৯২০ এক্সপ্রেস, দেরাদুন থেকে মুম্বাই (১.৫০), ৫৬ প্যাসেঞ্জার মথুরা থেকে রতলম (৫.২০)। ১২৮ এবং ৫২ শাট্‌ল, মথুরা থেকে রায়ানা (৬.৫৫ এবং ১৫.৩০)। ২৯০৪ গোল্ডেন টেম্পল মেল, অমৃতসর থেকে মুম্বাই (১০.৫০)। ৯০২৪ জনতা এক্সপ্রেস, ফিরোজপুর থেকে মুম্বাই (১৮.২০) এবং ২৯২৬ পশ্চিম এক্সপ্রেস (১৯.৫০) অমৃতসর থেকে মুম্বাই যায়।

ডাউন। ব্র্যাকেটে ট্রেন ছাড়ার সময়।

৯০১৯ এক্সপ্রেস মুম্বাই থেকে দেরাদুন (০০.৫৫)। ২৯২৫ পশ্চিম এক্সপ্রেস, মুম্বাই থেকে অমৃতসর (৬.৩১)। ৯০২৩ জনতা এক্সপ্রেস (৮.১৫)। ৫১ এবং ১২৭ শাট্‌ল, রায়ানা থেকে মথুরা (৯.৪৫) এবং (১৮.৪৫)। ২৯০৩ গোল্ডেন টেম্পল মেল, মুম্বাই থেকে অমৃতসর (১৫.৩৫)। ৫৫ প্যাসেঞ্জার রতলম থেকে মথুরা (২২.৩৫)।

মিটার গেজ ঃ

আপ। ব্র্যাকেটে ট্রেন ছাড়ার সময়।

২০৭ প্যাসেঞ্জার, আগ্রা ফোর্ট থেকে বান্দিকুই (১০.০০), ১০১ প্যাসেঞ্জার, আগ্রা ফোর্ট থেকে বান্দিকুই (১৭.৩০)। ১১৭ কাশগঞ্জ থেকে ভরতপুর।

ডাউন। ব্র্যাকেটে ট্রেন ছাড়ার সময়।

১০২ প্যাসেঞ্জার, বান্দিকুই থেকে আগ্রা ফোর্ট (৯.১৫)। ১১৮ প্যাসেঞ্জার, ভরতপুর থেকে কাশগঞ্জ (১৪.৪৫)। ২০৮ বান্দিকুই থেকে আগ্রা ফোর্ট (১৬.৪০)।

ফিরে আসি ধরমশালায়। আগামী দিন যাব দীগ-এ। সুতরাং তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি।

বার

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮। সকাল ছটায় পথে বেরিয়ে পড়ি। শহরের উত্তর দিকে রয়েছে রেল স্টেশান। প্রথমে ভরতপুর শহরের পশ্চিমদিকে বাস স্ট্যান্ডে যাব। সেখান থেকে বাসে দীগ। ভরতপুর থেকে দীগের দূরত্ব ৩৬ কিমি। আলোয়ার থেকে আসার পথে পড়েছিল দীগ। তখন নামিনি। কেননা দীগে থাকার ব্যবস্থা খুব একটা ভাল নেই।

দিল্লীগামী বাস দীগ হয়ে যায়। ভাড়া ১৫ টাকা। সকাল ৮টায় এসে পৌঁছাই দীগ।

দীগ ঃ

২৭.২৫ অক্ষাংশ এবং ৭৭.১৫ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ভরতপুরের একটি জাঠ দুর্গ।

ভরতপুর মহারাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী। গ্রীষ্মের দাবদাহের সময় আরাম পাওয়ার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, পুষ্করিণী, উদ্যান। ক্রমে গড়ে উঠে শহর। বর্ণময় বাজার উদ্যান এবং জলের ফোয়ারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত দীগের তেমন একটা খ্যাতি ছিল না। মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন আগ্রা প্রদেশের অখ্যাত এবং অজ্ঞাত গ্রাম ছিল দীগ। ১৬৮৬ থেকে ১৬৮৮ সালের মধ্যে রাজা রামের নেতৃত্বে জাট কৃষকগণ মুঘলদের অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। জাঠ কৃষকদের এ লড়াইয়ে পরবর্ত্তীকালে বদন সিং নেতৃত্ব দেন। ট্রাইবালদের দলপতি হিসাবে তাঁর কর্তৃত্ব কয়েকটি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। তিনি স্বাধীন রাজা হন। ১৭১২-১৭৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

তাঁর রাজত্ব কালে দীগের উন্নতি হতে থাকে। তিনি দীগকে জাঠ রাজত্বের কেন্দ্রস্থল হিসাবে বেছে নেন। ক্রমে দীগকে কেন্দ্র করে কিশানপুর, মালপুর এবং শাহপুর পর্যন্ত নতুন রাজধানী বিস্তৃত করেন।

বদন সিং প্রথম যে প্রাসাদটি তৈরি করেন সেটি এখন পুরানা মহল বলে পরিচিত। বদন সিং-এর পুত্র সুরযমলের রাজত্বকালে ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত দীগের সর্বাধিক উন্নতি হয়। তিনি ভরতপুরের মত দ্বিতীয় রাজধানী দীগের উন্নতি করেন। তিনি গোপাল ভবন এবং কিষাণ ভবন তৈরি করেন। আর গোপাল সাগর নামে একটি পুষ্করিণী খনন করেন। হরদেব ভবনের পুনঃনির্মাণ এবং জলের ট্যাঙ্ক স্থাপন করেন। সুরযমলের রাজত্ব কালে তার ভাই রুপ সিং রূপসাগর নামে পুষ্করিণীটি খনন করেন।

সুরযমলের মৃত্যুর পর তার পুত্র জওয়াহর সিং ১৭৬৪-১৭৬৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সুরযভবন সহ আরো কয়েকটি ভবন তৈরি করেন এবং জলের ফোয়ারা লাগিয়ে বাগিচার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের বহু মূল্যবান বস্তু লুঠ করে এনে নিজের শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। পেত্রাডুরা নক্সার মার্বেল এনে ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। ১৭৬৮ সালে তিনি আগ্রায় নিহত হন। তার অকাল মৃত্যুতে সুরযমলের সময়কার কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

জওয়াহার সিং এর মৃত্যুর পর ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত দীগ মুঘলদের শাসনাধীনে ছিল। তারপর ১৭৮৭ সালে জাঠ রাজপুত রঞ্জিত সিং-এর হাতে প্রত্যার্পণ করা হয়। শেষ মেষ ১৮০৪ সালে ইংরেজগণ দীগের দখল নেয় এবং ১৮০৫ সালে পুনরায় রঞ্জিত সিং দীগের শাসন ক্ষমতা ফিরে পান। তাহলেও আর বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি দীগের। শুধু ভরতপুর মহারাজাদের বসবাসের প্রয়োজনে ভবন গুলোর সামান্য ভাঙ্গা গড়া হয়।

[সংবাদ সুত্র—আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া।]

বাস থেকে নেমে সোজা চলে আসি দীগ শহরের উত্তর দিকের সিংহ পোলে। সিংহ পোলের উপরের দিকে আর্চ করা। দু'পাশের স্তম্ভের উপর দুটি সিংহ মূর্তি। এ ছাড়া তোরণ

গাত্রে গাভি সহ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যমূর্তি। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ময়ূরের নাচ। শ্রীগণেশ ও তাঁর পরিচর্যাকারি দুজন নারী মূর্তি সিংহ দরজায় শোভা পাচ্ছে।

খিলানের নিচে লোহার গেট। গেট দিয়ে ঢুকি ভিতরে। রাস্তা ধরে এগোতে থাকি দক্ষিণ দিকে। সামনে পড়ল গোপাল ভবন। অবশ্য গোপাল ভবনের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি মন্ডপ আছে। উত্তরে সাভন এবং দক্ষিণে ভাদুন। খোলা-মেলা মন্ডপ।

গোপাল ভবনের সামনে দাঁড়ালে দীগ শহরের অনেকখানি দেখা যায়। গোপাল ভবনের সামনের অর্থাৎ পূর্ব দিকে মুঘল রীতিতে তৈরি বাগিচা। এই কেন্দ্রীয় বাগিচার চারদিকে বিভিন্ন মহল। কেন্দ্রীয় বাগিচার পূর্বদিকে রূপ সাগর। আর গোপাল ভবনের পশ্চিমে গোপাল সাগর এবং রানী বাগিচা। গোপাল ভবনের দক্ষিণে সুরয ভবন। তারও দক্ষিণে রয়েছে হরদেব ভবন এবং পুরানা মহল।

রূপসাগর এবং গোপাল সাগরের মাঝখানে অনেকটা খোলা মেলা জায়গায় গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় বাগিচা। বাগিচাতে চতুর্মুখী জল সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় জলাধার থেকে চতুর্দিকে পাইপ দিয়ে জল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইসব পাইপের সঙ্গে জলের ফোয়ারার সংযোগ রয়েছে।

এই চতুর্মুখী চ্যানেলের চারদিকে গড়ে তোলা হয়েছে ভবন এবং আয়তক্ষেত্রাকার বাগিচা। বাগিচার পূর্বদিকে কেশব ভবন। পশ্চিমে গোপাল ভবন এবং উন্মুক্ত দুটি মন্ডপ। দক্ষিণে কিষাণ ভবন এবং উত্তরে নন্দ ভবন।

মুঘল রীতির অনুকূলে গড়ে তোলা হয়েছে বাগিচা, জলসরবরাহ ব্যবস্থা এবং ভবন। ভবন গুলো কোথাও মুঘল রীতি, কোথাও রাজ রীতি, আবার কোথাও উভয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। তবে দীগ শহরে যতগুলো বাগিচা আছে সবই কেন্দ্রীয় বাগিচার ধাঁচে গড়া।

এবার আসি ভবনগুলোর কথায়।

গোপাল ভবন ঃ

খুব প্রশংসার দাবী রাখে এই ভবনটি। সামনের দিক দেখে মনে হয় একতলা বাড়ি। আসলে এক তলা থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত রয়েছে ভবনটির মধ্যে। এই ভবনটি গোপাল সাগরের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। ভবনের সামনের দিক পূর্ব দিকে মুখ করা। পিছনটা রয়েছে গোপাল সাগরের মধ্যে। গোপাল সাগর থেকে তলাগুলো উঠতে থাকে। ফলে প্রথম তলাটি রয়েছে জলের তলায়।

স্বাভাবিক কারণে গোপাল ভবনের দুদিকের উন্মুক্ত মন্ডপ সহ ভবনের বারান্দার ছায়া গোপাল সাগরের জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে এক অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

সামনের দিক দিয়ে গোপাল ভবনে প্রবেশ করলে প্রথমে নজরে পড়ে ৬২১৮ × ১৮৯০ মিটার আয়তকার একটি বিরাট হলঘর। এর উচ্চতা ৯.৭৫ মিটার। এর মধ্যে ২৩·১৬ × ১৭·৭৬

মিটার কক্ষটি ছিল মহারাজাদের সময়ের অভ্যর্থনাকক্ষ। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দিওয়ান-ই-আম এর রীতিতে তৈরি।

অভ্যর্থনা কক্ষটি দ্বিতল সমান উঁচু। এর পিছনে কোথাও ত্রিতল, কোথাও চতুর্থতল রয়েছে। জলের দিকে দ্বিতল পর্যন্ত গরমের দিনে ঠান্ডার ব্যবস্থা থাকত এবং মাছ ধরা ও বিশ্রামের জন্য ব্যবহৃত হত।

এই হল ঘরে প্রাকৃতিক ভাবে আলো হাওয়া ঢোকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। ছাদের মধ্যমার দুদিকে ছোট দুই অংশ। নিচে রাজোচিত দরজা এবং স্তম্ভ। এই কক্ষের পাশে এবং পিছনে অনেকগুলো ছোট ছোট কক্ষ রয়েছে। কোনটিতে স্নানের জন্য জলের চৌবাচ্চা এবং পুরানো দিনের ঝরনার ব্যবস্থা রয়েছে। কোথাও বা খাবারের ব্যবস্থা।

খাবার ঘরে ভারতীয় এবং ইউরোপিয়ান অতিথিদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। এইসব কক্ষ এবং রাজাদের বিলাসবহুল ব্যবস্থা আজকের দিনে জনসাধারণকে প্রদর্শন করা হচ্ছে। সুতরাং গোপাল ভবন আজ মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে।

মিউজিয়াম ঃ

অভ্যর্থনা কক্ষে ব্রজেন্দ্র সিং এবং তাঁর পিতা কৃষাণ সিং-এর বাঁধানো ফটো রয়েছে। তাদের ব্যবহৃত খাট বিছানাপত্র, বসার সোফা কাম বেড, আলমারি, চেয়ার টেবিল রাজাদের সময়ে যেমন যেখানে ছিল সেভাবে সাজানো আছে। ছাদ থেকে ঝুলছে হাতে টানা পাখা এবং ঝাড়বাতি। পাথরের তৈরি নর্তকী, বাদ্যবাদক, এমন আরো অনেক দ্রব্য সামগ্রী সাজান আছে।

চতুর্থ তলে মহারাজাদের মহলে চেয়ার, টেবিল, খাট, বড় আয়না এবং কাঠের আলমারি, সুসজ্জিত। মহারাজা ব্রজেন সিং এইসব কাঠের জিনিস মহীশূর থেকে নিয়ে আসেন। এখানে মহলের দেওয়ালে কাঠ এবং পাথরের আলাদা জালির কাজ দেখতে একই রকম। দর্শককে ধন্দে পড়তে হয় কোনটি কাঠের আর কোনটি পাথরের।

ভবনের ডানদিকের অংশে রয়েছে রাণীর মহল। রাণীর কক্ষের নিচে থাকত রাণীর দাসীগণ। উপরের ডানদিকের একটি কক্ষে কালো অখণ্ড পাথরের তৈরি খাট এবং বামদিকের একটি কক্ষে রয়েছে অখণ্ড শ্বেত পাথরের তৈরি খাট। মহারাজা জওয়াহর সিং ১৭৬৮ সালে দিল্লী থেকে খাট দুটি নিয়ে আসেন।

মুঘল সম্রাটদের মৃত্যুর পর মরদেহ কালো পাথরের খাটে বসিয়ে স্নান করান হত। তার পর সাদা পাথরের খাটটিতে করে সম্রাটদের মরদেহ কবর স্থানে নিয়ে যাওয়া হত। মিউজিয়াম দর্শন শেষ।

বাইরে আসি। গোপাল ভবনের সামনে মসৃণ পাথরের তৈরি একটি দোলনা আছে। দোলনাটির দুদিকে দুটি পাথরের সরু স্ট্যান্ড, উপরে বাঁকানো খিলানের মত। দোলনাটির

নাম হিন্দোল। মহারাজা জওয়াহর সিং হিন্দোলটি যুদ্ধ বিজয়ের স্মারক স্বরূপ দিল্লী থেকে নিয়ে আসেন।

দোলনার সামনে দাঁড়িয়ে ডায়েরি লিখছি এমন সময় একজন স্থানীয় যুবক উৎসুক হয়ে জানতে চাইল, আমি কি লিখছি? প্রত্যুত্তরে যুবকটিকে দীগ সম্বন্ধে যা কিছু দেখছি এবং জানতে পারছি এসব লিখছি বলায় তিনি একটু মুচকি হাসেন। তারপর তিনি আমায় প্রশ্ন করেন—আপনি কি জানেন এই দোলনাটি এক সময় সাজাহান পত্নী মমতাজ ব্যবহার করতেন?

আমি অবাক হয়ে যাই। মিউজিয়াম দেখার সময় গাইড বলেছিলেন, এই দোলনাটি মহারাজা জওয়াহর সিং দিল্লী থেকে এনেছিলেন, কিন্তু যুবকটি দেখছি আরো বেশি জানে। স্বাভাবিক কারণে, তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হই এবং জানতে চাই,

— আপনি কি করেন?

— আমি দীগ প্যালেস মিউজিয়ামে কাজ করি।

— আচ্ছা, যদি কিছু না মনে করেন আপনার নামটা বলবেন?

— কে এস যাদব।

— ধন্যবাদ, আপনার পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম। নিশ্চয় দীগ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানতে পারব।

— ধন্যবাদ, চলুন আপনাকে শহর ঘুরিয়ে দেখাব।

এরপর মিঃ যাদব আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে মিউজিয়ামে গেল তার অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে। কিছুক্ষণ পর যাদব ফিরে এলেন এবং বললেন কিছু সময় চেয়ে নিলাম বসের কাছে। চলুন। এখন আমরা চলেছি গোপালভবনের দক্ষিণ দিকে। বাগিচার পথ ধরে আমরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়ি সুরয ভবনে।

সুরয ভবন ঃ

মহারাজা সুরযমলের নামে উৎসর্গীকৃত ভবন। মার্বেল পাথরে তৈরি একতলা ভবন। চতুষ্কোনাকার ভবনটি মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে গড়া। ২৬.০০ মিটার বর্গক্ষেত্রাকার এবং ৬.৭০ মিটার উচ্চ প্রাসাদটির গঠন শৈলি মনোমুগ্ধকর এবং চমৎকার। শ্বেত পাথরে তৈরি এমন সুন্দর ভবন খুব কম দেখা যায়।

চতুর্মুখী ভবনটির প্রত্যেক দিকে বারান্দা এবং পাঁচটি বক্রাকার খোলা খিলান আছে। বারান্দার দুদিকে দুটি ছোট কামরা। কামরাগুলোর উপরে অর্ধ গোলাকার সজ্জিত ছাদ। মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে পদ্মফুলের চতুর্দিকে বিভিন্ন নক্সা।

প্রত্যেক বারান্দার মেঝেতে রয়েছে একটি করে জলের ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কগুলোতে জলের ফোয়ারার ব্যবস্থা ছিল। আজ যদিও শুধু গঠনটাই অবশিষ্ট আছে। মনে হয় এক সময় নৈসর্গীক সৌন্দর্য সৃষ্টি করত এই ফোয়ারাগুলো। বারান্দার ... হলো অর্থাৎ মূল প্রাসাদের

মেঝে বারান্দার মেঝে থেকে ০.৯১ মিটার উঁচু। এই মেঝের মধ্যমণি একটি বড় কক্ষ। আবার এই কক্ষের মধ্যে রয়েছে চারটি ছোট ছোট কুঠরি এবং তার সংলগ্ন বারান্দা। এখানে সর্বত্র পেত্রাড়ুরা নক্সা আঁকা।

ভবনের প্রধান কক্ষটিতে প্রাকৃতিক আলো আসার ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই আলোতে মূল কক্ষ এবং বারান্দা আলোকিত হয়। কারিগরিবিদ্যা যুগের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত হয়। হয়তো দু-তিনশ বছর আগে আজকের মত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল না বলেই প্রাকৃতিক আলোর উপর নির্ভর করতে হত। সুরয ভবনের ভিতরের ব্যবস্থা দেখে মনে হয় ভবনটি মহিলাদের আমোদপ্রমোদ এবং বিশ্রামের জন্য ব্যবহৃত হত।

ভবনের ভিতর এবং বাইরেটা দেখে পশ্চিম দিকে আসি। ভবনের পশ্চিম বারান্দার থামগুলোর পাথর ভবনের অন্য পাথরের থেকে অনেক তফাৎ। মিঃ যাদব বল্লেন 'এই ভবনের পাথরগুলো দিল্লী থেকে আনা। লালকেল্লার রয়াল স্কুল ভেঙ্গে মহারাজা জওয়াহার সিং পাথরগুলো নিয়ে আসেন। পাথরগুলো রয়াল স্কুলে যেভাবে লাগানো হয়েছিল সেভাবেই সুরযভবনে লাগানো হয়েছে। দিল্লী থেকে আনার পথে কিছু পাথর নষ্ট হওয়ায় সুরয ভবন নির্মাণের শেষ দিকে স্থানীয় পাথরের দরকার হয়। ফলে ভবনের পশ্চিম দিকের স্তম্ভ এবং ব্র্যাকেটের পাথরের রং আলাদা।

গোপাল সাগরের পূর্ব পাড় ধরে দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকি। গোপাল সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়ে সুরয ভবনে ঢোকার দরজা আছে। এই দরজাকে বলে সুরয গেট। সুরয গেট ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে হরদেব ভবন চত্বরে এসে পড়ি। হরদেব ভবনে ঢোকার মুখে দেখি একটি পাথরের ফলক। ফলকে লেখা আছে।

The Hardev Bhawan

The situation and set up of this Bhawan suggests that it was not an original part of main Bhawan and was Probably after addition by surajmal (A.D. 1756-63) to suit his taste and requirements. The Principal southern Block Double storeyed while the lower floor consists of A Projecting general Hall Faced with arches springing from a row of double pillars. ......

ফলকে আরো অনেক কথাই লেখা আছে। আমার দেরী হচ্ছে দেখে আমার সাথী আমাকে ডাকেন—মিঃ দাস আসুন, আমি বলছি। আমি কাছে আসতে তিনি বলতে শুরু করেন—

'দেখছেন চতুর্ভূজাকার বাগিচার তিন দিকে ভবন। আগে কিন্তু বাগিচার চার দিকেই ভবন ছিল। মহারাজা জওয়াহার সিং উত্তর দিকের ভবন ভেঙ্গে ফেলেন, 'সুরয ভবনের প্রয়োজনে।'

মধ্য যুগে ভারতবর্ষে রাজা মহারাজাগণ চতুর্ভুজাকার বাগিচার চারদিকে ভবন তৈরি করতেন। মুঘল বাদশাগণ অবশ্যই এই রীতি মেনে চলতেন।

হরদেব ভবন একটা কোণেই গড়ে উঠেছিল। মহারাজা সুরযমল তার প্রয়োজনে এই ভবনের সংযোজন করেন। যথা সম্ভব ভবনের পিছনের দিকে আদি হরদেব ভবন ছিল।

দেখা যাচ্ছে মুখ্য অট্টালিকাটি দ্বিতল ভবন। এটি রয়েছে দক্ষিণ দিকে। চিত্তাকর্ষক এবং গরিমাময় ভবন। সামনের বাগিচার জন্য আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ভবনের নিচের তলাতে রয়েছে একটি বড় হলঘর। এই ঘরের সামনের সারিতে রয়েছে জোড়া স্তম্ভ। প্রতি দুই স্তম্ভের বিপরীত দিকের বা মুখোমুখি দুটি স্তম্ভের মধ্যে গড়ে উঠেছে খিলান।

হল ঘরের পিছনে রয়েছে আয়তক্ষেত্রাকার বারান্দা। বারান্দার উঁচু মেঝে এবং গম্বুজ বিশিষ্ট ছোট কুঠরি আছে। আবার হলের দুদিকে রয়েছে আয়তাকার কক্ষ এবং বারান্দা। এই বারান্দাতেও গড়ে উঠেছে ছোট কুঠরি। আর ভবনের পূর্ব দিকে রয়েছে দ্বিতলে উঠার পথ। সিঁড়ি পথের দুদিকে দুটি স্তম্ভের উপর সমতল ছাদ, ছাদের পিছনে রয়েছে ছত্রী। ছত্রীর বক্রাকার ছাদে শোভা পাচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি পার্শ্ব গম্বুজ।

উপর তলায় একেবারে পিছনের দিকে একটা সরু গ্যালারিতে দেখা যাচ্ছে তীর্যকভাবে লাগানো জালির পর্দা। দেখে শুনে মনে হয় রাজমহিষীগণ এই ঘরগুলো ব্যবহার করতেন।

হরদেব ভবনের অন্য দুপাশে গড়ে উঠেছে সাধারণ মানের ঘর এবং বারান্দা। আবার পূর্ব দিকে রয়েছে দোতলা বিল্ডিং। তবে তেমন একটা কারুকার্য করা নয়। মনে হয়েছে মহারাজা সুরয সিং ট্রাস্টির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতেন এই ভবন। হরদেব ভবনের উত্তর দিকে এবং সুরয ভবনের পূর্ব দিকে গড়ে তোলা হয়েছে কিষাণ ভবন।

কিষাণ ভবন ঃ

শিল্প নৈপুণ্যে ভরা এই ভবনের কারুকার্য দেখার মত। সুসজ্জিত ভবনটির কারুকার্য যে কোন দর্শককে মোহিত করে। পাঁচটি তোরণের বৃহৎ কপাটের প্যানেল এবং কাঠামো দেখে অবাক হতে হয়। কত সূক্ষ্ম কাজ!

ছাদের উপর রয়েছে একটি বড় জলের ট্যাঙ্ক। মহারাজা সুরযমল যে কটা জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করেছেন, তার মধ্যে এটি বৃহৎ। এই ট্যাঙ্কের তেরটি জলের উৎস মুখ আছে। ছাদের তিনটি অভিক্ষেপনের জন্য কাঠামোগত সৌন্দর্য বেড়েছে।

তোরণগুলোর সঙ্গে (১৯.২০ মি × ১৬.৪৫ মি.) এর একটি হলঘরের সংযোগ রয়েছে। ঢেউ খেলানো সিলিং-এ পত্রগুচ্ছ, খোদাই করা ময়ূর এবং ফুলের গাছ খোদিত হয়েছে। আঃ এত সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে এখানে! হলের দুদিকে দুটি ছোট ঘর এবং পিছনের দিকে লম্বা বারান্দা। এই বারান্দার উঁচু মেঝেতে রয়েছে একটা ছোট কুঠরি। আরো যে কত রকমের গঠনগত সৌন্দর্য রয়েছে বলার নয়। বিশেষ করে দক্ষিণ দিকের জালির কাজ অসাধারণ।

কিষাণ ভবনের সামনে বাগিচা। বাগিচার পথ ধরে এগোতে থাকি রূপসাগরের দিকে। রূপসাগরের পশ্চিম পাড়ে রয়েছে কেশব ভবন।

কেশব ভবন ঃ

গোপাল ভবনের পূর্ব দিকে বাগিচার শেষ সীমানায় এবং রূপসাগরের পশ্চিম পাড়ে গড়ে তোলা হয়েছে কেশব ভবন। কেশব ভবনের পরে রূপ সাগরের ঘাট এবং রূপসাগর। এই একতলা জলমণ্ডপটির নিচের দিক খোলা। খোলা মেলা হলেও দুটি স্তম্ভের মধ্যে উপরের দিকে রয়েছে খিলান। প্রত্যেক দিকে এরকম পাঁচটি খিলান বা তোরণ রয়েছে। খোলা থাকার জন্য নিচে, মেঝে এবং ছাদের নিচে সর্বত্র বাইরের প্রাকৃতিক আলো ঢোকে।

এই জলমণ্ডপটির ছাদ এক অভিনব কায়দায় গড়া। চারদিকে থামের উপর দিকে খিলান শ্রেণী থাকায় থামের উপর দিকে দেওয়াল তৈরি হয়েছে। উপরে একটি ছাদ এবং থামের উপরে খিলানের মাথা বরাবর আর একটি ছাদ। এই দুই ছাদ-এর মধ্যে ছাদের শেষ সীমায় দেওয়াল অবলম্বন গড়ে উঠেছে ত্রিকোনাকার জলের ট্যাঙ্ক।

জলমণ্ডপটি যে থামগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে কয়েকটি ফাঁপা। এই ফাঁপা থামগুলো দিয়ে জলের পাইপ উপরের ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত। ০.৯১ মিটার ব্যাসের নল দিয়ে সেচন করা যাচ্ছে এই ট্যাঙ্ক। এই ভাবে তৈরি হয়েছে জলের পয়োনালী। এই পয়োনালীর সঙ্গে জলের ফোয়ারা যুক্ত করা হয়েছে।

ছাদের নিচে মণ্ডপের মধ্যস্থলে এবং মেঝের চারদিকে জলের ফোয়ারা। ফলে বাইরে থেকে পাইপ লাইন দিয়ে জল এলে ফোয়ারার সাহায্যে বৃষ্টিধারা সৃষ্টি হয়। ভাবুন কি অপার সৌন্দর্যের সৃষ্টি হত এই ফোয়ারার ধারার সাহায্যে! শুধু কি তাই! উপরে ঐ যে জলের ট্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে সেখানে অনেকগুলো পাথরের বল রাখা আছে। জলের চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বল গুলো গড়াগড়ি খায় আর মেঘের মত গর্জন শুরু হয়। এভাবে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম বর্ষা

সারা রাজস্থানে যখন বিন্দু বৃষ্টি হয় না তখন এই দীগ শহরের কেশব ভবনে নেমে আসে বৃষ্টির বন্যা। মহারাজদের সময়ে নাকি বৃষ্টি ধারার মধ্যে সুন্দরীরা নাচত। ভাবুন, স্বর্গের সুখ ছিল মহারাজাদের হাতের মুঠোয়।

কেশব ভবনের পশ্চিম দিকে গড়ে তোলা হয়েছে নন্দন ভবন। আমার সাথী বললেন—ঐ যে নন্দন ভবন দেখছেন ওখানে এক সময় কুস্তি এবং মল্ল যুদ্ধ হত। চলুন নন্দন ভবনে যাই।

নন্দন ভবন ঃ

৪৫ × ২৬ মিটার আয়তাকার হল ঘর। এর মধ্যে দর্শকদের বসার ব্যবস্থাও ছিল। হলটি ভিতর এবং বাইরের দুটি অংশে বিভক্ত। ৭টি খিলান এবং স্তম্ভের মধ্যে আয়তক্ষেত্রাকার ভিতরের অংশে কাঠের ছাদ। দিল্লী দেওয়ান -ই-খাস-এর মত সুশোভিত।

ভবনের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় এবং মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে নক্সা আঁকা।

নন্দন ভবন দেখে আসি পুরানা মহলে।

পুরানা মহল ঃ

পুরানা মহলটি রূপসাগরের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত। কিসাণ ভবনের লাগোয়া ভবনটি তৈরি করেন মহারাজা বদন সিং। আয়তক্ষেত্রাকার বাড়িটির কোথাও দোতলা আবার কোথাও তিনতলা। সাধারণ ভাবে দোতলা বাড়ির ছাদে তৈরি হয়েছে ঘর। আর ছাদের ছত্রীর মনহরণকারি কারুকার্য যে কোন দর্শককে মুগ্ধ করে।

বাড়ির প্রবেশ কক্ষ এবং অন্যান্য ঘরের দেওয়াল ও সিলিং-এ অঙ্কিত চিত্রগুলো খুব আকর্ষণীয়। প্রাসাদের প্রবেশ কক্ষের চিত্রগুলো মুঘল এবং রাজপুত ঘরানার চিত্র। বিশেষ করে সিলিং এর চিত্রগুলো খুব জনপ্রিয় চিত্র। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে চিত্র, হাতি, ঘোড়া এবং অনেক আকর্ষণীয় চিত্র এখনও উজ্জ্বল। তবে অনেক জায়গায় দেওয়াল চিত্রগুলো নষ্ট হবার পথে।

পুরানা মহলের ছাদ থেকে গড়ে উঠেছে কয়েকটি ছত্রী। এমনিতে পুরানা মহল দ্বিতল বাড়ি। কিন্তু এই ছত্রীগুলোর জন্য কোন কোন জায়গায় তিনতলা হয়েছে। আর এই ছত্রীগুলোর ছাদ অর্ধ চন্দ্রাকার, বক্র। বক্রাকার ছাদের উপর রঙিন সূচালো লোহার শলাকা। সব মিলিয়ে অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে ছত্রী-গুলো।

পুরানা মহলের ছাদ থেকে দেখা যাচ্ছে শীষ মহল। রূপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পুরানা মহল। আর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শীষ মহল। তারও পরে দুর্গ। আমার সাথী বললেন-- আমরা আর ওদিকে যাব না। শীষ মহলটি তৈরি করেন মহারাজা সুরজমলের ছেলে নভাল সিং। প্রাসাদটির কাচের কাজ বিখ্যাত। বর্তমানে এই ভবনটি সরকারি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফিরে আসি গোপাল ভবনের সামনে। এখানে হিন্দোলা অর্থাৎ শ্বেত পাথরের দোলনার সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ যাদবের সঙ্গে ছবি তুলি। এই ছবি গুলোই ছিল আমার পথের বন্ধুর সঙ্গে সখ্যতার নিদর্শন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আগ্রা শহরে ঘোরাঘুরির সময় বাসের মধ্যে আমার ক্যামেরাটি চুরি হয়ে যায়। ফলে দুর্লভ ছবিগুলো হারাতে হল।

ভ্রমণ পিপাসু বন্ধু, নিশ্চয় মনে আছে রাজপুতানা রাজস্থানের দ্বিতীয় পর্বের সুলুক সন্ধানের জন্য পথে বের হবার পর প্রথমে হাওড়া রেল স্টেশনে মানি ব্যাগটি চুরি যায়। আবার যাত্রার শেষে আগ্রা শহরে ক্যামেরাটিও চুরি যায়। পদ্মফুলের কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলেও ফুল চয়নকারি পদ্মফুলের সৌন্দর্যে মোহিত হন। আমিও তেমনি সুখী। কেননা রাজপুতানা রাজস্থানে ভ্রমণে বেরিয়ে অনেক কিছু চুরি গেলেও অনেক কিছু পাওয়ার আনন্দে সে বেদনার লাঘব হয়।

রাজস্থান ভ্রমণের শেষের দিকে বুঝতে পারছি আমি খনি থেকে মণি তুলতে পেরেছি।

কেননা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেমন আনন্দ পেয়েছি তেমনি অজানাকে জেনে সমৃদ্ধ হয়েছে আমার জ্ঞান ভান্ডার। আর রাজস্থানের পথে পথে পেয়েছি মানুষের ভালবাসা। কেউ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেউবা করেছেন সহযোগিতা। ভ্রমণের মধ্যে পেলাম সোনালী সূর্যের আলো।

সোনালী সূর্যের আলো

আমি খুঁজে পেয়েছি সরিসকার বনে
এবং শান্ত সুন্দর দীগ শহরের লনে
সোনালী সূর্যের আলো
জেনেছি কিছু মানুষ এখনো আছে ভালো
তারা পথিককে ডেকে দেয় তৃষ্ণার জল
যেমন বৃক্ষ দেয় ছায়া সুশীতল।

তাই প্রাণে জাগে বিস্ময়।
পৃথিবী এখনো বাসের যোগ্য নিশ্চয়.
এত আলো এত হাওয়া
এখনও ভুবন মাঝে আছে!
কল্পতরু ছায়া দেয়
হৃদয় মাঝে আনন্দ ধারা নাচে।

আমার দীগ শহর দর্শন শেষ। সেই সঙ্গে রাজস্থান ভ্রমণের কথাও শেষ। আমি ভরতপুর থেকে আগ্রা হয়ে বাড়ি ফিরব।

ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের বই থেকে সাহায্য নিয়েছি ঃ—

পুণ্য তীর্থ ভারত — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ - রথীন্দ্রনাথ দে,

কর্ণেল টডের রাজস্থান — ক্ষিতীশ সরকার

রাজভূমি রাজস্থান — শঙ্কু মহারাজ

রাজস্থান দর্শন— এ্যাপিল এ্যাডভারটাইজিং এণ্ড মার্কেটিং কনসালটেণ্ট, নিউদিল্লী।

রাজস্থান কাহিনী — কালিকারঞ্জন কানুনগো

Tourist guide to Rajasthan — Lal chand & sons

Astronomical observatory of Jaipur — Daulat Singh Rajawat

Chittorgarh — Suresh goyal

Udaipur — Goyal Brothers

Mount Abu — Tourist Publication, Delhi

Jodhpur The City of Chivalry — Daulat Singh.

Golden City — N. K. Sharma.

Dig — Archaeological Survey of India.

লেখক পরিচিতি



জন্ম ঃ ১৯৪৮, পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ। শৈশবের শিক্ষা, নোয়াখালি বাংলাদেশ। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ। ১৯৭২ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান স্নাতক। ১৯৭৩-১৯৭৫ পর্য্যন্ত. কাউন্সিল অফ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এ হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়েন। ১৯৭৫ সালে ইন্টার-ডি-এম-এস পরীক্ষায় বসার আগেই ব্যাঙ্কে চাকুরী পান। হোমিওপ্যাথি, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চা তার অনুরাগ। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ক্যানিং শাখার সঙ্গে যুক্ত। ছবি তোলা, দাবা খেলা এবং দেশ বিদেশ ঘুরতে ভালবাসেন। দঃ ২৪পরগণা দাবা সংস্থার সহ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ। স্কুল জীবনেই ছড়া, কবিতা, গল্প এবং উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। পুস্তকাকারে প্রথম ছড়ার বই 'শঙ্কু-বঙ্কুর এক্কা গাড়ি।'